Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনে আলোচিত বিভিন্ন জাতির ইতিহাস : একটি পর্যালোচনা

এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

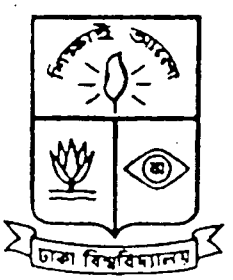

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ আবদুর রশীদ
প্রফেসর
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নভেম্বর - ২০১০

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

জনাব মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত **"আল-কুরআনে আলোচিত বিভিন্ন জাতির ইতিহাস : একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক থিসিস সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে লিখিত হয়েছে। এটি সম্পূর্ণরূপে জনাব মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন- এর নিজস্ব ও একক গবেষণা কর্ম। কোন যুগ্ম কর্ম নয়। এটি একটি তথ্যবহুল, তাৎপর্যপূর্ণ ও মৌলিক গবেষণাকর্ম।

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য সন্তোষজনক। আমি এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত পড়েছি এবং এম.ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

449950

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

07/12/20

ড. মুহাম্মদ আবদুর রশীদ
তত্ত্বাবধায়ক
ও
প্রফেসর
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, **"আল-কুরআনে আলোচিত বিভিন্ন জাতির ইতিহাস : একটি পর্যালোচনা"** শিরোনামে এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য প্রণীত এই অভিসন্দর্ভটি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. মুহাম্মদ আবদুর রশীদ, প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই মৌলিক গবেষণাকর্মটি আমার নিজস্ব রচনা। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে কোন গবেষক কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রির জন্য এ শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি।

মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন
এম. ফিল গবেষক
রেজি. ও শিক্ষাবর্ষ : ১৯৯৯/২০০৩-০৪
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"আল-কুরআনে আলোচিত বিভিন্ন জাতির ইতিহাস : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনায় আমি বিশেষভাবে অত্র গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড.মুহাম্মদ আবদুর রশীদ- এর প্রতি একান্ত কৃতজ্ঞ। কেননা, তিনি আমার জন্য যে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও শ্রম স্বীকার করেছেন, নিরন্তর উৎসাহ-উদ্দীপনা যুগিয়েছেন এবং অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত দেখে দিয়েছেন, সত্যিই তার তুলনা হয় না। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শুধু আজ কেন, কোনদিনই তাঁর এ ঋণ আমার পক্ষে পরিশোধ করা সম্ভব নয়। এ ছাড়া আমার শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাই ড. মুহাম্মদ রাইছ উদ্দিন ভূঞা, সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, মিরপুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাবরেটরী ইন্সটিটিউট যিনি গবেষণা কাজে আমাকে সীমাহীন প্রেরণা যুগিয়েছেন এবং অনেক কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করে আমার থিসিসটি আদ্যোপান্ত দেখে দিয়েছেন, এ জন্য তাঁর নিকটও আমি কৃতজ্ঞ।

আমার এ গবেষণাকর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে যে সকল প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, ঢাকা পাবলিক লাইব্রেরী, মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী অন্যতম। এ সকল প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

দেশ-বিদেশের অনেক সুনিপুণ সুধী ও পণ্ডিতবর্গের কাছ থেকে যে মূল্যবান পরামর্শ ও সহানুভূতি পয়েছি, সে কথাও আজ অতীব শ্রদ্ধার সাথে বারবার স্মরণ করছি। নানা অন্তরায় ও প্রতিকুলতার মাঝে গবেষণার কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য যেসব বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জনেরা আমাকে উৎসাহ ও সাহস যুগিয়েছেন তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ।

মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন
আরবী বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত

ا- আ	ق - ক	اُوْ - উ
ب - ব	ك -ক	وَ -ওয়া
ت - ত	ل - ল	وِ -বি, ভি
ث - স	م - ম	وِى - বী,
ج - জ	ن - ন	و - উ
ح - হ	و -ব, ও, ভ	وُوْ - উ
خ - খ	ه - হ	يَ -য়্যা
د -দ	ء - ’	يَا - য়্যা
ذ - য	ي -য়	يِ - ইউ
ر - র	ـَا	يُوْ - ইউ
ز - য	ـِأ	عَ - ‘আ
س - স	ـُـ	عَا - ‘আ
ش - শ	ـِا	عِ - ‘ই
ص - স	ـِيْ	عِىْ -‘ঈ
ض - য	ـُوْ	عُ- উ
ط - ত	اَ- আ	عُوْ - ‘ঊ
ظ - য	آ- আ	
ع - ‘	اِ- ই	
غ- গ	اِىْ -ঈ	
ف - ফ	اُ - উ	

عْ= সাকিন হলে ‘ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়; যথা نَعْتٌ= না‘ত।

Dhaka University Institutional Repository

সংকেতসূচি

আইনী	ঃ	বদরুদ্দীন আবূ মুহাম্মদ মাহমূদ ইব্ন আহমদ ইব্ন মূসা ইব্ন আহমদ ইব্ন 'আইনী
আবূ জা'ফর আত-তাহাভী	ঃ	আবূ জা'ফর আত-তাহাভী ওয়া আসারুহু ফিল হাদীস
আল-বিদায়াহ্	ঃ	আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ
আল-ইবার	ঃ	কিতাবুল ইবার
আল-বিদায়াহ্	ঃ	আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্
ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী	ঃ	আবুল ফযল শিহাবুদ্দীন শাফি'ঈ' ওরফে হাফিয ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী
খাতীব	ঃ	হাফিয আবূ বকর আহমদ ইব্ন 'আলী 'ওরফে আল-খাতীব আল-বাগদাদী
খ.	ঃ	খন্ড
খ্রি.	ঃ	খ্রিস্টীয় সন
ড.	ঃ	ডক্টর
তা. বি.	ঃ	তারিখ বিহীন

Dhaka University Institutional Repository

দ্র.	ঃ	দ্রষ্টব্য
পৃ.	ঃ	পৃষ্ঠা
মৃ.	ঃ	মৃত্যু
যারকানী	ঃ	মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ যারকানী
রা.	ঃ	রাযিয়াল্লাহু 'আনহু
রহ.	ঃ	রাহমাতুল্লাহি 'আলাইহি
সিইওয়ারবী	ঃ	মাওলানা হিফযুর রহমান সিইওয়ারবী
সং	ঃ	সংস্করণ
সুয়ূতী	ঃ	হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী
ইব্ন কাসীর	ঃ	আবুল ফিদা ইমামুদ্দীন ইসমা'ঈল ইব্ন শায়খ আবূ হাফস শিহাবুদ্দীন 'ওরফে হাফিয ইব্ন কাসীর
হি.	ঃ	হিজরী সন
বা.	ঃ	বাংলা সন

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

আল-কুরআন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সুমহান বাণী। বিশ্ব মানবতার পথ প্রদর্শনের জন্য ইহা ৬১০ খৃ. হতে ৬৩২ খৃ. পর্যন্ত হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর ২৩ বছর ব্যাপী নবী জীবনের বিভিন্ন উপলক্ষ ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়। ঘটনা বৈচিত্র্য ও সময়ের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও এ কিতাবে বর্ণিত বিষয় ও ঘটনা পরম্পরায় সামঞ্জস্যপূর্ণ, সম্পর্কযুক্ত ও প্রসঙ্গিক। ইহা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর চিরন্তন, অতুলনীয়, অনুপম ও শ্রেষ্ঠ মু'জিযা। পবিত্র কুরআন যে, শ্রেষ্ঠ মু'জিযা, শ্রেষ্ঠ ও অবিকৃত ধর্মগ্রন্থ এবং মানুষের রচিত নয়, আল্লাহ্রই প্রেরিত তার বহু প্রমাণ রয়েছে। আল-কুরআনের অবিসংবাদিতা আল-কুরআন-এর অভ্যন্তরেই বিদ্যমান। আল্লাহর বাণী হওয়ার অনুকূলে অন্য কোন প্রকার সাহায্য না নিয়ে একমাত্র কুরআনের মাধ্যমে কুরআনের যাচাই করলেই এ কথা প্রমাণিত হয় যে, তা আল্লাহর বাণী না হয়ে অন্য কারো বাণী হতেই পারে না। এর ছন্দ পুরোপুরি গদ্য নয়, অথচ সাহিত্যের গদ্য রীতির অনুপম সরল গভীরতার সঙ্গে বলিষ্ঠ গাম্ভীর্য এবং তার মাধ্যমে অভিব্যক্তি ভাব-সম্পদের প্রকাশ দ্যোতনা নযীর বিহীন। এর আঙ্গিক পুরোপুরি পদ্যও নয়। অথচ পদ্যের সাবলীলতা, মাধুর্যের পরিবেশ অর্জন হৃদয় ভেদ্য করে তোলার সুর ও আবেগ সৃষ্টির অন্তর প্রকৃতি পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত। অপরাপর সকল কারণ বাদ দিলেও এ একটি মাত্র কারণে পৃথিবীতে বিদ্ধমান সকল গ্রন্থের মধ্যে একমাত্র আল-কুরআনই বেশী সংখ্যক মানুষের কণ্ঠস্থ হয়ে হৃদয়ে স্থান পেয়ে প্রতিনিয়ত অনুরনিত হচ্ছে। এর বাক্য বিন্যাস এবং রচনা শৈলী এতই অপূর্ব, অতুলনীয় এবং হৃদয়গ্রাহী যে, বিশ্বের সব মানুষ ও জিন যদি একযোগে সর্বোতভাবে চেষ্টা সাধনা চালায় তবুও আল-কুরআনের একটি বাক্য রচনা করতেও সমর্থ হবে না। তাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। স্বয়ং আল্লাহ চ্যালেঞ্জ দিয়ে একথা বারবার বলেছেন। বস্তুতঃ আল-কুরআনের ভাষা, ভাব, অলংকার, উপমা, ইতিহাস, ছন্দ, ভাষার লালিত্য, রচনা, অভিনব গ্রন্থনা, বাক্যের অনুপম বিন্যাস, শাব্দিক দ্যোতনা অতুলনীয়, শ্বাশত কিতাব, যার তুলনা হয় না।

কুরআন-মাজীদ মুসলমানদের জীবন দর্শনের মূল উৎস, তাদের ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক, আন্তর্জাতিক জীবনের মূলনীতির নিদের্শনামা। এর বিষয় বস্তুর ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্যের জন্য কুরআন বিজ্ঞানীদের জন্য একটি বিজ্ঞান সংস্থা, ভাষাবিদদের জন্য একটি শব্দকোষ, বৈয়াকরকদের জন্য একখানা ব্যাকরণ গ্রন্থ, কবিদের জন্য একখানা ছন্দ সংহিতা এবং কানুন বিধানের একখানা বিশ্বকোষ।জগতের সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ আল-কুরআন কালের পরিক্রমায় ধূলিবিমলিন হয়নি। নাযিলের পর থেকে কত যুগ অতিবাহিত হয়ে গেল কিন্তু কুরআনের পঠন-পাঠন ও গবেষণার ক্ষেত্রে এর মূল্য বিন্দুমাত্র কমেনি বরং বেড়েই চলেছে। তাই কুরআনের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার প্রেরণার প্রতি লক্ষ্য করে মহামতি গ্যেটে বলেন,

"If this is Islam, then every thinking man among us is, fact a muslim"

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, এ যদি ইসলাম হয়, তবে আমাদের মধ্যে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে মুসলমান। কুরআনের সাহিত্যিক মূল্য অপরিসীম। আরবী সাহিত্যে কুরআনের সমতুল্য কোন গ্রন্থ নেই। শুধু আরবী সাহিত্যে বলি কেন, বিশ্ব সাহিত্যেও মূলনীতির সরস বর্ণনায় কুরআনের মত কোন উচ্চাঙ্গের সাহিত্য রসোত্তীর্ন গ্রন্থ আছে বলে মনে হয় না। এর বর্ণনা ভঙ্গি এমনই প্রাঞ্জল, ধ্বনিসমৃদ্ধ ও ছন্দময় যে, এর অত্যন্ত কঠোর হুশিয়ারী বাণী, নীতির একার্থক প্রকাশ ও উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।[১]

আল-কুরআন সর্ব যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। কুরআন যে বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সর্বযুগের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে তন্মধ্যে তার ভাষা ও ভাষা প্রয়োগের নৈপুন্য অন্যতম।

পবিত্র কুরআনের সকল সূরার প্রতিটি বাক্য বিন্যাস ও শব্দ চয়ন অত্যন্ত সুন্দর, সাবলীল ও সহজ এক কথায় অতুলনীয়। ফলে,অন্য ভাষার লোকেরাও কুরআন মাজীদ পাঠ করে রস আস্বাদন করতে পারে।[২]

অলংকারপূর্ণ ভাষা এত অধিক পরিমাণে কুরআনে ব্যবহার করা হয়েছে, যে, কুরআন পাঠের সময় এর গতি, মাধুর্য, ঝংকার,রস নতুনরূপে পাঠ করে অনুভূত হয়। এজন্য সারা দিনরাত কুরআন তিলাওয়াত করেও কেউ বিরক্ত, শ্রান্ত, ক্লান্ত হয় না। কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বের এটি একটি বাস্তব প্রমাণ।[৩]

কুরআন মুহাম্মদ (সঃ)-এর রিসালাত প্রমাণের ক্ষেত্রে একটি চিরন্তণ মু'জিযা। কুরআন তার অনুপম বর্ণনাভঙ্গি ও অলংকারিকতার জন্য সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মু'জিযা হিসাবে অক্ষুন্ন থাকবে।[৪]

কুরআনের উঁচুমানের সাহিত্যিক ব্যঞ্জনা, উপমা, উদাহরণ এক কথায় অতুলনীয়। শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে কুরআন এক অনুপম মহাগ্রন্থ। চিত্তাকর্ষক শব্দ, অভিনব বাচনভঙ্গি, সুন্দর বাক্য বিন্যাস যা কৃত্রিমতা ও শ্রুতি কটুভাব থেকে মুক্ত। এর বাক্যগুলো অলংকার ও ভাষার সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ যা, দ্যোতিতে ভাস্বর। মাধুর্যে আবৃত। যার বাক্যগুলো আরব-অনারব সবার জন্য উন্মুক্ত, সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তি সবার বোধগম্য, এমন গ্রন্থ পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। সঠিক অর্থ, সহজ ভাব প্রকাশ করে অন্তরে প্রশান্তি আনয়ন, চিত্তাকর্ষক উপমা, শান্তি নিশ্চিতকারী আইন, অকাট্য প্রমাণ সহকারে উপস্থাপিত। এর অর্থগুলো সময়োপযোগী ।[৫]

১। ওবায়দুল হক মিয়া, *আল-কুরআন সর্বযুগের শ্রেষ্ট গ্রন্থ,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৮ খৃ/১৪০৫ বাং, পৃ. ১

২। প্রাগুক্ত, পৃ. ২

৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

৪। মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ যারকাশী, *আল-বুরহান ফী উলুমুল কুরআন,* কায়রো: মাকতাবা দারুত তুরাছ, খ. ২, পৃ. ১০১

৫। ড. এ,বি,এম ফারুক, *"পবিত্র কুরআনের ভাষাগত শৈল্পিক বিবরণ: একটি আলোচনা",* ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয়,তা.বি।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ (সঃ) কে যে সকল মু'জিযা বা অলৌকিকতা দান করেছেন, তন্মধ্যে কুরাইশরা কুরআনের অতুলনীয় ভাষাশৈলী ও অলংকারের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছিল। ফলে কুরআন বার বার তার অলৌকিকতা চ্যালেঞ্জ করা সত্ত্বেও তারা এর মোকাবিলায় কোন নযীর পেশ করতে সক্ষম হয়নি।[৬]

আল-কুরআনের ভাষায়-

"তারা কি বলে, সে এটা নিজে রচনা করেছে? বল, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে এর অনুরূপ দশটি স্বরচিত সূরা আনয়ন কর এবং আল্লাহ ব্যতীত অপর যাকে পাও ডেকে নাও। যদি তারা তোমাদের সামনে সারা না দেয় তবে জেনে রাখ এটাতো আল্লাহর ইল্‌ম মোতাবেক অবতীর্ণ এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তাহলে তোমরা আত্মসমর্পনকারী হবে কি?"[৭]

কুরআনের মত তারা দশটি সূরা রচনায় অক্ষমতা প্রকাশ করলে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করলেন ঃ "আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা এর অনুরূপ, কোন সূরা আনয়ন কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর।"[৮]

তৎকালে আরবে এত বক্তা ও বাগ্মী থাকা সত্ত্বেও যখন তারা অক্ষম হয়ে গেল, তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ

"বল! যদি কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জ্বীন সমবেত হয়এবং যদি তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এটার অনুরূপ আনয়ন করতে পারবে না।"[৯]

৬। *ইসলামী বিশ্বকোষ,* ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন-১৯৯৫, খ.১২, পৃ. ২৫২

৭। أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين .
فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون.

আল-কুরআন, ১১ : ১৩-১৪

৮। وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.

আল-কুরআন, ২ : ২৩,

৯। قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.

আল-কুরআন, ১৭ : ৮৮

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে একের পর এক চ্যালেঞ্জ গ্রহণে ব্যর্থ হয়ে তারা তাদের অক্ষমতা স্বীকার করে নিল। কারণ তারা তাদের অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতার কথা জানত এবং তারা এও জানত যে, এ সকল চ্যালেঞ্জের একটিও প্রমাণ করা কারো পক্ষ্যে কোন দিনই সম্ভব হবে না। আল-কুরআনের প্রত্যেকটি দিক এক একটি মু'জিযা। শব্দগঠন, বাক্যবিন্যাস, বাকলালিত্য, জ্ঞানগর্ভ আলোচনা, নবী-রাসূলগণের পরিচয় ও তাদের দাওয়াতী কার্যক্রম, অতীত জাতি ও জনপদ সমূহের বর্ণনা, আলোচ্য বিষযের সামঞ্জস্যপূর্ণ বর্ণনা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যে এই গ্রন্থ আরবগণকে হতবাক করে দিয়ে ছিল। সমসাময়িক অলংকার শাস্ত্রবিদগণ একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, কুরআনের রচনাভঙ্গি, বর্ণনাধারা, ভাষাশৈলী ও নির্ভুল ও প্রামাণ্য অতীত জাতিসমূহের ইতিহাস সম্বলিত কোন গ্রন্থ রচনা করা তাদের পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। আরবরা উপলব্ধি করতে পেরেছিল কুরআনের এ বর্ণনা রীতি তাদের প্রকৃত প্রাণ বা আত্মা।[১০]

প্রথম মানব-মানবী হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) থেকে মানব সভ্যতার শুভ সূচনা হয়েছে। হযরত আদম ছিলেন মানব জাতির আদি পিতা এবং সর্ব প্রথম নবী। আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টির পর তাঁর বিধি-বিধান আম্বিয়াই-কিরামের মাধ্যমেই মানব জাতির কাছে পৌছিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ সহীফা অথবা কিতাব নিয়ে এসেছেন। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা, আম্বিয়া-ই-কিরামের আগমন ও তাঁদের কর্মবহুল জীবন অতীত জাতি ও জনগোষ্ঠী সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কোথাও সংক্ষিপ্ত ভাবে কোথাও বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাই অতীত জাতির নির্ভুল ইতিহাস জানার জন্য কুরআনই হলো মৌলিক উপাদান। আজ বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগেও কুরআনের তত্ত্ব ও তথ্য প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণিত।[১১]

আল-কুরআনে আলোচিত বিভিন্ন জাতির ইতিহাস সম্পর্কে মুফাস্সিরগণ তাদের লেখনির মাধ্যমে অতীত জাতির পরিচয়, সময়কাল, উত্থান-পতন, আচার-আচরণ সহ তাদের নবী-রাসূলগণের দাওয়াতী কার্যক্রমের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। এছাড়াও "কাসাসুল আম্বিয়া, কাছাসুল কোরআন গ্রন্থকারকদ্বয় তাদের গ্রন্থে উল্লেখিত জাতির ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। আমার জানা মতে এ বিষয়ের উপরে বাংলা ভাষায় গবেষণাধর্মী কোন গ্রন্থ বা গবেষণাকর্ম প্রকাশিত হয়নি। তাই আমি "আল-কুরআনে আলোচিত বিভিন্ন জাতির ইতিহাস: একটি পর্যলোচনা", শিরোনামে বাংলা ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা ও গবেষণা কর্ম রচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। কুরআন বিষয়ক এ রচনা বা গবেষণাকর্ম আরবী ও বাংলা ভাষায় রচিত মূল্যবান গ্রন্থগুলো থেকে নিবাচিত বিভিন্ন সূত্রসমূহের পরিচয় প্রদান, সেগুলোর প্রাথমিক দিকগুলো নিয়ে আলোচনা তাফসীর বিষয়ক বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থসমূহ, আল-কুরআনে আলোচিত বিভিন্ন বিষয়সমূহের উপরে লিখিত গ্রন্থ সমূহ, বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত ও প্রচারিত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালসমূহ পাঠ ও পর্যালোচনা করার

১০। ড. শাহ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *কুরআন পরিচিতি,* ঢাকা: সোনালী সোপান, ২০০৯ পৃ. ২

১১। আবুল ফিদা হাফিয ইব্ন কাসীর আদ-দামেশকী (রহঃ), *তাফসীরে ইব্ন কাসীর,* অনুবাদ, সম্পাদনা পরিষদ,ঢাকা: ইফাবা, ১৯৮৪/১, জুন-২০০০, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে "আল-কুরআনের আলোচিত বিভিন্ন জাতির ইতিহাস: একটি পর্যালোচনা", গবেষণাকর্মটি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। যাতে সাধারণ মানুষ অতি সহজে এ বিষয়টি আয়ত্ত করতে পারে। আর একজন সাধারণ অনুসন্ধিৎসু কুরআন পাঠক কুরআনে আলোচিত বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতন ও শেষ পরিণতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাদের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজের কৃত অপরাধের কথা স্মরণ করে সংশোধিত জীবনাচরণে ফিরে আসবে বলে আশা পোষণ করছি। আর এমনটি হলেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থক ও সফল হবে।

এ জটিল বিষয় ও গবেষণাকার্যটি সুসম্পন্ন করার পাশা-পাশি সম্মানিত পাঠককুলের কাছে তা সুখপাঠ্য করার জন্য আমি আমার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছি। আশা করি বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিম বঙ্গ এবং আসাম অঞ্চলসহ গোটা বিশ্বের বাংলা ভাষা ভাষী প্রায় বাইশ কোটি মানুষের মধ্য হতে আল-কুরআনে আলোচিত বিভিন্ন জাতির ইতিহাসের সাধারণ পাঠক, ছাত্র, শিক্ষক এবং গবেষকগণ আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার ফল লাভে উপকৃত হবেন।

পর্যালোচিত অভিসন্দর্ভটির অবয়ব-ভাব সৌন্দয্য বৃদ্ধি ও যথার্থ মান সম্পন্ন করে তোলার জন্য পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে সাজানো হয়েছে। তম্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে আল-কুরআনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও পর্যালোচনা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইতিহাস দর্শন : একটি পর্যালোচনা, তৃতীয় অধ্যায়ে আল-কুরআনে ইতিহাস বর্ণনার কারণ, গুরুত্ব ও তাৎপর্য, চতুর্থ অধ্যায়ে আল-কুরআনে আলোচিত বিভিন্ন জাতির ইতিহাস : একটি পর্যালোচনা ও পঞ্চম অধ্যায়ে সার্বিক পর্যালোচনা, শিক্ষা ও করণীয় সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি যুক্ত করে অভিসন্দর্ভের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রত্যয়ন পত্র i
ঘোষণা পত্র .....
কৃতজ্ঞতা স্বীকার iii
প্রতিবর্ণায়ন v
সংকেতসূচি ..... V- VII
ভূমিকা ১-৫
সূচিপত্র ৬-১০
প্রথম অধ্যায় ঃ আল-কুরআনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও পর্যালোচনা
* কুরআনুল করীমের নাম ও নামকরণ তাৎপর্য/১২
* আল-কুরআনের শৈল্পিক বিন্যাস ও পদ্ধতি/১৫
* আল-কুরআনের ভাষাশৈলীর বিভিন্ন রূপ/১৯
* আল-কুরআনের সাহিত্য শৈলী/২০
* আয়াতের পুনারাবৃত্তির গুরুত্ব/২৯
* আল-কুরআনের শব্দ চয়নের তাৎপর্য/২৯
* আল-কুরআনে বাক্যান্তে বিরতি ও অন্তমিল/২২
* আল-কুরআনের সম্মোহনী শক্তি/২৬
* আল-কুরআনের সম্মোহনী শক্তির উৎস/৩০
* আল- কুরআনের বর্ণনা রীতি/৩৭
* আল-কুরআনের বর্ণনা ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য/৪৫
* আল-কুরআনের সূরা অবর্তীনের ক্রমধারা/৪৬
* আল- কুরআনের উপসংহার পদ্ধতি/৫০
* আল-কুরআনের ভাষা, সাহিত্যশৈলী, অলংকার ও বিন্যাস পদ্ধতি সম্পর্কে প্রাজ্ঞ মণীষীগণের মন্তব্য/৫০
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ইতিহাস দর্শনঃ একটি পর্যালোচনা
* ইতিহাস পরিচিতি/৫৪
* ইতিহাসের বিষয়বস্তু/৫৫
* ইতহাস: বাংলা বিশ্বকোষের ভাষ্য/৫৭
* এশিয়ার ইতিহাস/৬১
* ইতিহাস বিদ্যার কল্যাণ ও গুরুত্ব/৬২
* ইবন খালদুনের দৃষ্টিতে ইতিহাস/৬৬
* ইতিহাস প্রণয়নে মুসলমানদের অবদান/৭১
* ইতিহাসের বিকাশ /৭৬
* জাহিলিয়াতের সময়ে ঐতিহাসিক বর্ণনা সমূহ/৭৪
* ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইতিহাস/৭৬
* খিলাফতের ইতিহাস ও এর গুরুত্ব /৭৭
* ইতিহাস গ্রন্থ রচনার সূচনা/৭৮
* ইতিহাসের দর্শন ও বৈজ্ঞানিক ইতিহাস/৮৪

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়ঃ আল-কুরআনে ইতিহাস বর্ণনার কারণ, গুরুত্ব ও তাৎপর্য/৯৯
* অহী ও রিসালাতের স্বীকৃতি/৯৯
* এক ও অভিন্ন দ্বীন/১০১
* নবী, রাসূল ও তাঁদের দাওয়াতের অভিন্নতা/১০৩
* মহান আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান ও এর তাৎপর্য/১০৬
* নবী-রাসূলগণের দাওয়াতে দ্বীনের যোগসূত্র/১০৯
* নবী-রাসূলগণের সফলতা ও মিথ্যাবদীদের পরাজয়/১১১
* সুসংবাদ ও সতর্কীকরণের সত্যতা/ ১১৩
* নবী-রাসূলগণের প্রতি প্রদত্ত নিয়ামত সমূহের বর্ণনা/ ১১৫
* আদম সন্তানকে শয়তানের শত্রুতা থেকে সতর্ক করা/ ১১৫
* অন্যান্য আরো কিছু কারণ / ১১৫

চতুর্থ অধ্যায় ঃ আল-কুরআনে আলোচিত বিভিন্ন জাতির ইতিহাসঃ পর্যালোচনা .
* নূহ (আঃ)-এর জাতি/১১৮
* নূহ (আঃ)-এর বংশ পরিচয়/১১৮
* সমকালীন পরিবেশ/১১৯
* নূহ (আঃ)-এর দাওয়াত ও তাবলীগ এবং তাঁর কাওমের নিকট-এর প্রতিক্রিয়া/১২১
* নূহ (আঃ)-এর নৌকা নির্মাণ/১২৪
* জুদী পাহাড়/১২৫
* নূহ (আঃ)-এর প্লাবনের এলাকা/১২৬
* নূহ (আঃ)-এর ইন্তিকাল ও পরবর্তী বংশধর/১২৭

আদ জাতির ইতিহাস
* আদ জাতির পরিচিতি/১২৮
* আদ জাতির যমানা/১২৯
* আদ জাতির বাসস্থান/১২৯
* আদ জাতির ধর্ম বিশ্বাস/১৩০
* আদ জাতি সর্ম্পকে কুরআনের মন্তব্যঃ পর্যালোচনা/১৩০
* হুদ (আঃ)-এর পরিচয়/১৩০
* হুদ (আঃ)-এর দাওয়াতী কার্যক্রম ও এর তাৎপর্য/ ১৩৩
* আদ জাতির প্রতি আল্লাহর প্রেরীত আযাব/১৩৭
* হুদ (আঃ)-এর ওফাত/১৪০

সামুদ জাতির ইতিহাস
* সামুদ জাতির বংশ পরিচয়/১৪১
* সামুদ জাতির বসতি/১৪২

Dhaka University Institutional Repository

* সামুদ জাতির ধর্মবিশ্বাস/১৪৪
* সালেহ (আঃ)-এর দাওয়াত ও তাবলীগ/১৪৪
* সালেহ (আঃ)-এর উষ্টীর ইতিহাস/১৪৫
* সামুদ জাতির প্রতি আল্লাহর প্রেরীত আযাব/১৪৮
* সালেহ (আঃ)-এর শেষ অবস্থান ও ওফাত/১৫০

লুত জাতির ইতিহাস
* সাদুম ও আমুরার পরিচিতি/১৫১
* লুত জাতির অপরাধ/১৫২
* লুত (আঃ)-এর দাওয়াত ও তাবলীগ/১৫৩
* লুত জাতির শেষ পরিণতি/১৫৪

মাদইয়ান বা আসহাবে আইকাহ-এর ইতিহাস
* মাদইয়ান বা আইকাহ-এর পরিচিতি/১৬১
* মাদইয়ান বা আইকাহ-এর বসতি/ ১৬২
* মাদইয়ানবাসীর প্রতি শুআইব (আঃ)/ ১৬৩
* শু'আইব (আঃ)-এর দাওয়াত ও সত্য প্রচার/১৬৩
* মাদইয়ান বা আইকাহ জাতির ধ্বংস/১৬৬

সাবা জাতির ইতিহাস
* সাবা শব্দের তাৎপর্য ও এর পরিচিতি/১৬৮
* সাবা-এর শাসনকাল/১৭০
* সাবা জাতির শাসন যুগের স্তর সমূহ/ ১৭১
* সাবা জাতির অগ্রগতি ও উন্নতির ভিত্তি/১৭৩
* সাবা জাতির রাজত্বের বিস্তৃতি/১৭৪
* সাবাবাসী ও আল্লাহ তা'আলার প্রতি নাফরমানী/১৭৫
* মা'আবিবের বাঁধ/১৭৫
* সাইলে আরেম/১৭৬
* সাবাবাসীর প্রতি বিভিন্ন শাস্তি/১৭৬

আসহাবুল কাহ্ফ ওয়ার রাক্বীম
* কাহ্ফ ও রাক্বীম পরিচিতি/ ১৭৯
* কাহ্ফ ও রাক্বীমের অবস্থান/ ১৮০
* সমসাময়িক শাসক/১৮১
* ঘটনা/ ১৮২

Dhaka University Institutional Repository

আসহাবুল কারইয়াহ

* আসহাবুল কারইয়াহ্ পরিচিতি/১৮৫
* ঘটনা ও শেষ পরিণতি/১৮৬

আসহাবুল উখদুদ বা কাওমে তুববা

* আসহাবুল উখদুদ পরিচিতি/১৯২
* আসহাবুল উখদুদ ও কুরআন মজীদ/১৯২
* আসহাবুল উখদুদের ইতিহাস/১৯৩
* আসহাবুল উখদুদের যমানা/১৯৫

আসহাবুল ফীলের ইতিহাস

* আসহাবুল ফীলের পরিচিতি/১৯৮
* আসহাবুল ফীলের সেনাপতি/১৯৮
* আবরাহার কাবা ধ্বংসের ষড়যন্ত্র/১৯৯
* কাবা রক্ষায় মক্কাবাসীদের আল্লাহর নিকট প্রার্থনা/২০২
* আসহাবে ফীলের শেষ পরিণতি/২০৪
* আবরাহার উপর শাস্তির স্থান/২০৫

পঞ্চম অধ্যায়ঃ সার্বিক পর্যালোচনা, শিক্ষা ও করণীয়

ক. বস্তুতান্ত্রিক চিন্তা/২০৭
খ. অহংকার ও দাম্ভিকতা/২০৮
গ. মাপে ওজনে কম দেওয়া ও কৃত্রিম উপায়ে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি করা/২০৯
ঘ. অন্ধ অনুসরণ করা/২১১
ঙ. অভিন্ন দ্বীনের দাওয়াত/২১২

কতিপয় শিক্ষণীয় বিষয়/২১৬

ক. নিজের আমলের জন্য নিজেকেই জবাবদিহি করতে হবে/২১৭
খ. অসৎ সংসর্গ বিষের চেয়েও মারাত্মক/২১৭
গ. আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরতার সাথে বাহ্যিক উপকরণের ব্যবহার তাওয়াকুল পরিপন্থী নয়/২১৭
ঘ. নবী-রাসূলগণ ত্রুটি-বিচ্যুতির উর্ধ্বে নয়/২১৮
ঙ. সত্যিকারের দা'য়ী বিরোধীদের ঠাট্টা-বিদ্রুপের পরওয়া করেন না/২১৮
চ. সত্য প্রচারের পথে মন্দ ব্যবহারের বদলা সদ্ব্যবহারে দেয়া উত্তম/২১৮
ছ. কোন জাতিকে ধ্বংস করা আল্লাহর ইচ্ছা নয়/২১৯

Dhaka University Institutional Repository

জ. দুনিয়ার স্বচ্ছল জীবিকা,আরামের যিন্দিগী ও দুনিয়াবী মান-মর্যাদা আল্লাহ তা'আলার সন্তোষের ফল নয়/২১৯

ঝ. দ্রব্য বিক্রয়ের মাধ্যমে পরিমাপ সঠিক বা পরিপূর্ণ করা/২২০

ঞ. ঈমানের মযবুতী আত্মত্যাগের অনুপ্রেরণা যোগায়/২২০

কিছু করণীয় বিষয়

ক. নম্র ও উত্তম ব্যবহার/২২২

খ. সুস্পষ্টভাবে দাওয়াত পেশ/২২২

গ. নিঃস্বার্থভাবে ওএকনিষ্ঠভাবে দাওয়াত দান/২২৩

ঘ. সৎকর্ম মুক্তির একমাত্র উপায়/২২৩

ঙ. মু'মিনের সংস্পর্শ লাভ/২২৩

চ. আল্লাহর সাহায্যে প্রত্যাশী হওয়া/২২৪

ছ. জোড়-জবরদস্তির আশ্রয় না নেয়া/২২৪

জ. দাওয়াতে হিকমত অবলম্বন/২২৪

ঝ. যুলুমের পরিণাম ধ্বংস/২২৫

* উপসংহার/২২৬-২২৮

* গ্রন্থ পঞ্জি/২২৯-২৩৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

পবিত্র কুরআনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

আল-কুরআনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও পর্যালোচনা

কুরআনুল কারীমের নাম ও নামকরণ তাৎপর্য

'আল্লামা আবুল মা'আলী (রহঃ)[১] কুরআনে কারীমের ৫৫টি[২] নাম উল্লেখ করেছেন। আবার কেউ কেউ ৯০-এরও অধিক বলেছেন। আসলে কুরআন সম্পর্কে প্রযুক্ত বিভিন্ন বিশ্লেষণ যেমনঃ মাজীদ, কারীম, হাকীম, ইত্যাদিকেও তত্ত্বগত নামরূপে গণনা করার কারণে নামের এই সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে। অন্যথায় কুরআনে কারীমের প্রকৃত নাম ৫টি। যথা ঃ

১. আল-কুরআন। ২. আল-ফুরকান। ৩. আয্-যিক্‌র। ৪. আল-কিতাব এবং ৫. আত্-তানযীল।[৩]

কুরআনে কারীম স্বয়ং এ পাঁচটি নামে নিজের পরিচয় দিয়েছে।[৪] তবে আল-কুরআন হল তার প্রাবন্ধিতম নাম আল্লাহ তা'আলা একষট্টি স্থানে তা উল্লেখ করেছেন।[৫]

মূলতঃ قرآن কুরআন শব্দটি قرأ يقرأ থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ "একত্রিত করণ" পরে তা পঠন অর্থে ব্যবহার হয়েছে। কেননা পঠন অর্থ শব্দসমূহের একত্রিতকরণ।[৬] এছাড়া قرأ يقرأ (কুরআন) ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ ان علينا جمعه وقرانه "এর সংরক্ষন ও পাঠ আমারই দায়িত্ব।"[৭]

১। তাঁর উপনাম আবুল মা'আলী। পূর্ণনাম আজীযী ইব্‌ন আবদুল মালিক। উপাধি শাইয়ান লাহু। তিনি হি. পঞ্চম শতকের শাফি'ঈ মাযহাবের একজন বিজ্ঞ আলিম। ৪৯৪হি. সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

২। 'আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ), *"আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন"*, কায়রোঃ মাতবাআ হিজাবী, খ. ১, ১৩৬৮হি., পৃ, ৫১

৩। যারকানী (রহঃ), *মানাহিলুল ইরফান,* কায়রোঃ মাতবাআ ঈসা আল-বালী, আল-হাবলী, খ. ১, ১৩৭২ হি., পৃ. ৮

৪। 'আল-ফুরকান' সূরা আল-ইমরান, আয়াতঃ ৪

من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام

'আয-যিক্‌র' সূরা আল-ইমরান, আয়াতঃ ৫৮ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم 'আল-কিতাব' সূরা আল-বাকারা, আয়াতঃ ২ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 'আত-তানযীল' সূরা ইয়াসীন, আয়াতঃ ৫ تنزيل العزيز الرحيم

৫। ইল্‌মী বাদাহ আল-হাসান, *ফাতহুর রহমান লি তালিবে আয়াতিল কুরআন,* বৈরুতঃ আল-মাতবাআতুল আহলিয়া, ১২২৩ হি., পৃ. ৩৫৮ ও ৩৫৯

৬. আল-রাগিব ইস্পাহানী (রহঃ), *আল-মুফরাদাত ফী গরীবিল কুরআন,* করাচী:১৩৮০হি. পৃ. ৪১১

৭। আল-কুরআন, ৭৫ : ১৭

Dhaka University Institutional Repository

আরবী ভাষায় মাছদার কখনো কখনো ইসমে মাফউল (past parlicipe)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ অর্থেই কুরআনকে "কুরআন" পঠিত গ্রন্থ বলা হয়।[৮]

কুরআন নামকরণের বিভিন্ন কারণ রয়েছে। প্রসিদ্ধ মতে উলামায়ে কিরাম বলেন, আরবের কাফির সম্প্রদায়ের বক্তব্যকে প্রতিহত করার জন্য এর নাম "ফুরকান" রাখা হয়েছে। কুরআনে কারীমে বর্ণিত সে বক্তব্যটি হচ্ছে ঃ لاتسمعوا لهذا القران والغوا فيه "তোমরা এ কুরআন শ্রবণ কর না ; বরং এর তিলাওয়াত অনুষ্ঠানে হট্টগোল কর।"[৯]

কাফিরদের এ ধরনের অন্ধ বিদ্বেষ উপেক্ষা করে 'কুরআন' নামকরণের মাধ্যমে এর ইঙ্গিত করা হয়েছে। যে, হট্টগোল দ্বারা কুরআনের দাওয়াতকে পরাভূত করা যাবে না। এ কিতাব পঠনের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত তা পঠিত হবে। এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, সমগ্র বিশ্বে কুরআনে কারীমই সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ।

* তাফসীরবেত্তা ইবনে কাসীর ও ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর মতে আল-কুরআন শব্দটি অন্যকোন শব্দ হতে গঠিত হয়নি ; এটা নিরেট নাম বাচক বিশেষ্য।[১০]

* ফার্‌রা, ইমাম আবুল হাসান ও ইবনে কাসীর আল-কুরআন শব্দকে হামযা ছাড়া قران (কু'রান) উল্লেখ করেছেন। ইমাম বায়হাকী, খতীব বাগদাদীর মতানুসারে ইমাম শাফেয়ী قرات শব্দকে হামযাসহ পাঠ করতেন। কিন্তু কুরআন শব্দকে হামযা ছাড়া পড়তেন এবং বলতেন শব্দটি قرات শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়নি বলে হামযা বিশিষ্ট নয়।[১১]

* বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ 'আল্লামা রাগীব ইস্পাহানী, ব্যাকরণবিদ ফাররা, মুজায, আবু উবাইদ ও ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরীর মতে কুরআন শব্দটি উৎপন্ন বিশেষ্য ও হামযা বিশিষ্ট।[১২]

৮। আস-সুয়ূতী (রহ.), প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫২

৯। আল-কুরআন, ৪১ : ২৬

১০। আল-খতীব আল-বাগদাদী, *তারিখু বাগদাদ,* কায়রো: মাকতাবাতে আল-খানজী, ১৩৯৪হি. খ. ২, পৃ. ৬২

১১। ইমাম বদরুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আযযারকাশী, *আল-বুরহান ফি উলুমিল কুরআন,* বৈরুত: দারুল জিল, তা. বি.খ. ১, পৃ. ৩৯৪

১২। 'আল্লামা রাগিব ইস্পাহানী, *মুফরাদাত,* বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা.বি.পৃ. ৩২

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য, ভাষ্যকারদের মধ্যে কুরআন শব্দের উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে আবার মতভেদ রয়েছে। যেমন ঃ

১. ইমাম আবুল হাসান আল-'আশ'আরীর মতে কুরআন শব্দটি আরবদের উক্তি بالشئ قراة الشئ "আমি একটি বস্তুকে অন্য বস্তুর সাথে মিলিয়ে দিয়েছি" থেকে এসেছে। কুরআন অর্থ হচ্ছে, সন্নিবেশ, মিলন, যোগসূত্র।[১৩]

২. ব্যাকরণবিদ ফাররা-এর মতে, আল-কুরআন শব্দটি القرائن থেকে উদ্ধৃত। যার অর্থ হচ্ছে পরস্পর সামঞ্জস্যশীল বস্তুসমূহ। এ কারণে আল-কুরআনের আয়াত সমূহ একটি অপরটির সত্যতা প্রমাণ ও সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।[১৪]

৩. ভাষাতত্ত্ববিদ রাগিব ইস্পাহানীর মতে, কুরআন শব্দটি قرأ ধাতু থেকে নেয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে সংগ্রহ করা, একত্র করা। আল-কুরআনের পুর্ববর্তী ধর্ম গ্রন্থ সমূহের সারমর্ম, শিক্ষা, বিভিন্ন সূরা, আয়াত এবং অক্ষরের একত্রিকরণ পরিদৃষ্ট হয়।[১৫]

৪. আল-লিহয়ানী বলেন, কুরআন শব্দটি হামযাযুক্ত এবং قرء "সে পড়েছে" ক্রিয়ার মাসদার বা ক্রিয়ামূল। قرء শব্দ থেকে গঠিত। অর্থ তিলাওয়াত করা, পাঠ করা, আবৃত্তি করা, অধ্যয়ন করা। প্রকৃত পক্ষে এ অর্থটিই সঠিক। কেননা, শব্দের বিচারে কুরআন শব্দটি মাসদার বা ত্রিয়ামূল এবং কিরাতের "قرات " সমার্থক।[১৬]

৫. ইবনুল মানযুর বলেন,[১৭] কুরআন শব্দটি আরবদের উক্তি ما قرأت الناقة نسلا قط "উষ্টীটি কখনো গর্ভপাত করেনি" থেকে নিষ্পন্ন। এ কারণে কুরআনের পাঠক পাঠিকা নিজ নিজ মুখ থেকে কুরআনের শব্দ প্রকাশ করে থাকেন।

৬. 'আল্লামা যারকানী বলেন,[১৮] কুরআন শব্দটি قراة থেকে এসেছে। অর্থ, পঠিত, অধ্যয়নকৃত, অধ্যয়নযোগ্য। আল-কুরআন পৃথিবীর সর্বাধিক মানব কর্তৃক পঠিত গ্রন্থ।

অতএব, অভিধানবিদগণের মতভেদ অনুসারে কুরআন শব্দটিরও বিভিন্ন অর্থ করা যায়। যেমন ঃ পাঠ করা, আবৃত্তি করা, অধ্যয়ন করা, সন্নিবেশ, মিলানো, যোগসূত্র, বর্ণনা করা, পঠিত, পাঠকৃত ইত্যাদি।

১৩। ড. সুবহি সালিহ, *মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন,* বৈরুতঃ দারুল ইলম, ১৯৮৫ খৃ. পৃ. ১৯

১৪। জালালুদ্দিন সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফি 'উলুমিল কুরআন,* দিল্লী, এশাআতে ইসলাম, তা.বি. খ. ১, পৃ. ৫১

১৫। 'আল্লামা ইস্পাহানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

১৬। ড. সুবহী সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

১৭। ইবনুল মানযুর, লিসানুল আরব, বৈরুতঃ দারুল কুতুব ইসলামিয়্যাহ, তা.বি. খ. ১, পৃ. ১২৬

১৮। আবদুল আযিম আযযারকানী, *মানাহিলুল ইরফান ফি উলুমুল কুরআন,* বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৯ হি., খ.১, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

কুরআনে কারীমের পারিভাষিক সংজ্ঞা এভাবে করা হয়েছে ঃ

المنزل على الرسول المكتوب فى ا لمصاحف المنقول الينا نقلا متواترا بلاشبهة.

"আল্লাহ তা'আলার এমন বাণী যা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে মাসহাবের মাঝে লিপিবদ্ধ হয়েছে, সন্দেহাতীত ভাবে ধারাবাহিক সূত্র পরম্পরায় আমাদের নিকট পৌছেছে।"

আল-কুরআনের শৈল্পিক বিন্যাস ও পদ্ধতি

যে কালে কুরআন নাযিল হয়, সে সময় আরবে খ্যাতিমান কবি সাহিত্যিকদের অভাব ছিল না, কিন্তু তারপরও কুরআনের অনুরূপ কুরআন সৃষ্টির জন্য চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করলে[১৯] এসব কবি সাহিত্যিকরা অপারগতা প্রকাশ করে বলেছিল ঃ ليس هذا من كلام البشر "এটা কোন মানব রচিত বাণী নয়", এর রচনাশৈলী ও বিন্যাস পদ্ধতি উঁচু মানের। এ গ্রন্থে উঁচু স্তরের শিল্পকলা বিদ্যমান যা কুরআনের বিশেষ কোন অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং সর্বত্র সমভাবে বিস্তৃত। সমস্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষের বর্ণনাধারা পর্যন্ত এক ও অভিন্ন। কুরআনে উন্নত শৈল্পিক বিন্যাস ও রচনা শৈলীর উৎকর্ষ তথা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে কুরআন নাযিলের সময়কালে আরবের কাফির মুশরিকগণও কুরআনকে কাব্য আবার কখনো যাদু বলে আখ্যায়িত করত। শৈল্পিক সৌন্দর্যে মন্ডিত কুরআনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েও কাফির মুশরিকগণ বলতে পারেনি সৌন্দর্য মন্ডিত সে বস্তুটি কি ? কুরআন কাফির মু'মিন উভয় গোষ্ঠির উপর যাদুর মত প্রভাব সৃষ্টি করেছে। যাদুর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে কেউ সত্যাশ্রয়ী মুসলমান হয়েছে ; আবার কেউ এর মায়াজালে আবদ্ধ হয়েও পালিয়ে বেরিয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে কেউই সুস্পষ্টভাবে বলতে পারেনি কুরআনের কোন অংশটি তাদের প্রভাবিত করেছে।

হযরত ওমর (রা.) নিজেই স্বীকারোক্তি দিয়েছেন যে, "যখন আমি কুরআন শ্রবণ করলাম তখন আমার মধ্যে এক ভাবান্তর সৃষ্টি হলো যার কারণে আমি কাঁদতে লাগলাম এবং ইসলাম গ্রহণ করে ফেললাম"।[২০]

কুরআন সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্যের মধ্য দিয়ে আজও একটি প্রশ্ন জাগে যে, কুরআনের শিল্প ও সৌন্দর্য কেন এত মনোহর ? এটা কি আল-কুরআনের অনুপম বিন্যাস শৈলীর কারণে, না অন্য কিছু ? গবেষণায় প্রতিয়মান হয় যে, কুরআনের প্রতি আকর্ষণ কেবল শৈল্পিক বিন্যাস ও রচনাশৈলীর উৎকর্ষের কারণে।

১৯। وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين "আমি আমার রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি, সে সম্পর্কে যদি তোমরা সন্দিহান হও তবে অনুরূপ একটি সূরা তৈরী করে নিয়ে আস"। আল-কুরআন, ২ : ২৩

২০। সাইয়্যেদ কুতুব, *আত-তাসবিরুল ফান্নি ফিল কুরআন*, মিসরঃ দারুল কলম, তা.বি. পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

শৈল্পিক বিন্যাসের ধরন

শৈল্পিক বিন্যাসের কয়েকটি স্তর আছে। বিন্যাসের শৈল্পিক এবং আলংকরিক দিক এমন আছে, যে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ বিশ্লেষণ করেছেন। আবার এমন কিছু দিকও আছে যে সবের মধ্যে তাদের স্পর্শ পর্যন্ত পড়েনি।

১। বিন্যাসের একটি ধরন, যার সম্পর্কে 'ইবাদতের বিন্যাসের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন ঃ উপযোগী কিছু শব্দ চয়নের মাধ্যমে নিদিষ্ট পদ্ধতিতে বিন্যাস করা। যার বদৌলতে সে বাক্য বা কথা পরিশীলনে পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে পৌছে যায়।

২। বিন্যাসের আরেকটি সম্পর্ক হচ্ছে সুর ও ছন্দের সাথে। যা শব্দের সঠিক চয়ন এবং তাকে এক বিশেষ পদ্ধতিতে বিন্যাসের দ্বার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিটি আল-কুরআনে পুরো মাত্রায় দৃষ্টিগোচর হয় এবং কুরআনের শৈল্পিক ভিত্তিতে তা একাকার হয়ে আছে।

৩। অলংকার শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণ আল-কুরআনের বিন্যাসের আলংকরিক যেসব দিক সম্পর্কে জানতে পেরেছেন, তার একটি হচ্ছে আল-কুরআনের আয়াতের শেষ অথবা বক্তব্যের শেষ করা হয়েছে বক্তব্যের সাথে সংগতি রেখে। যেমন যেসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলার যাত ও সিফাতের বর্ণনা করা হয়েছে তা শেষ করা হয়েছে ঃ ان الله على كل شئ قدير বাক্য দ্বারা। আবার কখনো কোন গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, তা শেষ করা হয়েছে ان الله عليم بذات الصدور বাক্যটি দ্বারা। তেমনিভাবে যেখানে তা'লীম তারবিয়াতের আলোচনা এসেছে সেখানে "রব" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যথা ঃ

اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذى علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم .

"পড় তোমার প্রভূর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়, তোমার প্রভূর নামে যিনি অত্যন্ত দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিখিয়েছেন, মানুষকে এমন জ্ঞান শিখিয়েছেন যা সে জানত না"।[২১]

যেখানে আল্লাহর সর্বভৌমত্ব ও সম্মান প্রতিপত্তির আলোচনা এসেছে সেখানে الله আল্লাহ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ঃ যথা-

ان ا لله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الارحام

"নিশ্চয় আল্লাহর নিকটই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে তিনিই তা জানেন।"[২২]

২১। আল-কুরআন, ৯৬ : ১-৫

২২। আল-কুরআন, ৩১ : ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

এমনি ভাবে "الله" আল্লাহ শব্দটিকে স্থান ও কালভেদে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কখনো আল্লাহ শব্দটি একবার বলে পরবর্তী আয়াত সমূহে শুধুমাত্র সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কোথাও বাক্যের প্রথমে, আবার শেষেও, আবার কোথাও আল্লাহ শব্দ এবং তার সর্বনাম যৌথভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক জায়গায় প্রশ্নের অবতারণার জন্য আবার কোন জায়গায় ইতিবাচক বর্ণনার জন্য নেয়া হয়েছে। এটি অলংকার শাস্ত্রের পন্ডিতদের নিকট আলংকারিক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে পরিগণিত।

৪। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যের অর্থগত ধারাবাহিকতা থাকে। অতপর একটির উদ্দেশ্যকে অন্যটির উদ্দেশ্যে পরিবর্তন করার ফলে যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তাও একধরনের শৈল্পিক বিন্যাসের নমুনা। অবশ্য অলংকার শাস্ত্রেবিদগণ যে নীতির কথা বলেন আল-কুরআন তা থেকে মুক্ত।

৫। কুরআনে এমন কিছু জায়গা আছে যেখানে চিত্রায়ন পদ্ধতিতে তার বক্তব্য পেশ করা হয়েছে, সেখানে বক্তব্য এবং অবস্থার মধ্যে পুরোপুরি মিল পাওয়া যায়। যেমন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বর্ণনার এ ঢং অথবা অর্থ ছবির লক্ষণ পরিপূর্ণ করতে সহায়ক প্রমাণিত হয়। এটি এমন একটি বাক্য যা বর্ণনার জন্য ব্যাখ্যা এবং ছবির জন্য যোগসূত্রের মর্যাদা রাখে। যেখান থেকে হালকা ঢং এর বর্ণনা এবং উঁচু মানের নির্মাণ শৈলীর রাস্তা পৃথক হয়ে যায়। যেমন নিম্নোক্ত আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لايعقلون -

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার নিকট সমস্ত প্রাণীর তুলনায় নিকৃষ্ট সেইসব মূক ও বধির যারা উপলব্ধি করে না।" [২৩]

الدواب শব্দটি সাধারণ জীবজন্তুর বেলায় ব্যবহার হয়। অবশ্য অনেক সময় এ শব্দটি দিয়ে মানুষকেও বুঝানো হয়। কেননা, دابة শব্দ দিয়ে ভূ-পৃষ্ঠের বিচরণকারী সকল প্রাণীকেই বুঝায়। যেহেতু মানুষও ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করে তাই মানুষের বেলায়ও এ শব্দটি প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু الدواب শব্দ মানুষ অর্থে গ্রহণ করতে বিবেক বাধ্য নয়। এটি স্বাভাবিকতার বিপরীত। এখানে মানুষের জন্য الدواب শব্দটি ব্যবহার করে বুঝানো হয়েছে, তাদের চরিত্র ও আচার আচরণের পশু সূলভ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, যা তাদের হিদায়াতের পথে প্রতিবন্ধক। এ থেকেই তাদের গাফলতি ও পশুত্বের ছবি পরিপূর্ণ হয়ে যায়। لايعقلون "তারা উপলব্দি করে না" শব্দ দিয়ে একথাটিকে আরো পরিস্কার করে দেখা হয়েছে। আরো একটি উদাহরণ দেখুন ঃ

نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم .

"তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের ক্ষেতসরূপ। নিজেদের ক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছে যাও"। [২৪]

২৩। আল-কুরআন, ৮ : ২২

২৪। আল-কুরআন, ২ : ২২৩

Dhaka University Institutional Repository

এ আয়াতে কয়েক প্রকার গোপন ও প্রকাশ্য মিল পাওয়া যায়। এখানে স্বামী-স্ত্রীর স্পর্শকাতর সম্পর্ক বড় সূক্ষ্ম ও আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সবচেয়ে আকর্ষণীয় উপমা হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে একজন কৃষক তার জমির সাথে তুলনা করা হয়েছে। জমি যেমন ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্র, তদ্রুপ স্ত্রীও সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্র। জমির ফসল দিয়ে যেমন গোলা পরিপূর্ণ করা হয়, তদ্রুপ স্ত্রীর মাধ্যমে সন্তান উৎপাদন করে বংশধারাকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে গোটা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সঠিক ও সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

অনেক সময় শুধুমাত্র একটি শব্দ পুরো বাক্য নয়, ছবির আংশিক পূর্ণতার স্বাক্ষর বহন না করে বরং পুরো ছবিটিকেই উদ্ভাসিক করে তোলে। চিত্রায়ন পদ্ধতিতে এ মিল পূর্বের চেয়েও জোরালো। এটি পূর্ণতার কাছাকাছি প্রায়। এর গুরুত্ব বেশী হওয়ার কারণে পূর্ণ বাক্য ব্যতিরেকে শুধুমাত্র একটি শব্দই একটি চিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম। এ শব্দটি কর্ণগোচর হওয়া মাত্র মনের মুকুরে ভেসে উঠে একটি পরিপূর্ণ চিত্র।[২৫]

يايها الذين امنوا مالكم اذاقيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم الى الارض .

"হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের কি হয়েছে, যখন আল্লাহর পথে তোমাদেরকে বের হওয়ার জন্য বলা হয়, তখন তোমরা জমিন আকড়ে পড়ে থাকো।[২৬]

এ আয়াত পাঠ করলে যখন اثاقلتم শব্দটি কর্ণগোচর হয় তখনই চিন্তার জগতে একটি ভারী বস্তুর প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে। মনে হয় কোন ব্যক্তি যেন ভারী বস্তুকে ওঠানোর জন্য বার বার চেষ্টা করছে। কিন্তু তা ভারী হওয়ার কারণে ওঠাতে পারছে না। মনে হয় শব্দটি ওজনে কয়েক টন। যদি আয়াতে تثاقلتم বলা হত (মূলত দু'টো শব্দের একই) তবে পূর্বের মত এতো ভারী বুঝতো না। উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যেত। কিন্তু ব্যবহৃত শব্দটি এতো যথার্থ প্রয়োগ হয়েছে যে, শ্রোতা শোনামাত্র দুঃসাধ্য এক ভারী বোঝার চিত্র তার কল্পনার চোখে ভেসে ওঠে।

৬. উপরের উদাহরণগুলো ছিল দু'টো বিপরীত ধর্মী চিত্র। কিন্তু এবার আমরা এমন কিছু উদাহরণ পেশ করব যা বিপরীত ধর্মী বটে কিন্তু তার একটি অতীতের এবং অপরটি বর্তমান কালের। অতীতকে কল্পনায় বর্তমানে নিয়ে এসে দু'টো অবস্থার বিপরীতধর্মী ছবি আকাঁ হয়েছে।[২৭] যেমন ঃ

خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين .

"তিনি মানুষকে এক ফোটা বীর্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তা সত্ত্বেও সে প্রকাশ্য বিতান্ডাকারী।"[২৮]

২৫। সাইয়্যেদ কুতুব মুহাম্মদ খলিলুর রহমান অনুদিত, *আল-কুআনের শৈল্পিক সৌন্দর্য*, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৪২২হি. পৃ. ১১৫-১১৮

২৬। আল-কুরআন, ৯ : ৩৮

২৭। সাইয়্যেদ কুতুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

২৮। আল-কুরআন, ৮ : ৪

Dhaka University Institutional Repository

যে অবস্থা বর্তমানে আমাদের সামনে উপস্থিত, তা একজন প্রকাশ্যে ঝগড়াটে خصيم مبين ব্যক্তির কিন্তু অতীতে সে ছিল সামান্য এক ফোটা বীর্য মাত্র।

এ দু' অবস্থার মধ্যে যে ব্যাপক ব্যবধান, তাই এখানে বুঝানো উদ্দেশ্য। এজন্য দু'টো অবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থা উহ্য রাখা হয়েছে। যেন এ কথা প্রকাশ করা যায় যে, মানুষের শুরু যদি এই হয়ে থাকে তাহলে তার ঝগড়া করা সাজে না।[২৯]

অনুরূপ আরেকটি উদাহরণ ঃ

وذرنى والمكذبين اولى النعمة ومهلهم قليلا ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصة عذابا عليما - المزمل ،

"বিত্তবৈভবের অধিকারী মিথ্যারোপকারীদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দাও এবং তাদেরকে কিছু অবকাশ দাও। নিশ্চয় আমার কাছে আছে শিকল, অগ্নিকুন্ড গলগ্রহ হয়ে যায় এমন খাদ্য এবং যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি"।[৩০]

এখানে দু'টো অবস্থার মধ্যে বৈপরিত্য দেখা যায়। এক অবস্থাতো বর্তমানে উপস্থিত অর্থাৎ বিত্তবৈভবের অহংকার। আরেক অবস্থা বর্তমানে অনুপস্থিত, শুধু কল্পনার রাজ্যে সীমাবদ্ধ। বাস্তবে এর কোন অস্তিত্ব নেই। এ উদাহরণ থেকে আল-কুরআনের শৈল্পিক গুরুত্বই প্রকাশ পাচ্ছে।

আল-কুরআনের ভাষা শৈলীর বিভিন্ন রূপ

আল-কুরআনের সুর ও ছন্দ

আল-কুরআনের ভাষার সুর ও ছন্দ বিন্যাসকে 'সাজা' বলে। এর কোন নির্দিষ্ট অন্তমিল না থাকলেও এর মধ্যে কাব্যিক বা ছান্দনিক ভাব পুরোপুরি বিদ্যমান। যা তার বক্তব্য উপস্থাপনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যেহেতু সমস্ত কুরআনই ছন্দ সেহেতু সর্বত্রই সুর ও তাল বিদ্যমান। দেখা গেছে একই শব্দে বিভিন্ন অক্ষর এবং একই আয়াত ও তার শেষ শব্দ ছান্দিক নিয়ম কানুন মেনে চলে। চাই সে আয়াত ছোট হোক কিংবা বড় হোক।

তাছাড়া কুরআন গদ্য ও পদ্য উভয়কেই সুন্দরভাবে আত্মস্থ করে নিয়েছে। আল-কুরআন মাত্রা (وزن) ও অন্তমিল (قافية) থেকে স্বাধীন এবং এতে মিল থাকতেই হবে এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা কুরআনের নেই। তবু সেখানে সুর ও ছন্দ বর্তমান আয়াতের শেষ মিত্রাক্ষরের প্রয়োজন, কুরআন সে প্রয়োজনও অবশিষ্ট রাখেনি। সেই সাথে আমরা উপরে কাব্যের যে বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করে নিয়েছি সেগুলো সে ধারণ করে নিয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, কুরআন গদ্য ও পদ্য উভয় বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমান।

২৯। সাইয়্যেদ কুতুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

৩০। আল-কুরআন, ৭৩ : ১১-১৩

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ যখন কুরআন তেলাওয়াত করে তখন বাহ্যিক উচ্চারণে সে মাত্রা ও অন্তমিল দেখে, বিশেষ করে এ ব্যাপারটি ছোট ছোট আয়াত সম্বলিত সূরা গুলোতেই দৃষ্টিগোচর হয়। অথবা ঐ সমস্ত স্থানে যেখানে কোন ঘটনা চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। অবশ্য দীর্ঘ আয়াতের সূরাগুলোতেও এটি আছে তবে এতোটা সুস্পষ্ট নয়।

নিচের উদাহরণগুলোতে তা লক্ষণীয়, যেখানে সুর, ছন্দ ও মাত্রার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে ঃ

والنجم اذا هوى . ما ضل صاحبكم وما غوى . وما ينطق عن الهوى. ان هو الا وحى يوحى-

"নক্ষত্রের কসম, যখন তা অস্তমিত হয়। তোমাদের বন্ধু পথভ্রষ্ট কিম্বা বিপদগামী নয় এবং প্রবৃত্তির তারণায়ও কথা বলে না। তিনি তাই বলেন যা কুরআনে ওহী বা প্রত্যাদেশ হয়।"[৩১]

فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفواد ما راى .

"অতঃপর নিকটবর্তী হলো এবং ঝুলে রইলো, তখন ব্যবধান ছিল দুই ধনুক কিংবা তার চেয়ে কম। তখন বান্দার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করার তা প্রত্যাদেশ করলেন। রাসূলের অন্তর মিথ্যা বলেনি যা তিনি দেখেছে।"[৩২]

انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر .

"নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওছার দান করেছি। অতঃপর আপনার প্রভূর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন। যে আপনার শত্রু সেইতো লেজকাটা নির্বংশ।"[৩৩]

প্রথম বর্ণিত আয়াতগুলোতে প্রতিটি "و" অক্ষর দিয়ে শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় বর্ণিত আয়াতগুলোতে "ي" অক্ষর দিয়ে শেষ করা হয়েছে এবং তৃতীয় বর্ণিত আয়াতগুলোতে "ر" অক্ষর দিয়ে শেষ করা হয়েছে। কুরআনের অনেক সূরা বা আয়াতে এরূপ সুর ও ছন্দের অন্তমিল লক্ষ করা যায়। কুরআনের আয়াত গদ্যই হোক বা পদ্যই হোক এর একটি চিরস্থায়ী প্রভাব পাঠক বা শ্রবণকারীর উপর পড়ে। এই প্রভাব নিঃসন্দেহে কুরআনের বিন্যাসশৈলীর কারণে।[৩৪]

কুরআনের সাহিত্য শৈলী

কুরআনের সাহিত্যশৈলী মানব রচিত সাহিত্যশৈলীর আওতায় পড়ে না। মানব রচিত সাহিত্যশৈলিতে যেমন গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, উপন্যাস, নাটক ও পৌরানিক কাহিনী লক্ষ্য করা যায় কিন্তু কুরআনের ক্ষেত্রে তা ব্যতিক্রম। মিঃ বেল -এর মতে, "কুরআন মুহাম্মদ (সাঃ) কে একজন কবি হিসেবে স্বীকৃত দেয় না ; বরং তাঁর কাজ ছিল আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া"। কুরআনের ভাষা যতটা না শিল্প সৌন্দর্য মন্ডিত, তার চেয়ে বেশী উদ্দেশ্য মূলক।[৩৫]

৩১। আল-কুরআন, ৫৩ : ১-৪

৩২। আল-কুরআন, ৫৩ : ৯-১২

৩৩। আল-কুরআন, ১০৮ : ১-৩

৩৪। সাইয়্যেদ কুতুব, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৩৪-১৩৫

৩৫। The Encyclopadia of Islam (Urdu) Lahor : The University of panjab, p. 125.

Dhaka University Institutional Repository

যুগে যুগে আরব সাহিত্যিক ও ভাষাবিদগণ কুরআনের শৈল্পিক বিন্যাস ও শৈলী সম্পর্কে দারুনভাবে মুগ্ধ হয়েছেন। তাদের মতে, কুরআনের ভাষা ও সাহিত্য শৈলীর কোন তুলনা নেই। এটি শাশ্বত চিরন্ত ন মু'জিযা যার চ্যালেঞ্জ সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য।

আয়াতের পুনারাবৃত্তির গুরুত্ব

সাধারণ সাহিত্যকর্মে একই কথার পুনরাবৃত্তি যেখানে বিরক্তির উদ্রেক করে, সেখানে এই মহাগ্রন্থের আয়াতের পুনারাবৃত্তি ঘটলে পাঠক ও শ্রোতার মনে স্বর্গীয় সুখানুভূতি অনুভব করে। এটা সম্ভব হয়েছে কুরআনের অনুপম সাহিত্য শৈলীর কারণেই। যেমন ঃ فبای الاء ربکما تکذبان

"অতএব, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে।"[৩৬]

আয়াতটি সূরা আর-রাহমানে ৩১ বার ব্যবহার করা হয়েছে। পাঠক ও শ্রোতা আয়াতটি পাঠ কিম্বা শ্রবণ করে বিরক্তির পরিবর্তে সুখানুভূতি লাভ করেন।

কুরআনের শব্দ চয়নের তাৎপর্য

কুরআনের ভাষার শৈল্পিক বিন্যাসের আরেকটি দিক হলো শব্দচয়ন পদ্ধতি। বিভিন্ন আয়াত এমন কিছু উপযোগী শব্দ চয়নের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বিন্যাস করা হয়েছে, যাতে বাক্য বা আয়াতের বক্তব্য পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। যথা ঃ

کلا لئن لم ینته لنسفعا بالناصیة ناصیة کاذبة خطئة.

"কখনই নয়, যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি মস্তকের সামনের কেশগুলো ধরে হেচড়াইব। মিথ্যাচারী পাপীর কেশগুচ্ছ।"[৩৭]

আয়াতে কিছু শব্দকে সুপরিকল্পিতভাবে বিন্যাস করা হয়েছে। যেমন ঃ لنسفعا শব্দের স্থলে যদি এর সমার্থবোধন শব্দ لناخذن ব্যবহার করা হতো, তবে অর্থের দিক দিয়ে তা এত বেশী তাৎপর্যমন্ডিত হতো না, যা لنسفعا দ্বারা বুঝানো হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে ناصیة کاذبة خطئة শব্দটি তাৎপর্য হচ্ছে কোন অহংকারী বিদ্রোহীকে উঁচু স্থান থেকে তার কপালের চুল ধরে হেচকা টানে ভুলুন্ঠিত করে টেনে হেচড়ে নিয়ে যাওয়া। টেনে হেচড়ে নেওয়ার সময় অবশ্য সে নিজের সঙ্গী সাথীদের নিকট চিৎকার করে সাহায্য চাইতে থাকে। এ কথা শুনে শ্রোতাগণ ধারণা করেন যে, জাহান্নামের পাইকপেয়াদাগণ এবং ঐ ব্যক্তির সাথীদের মধ্যে সেদিন সংঘর্ষ বেঁধে যাবে, এতে যুদ্ধের ময়দানের এক ভয়ংকর চিত্র মানসপটে ভেসে ওঠে। এ জন্যে আল্লাহ তাদের হটকারিতায় কান না দিয়ে রাসূল (সাঃ) কে তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন এভাবে- کلا لا تطعه واسجد واقترب "কখনো তুমি তার কথায় প্রভাবিত হয়ো না, তুমি সিজদা করো ও আমার নৈকট্য অর্জন করো।"[৩৮]

৩৬। আল-কুরআন, ৫৫ : ১৩

৩৭। আল-কুরআন, ৯৬ : ১৫-১৬

৩৮। আল-কুরআন, ৯৬: ১৯

Dhaka University Institutional Repository

উপরিউক্ত আয়াতগুলো বাহ্যিকভাবে অবিন্যস্ত মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে বিন্যাসিত ও পরস্পর সংশ্লিষ্ট। শব্দগুলো শৈল্পিক ভাবেই বিন্যাস্ত। আল্লাহর বাণী ঃ واستعل الراس شيبا "মাথায় বার্ধক্যের ছাপ লেগেছে"। আয়াতে উল্লেখিত استعل الراس شيبا কে এভাবে না বলে যদি আল্লাহ استعل الراس شيبا বলতেন তাহলে তা শৈল্পিক মানসম্মত হতো না। কেননা, বিন্যাস পদ্ধতিটি তাৎপর্যপূর্ণ ও শক্তিশালী। আল্লাহর বাণী ঃ

الم تر ان ا لله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان فى ذلك لذكرى للاولى الالباب .

"তুমি দেখ না, আল্লাহ আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর ভূমিতে নির্ঝররূপে প্রবাহিত করেন এবং তা হতে বিবিধ ফসল উৎপাদন করেন। অতঃপর তা শুকিয়ে যায় এবং তোমরা তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তিনি তা খড়-কুটায় পরিণত করেন। অবশ্য তাতে বোধ শক্তি সম্পন্নগণের জন্য উপদেশ রয়েছে"।[৩৯]

এ আয়াতে "ثم " শব্দটি যেভাবে যেখানে ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে চোখ ও মনকে চিন্তা ভাবনার পূর্ণ সুযোগ দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থা চোখের সামনে উদ্ভাসিত হওয়ার পূর্বেই। কোন দৃশ্য মানুষকে চোখের সামনে তুলে ধরতে যে ধরনের বিন্যাস ও উপস্থাপনার প্রয়োজন তা এ আয়াতে আছে।[৪০]

আল-কুরআনে বাক্যান্তে বিরতি ও অন্তমিল

সুর ও ছন্দের মত আল-কুরআনে বাক্যান্তে বিরতি ও অন্তমিল লক্ষ্য করা যায়। বাক্যান্তে বিরতি অন্তমিলনের ধরন বিভিন্ন সূরায় বিভিন্ন রকমের। অনেক সময় একই সূরাও একাধিক নিয়মের প্রয়োগ দেখা যায়। বিভিন্ন সূরার বাক্যান্তে বিরতির যেসব পার্থক্য পাওয়া যায়, তা বাক্য ছোট বড় কিম্বা মধ্যম হওয়ার উপর নির্ভর করে। এর স্বরুপ সেরুপ, যেরুপ কবিতার পদ্ধতিতে কোন লাইন ছোট আবার কোন লাইন বড় হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে শেষ যে কথা বলা যেতে পারে তা হচ্ছে ছোট সূরার আয়াতান্তে বিরতিও স্বল্প। আর মাঝারি ধরনের আয়াতে বিরতিও মধ্যম এবং বড় ধরনের আয়াতে বিরতিও দীর্ঘ। আর যদি অন্তমিলনের দিকে লক্ষ্য করি তবে দেখা যায় ছোট সূরাগুলোতে ছন্দের সাথে উদাহরণগুলো বেশ ঘনিষ্ঠ আবার বড় সূরাগুলোতে তাদের ঘনিষ্ঠতা কম। আল-কুরআনের সূরা সমূহের মধ্যে যে অন্তমিল পাওয়া যায় এবং সেগুলোর ব্যবহার তা হচ্ছে (নুন) ن (মীম) م এবং তার পূর্বে (ওয়াও) و অথবা (ইয়া) ي । উদ্দেশ্য সূরা ও ছন্দের মত এখানেও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা।[৪১]

৩৯। আল-কুরআন, ৩৯ : ২১

৪০। সাইয়্যেদ কুতুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

৪১। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

Dhaka University Institutional Repository

যে সমস্ত জায়গায় আমরা বাক্যান্তে বিরতি ও অন্তমিলের রহস্য বুঝতে পারি তার মধ্যে সূরা 'মারইয়াম' একটি। চিন্তা করুন, এ সূরা শুরু হয়েছে হযরত জাকারিয়া (আঃ) ও হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) এর ঘটনা দিয়ে। তারপর তার সাথে হযরত মারইয়াম ও ঈসা (আঃ)-এর ঘটনাটি জুড়ে দেয়া হয়েছে। এ সূরায় বাক্যান্তে বিরতি ও অন্তমিল নিম্নরূপ। যা সূরার শুরুতে বর্ণনা করা হয়েছে।

ذكر رحمت ربك عبده ذكريا ـ اذ نادى ربه نداء خفيا

"এটি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি। যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহবান করেছিলেন নিভৃতে।"[৪২]

তারপর মারইয়ামের ঘটনা শুরু হয়েছে এভাবে ঃ

واذكر فى الكتاب مريم اذا انتبذت من اهلها مكانا شرقيا ـ فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا .

"এই কিতাবে মারইয়ামের কথা বর্ণনা কর, যখন তিনি পরিবারের লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে একস্থানে আশ্রয় নিলেন। অতঃপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য তিনি পর্দা করলেন।[৪৩]

হযরত জাকারিয়া (আঃ) ও হযরত মারইয়ামের ঘটনা শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষর বা হরফে রাবি (حروف راوى) একই বর্ণের মাধ্যমে সমাপ্তি করা হয়েছে। আবার যেখানে হযরত ঈসা (আঃ) এর ঘটনা শেষ করা হয়েছে সেখানে এ পদ্ধতির কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়।

قال انى عبد الله اتنى الكتاب وجعلنى نبيا وجعلنى مبركا اين ما كنت واوصنى بالصلوة والزكوة مادمت حيا ـ وبرا بوالدتى ولم يجعلنى جبارا شقيا ـ والسلام على يوم ولدت ويوم اموت ويوم يبعث حيا .

"আমিতো আল্লাহর বান্দা তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবী করেছেন। আমি যেখানেই থাকি তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে এবং জননীর অনুগত থাকতে। আর আমাকে তিনি উদ্ধত ও হতভাগ্য করেন নি। আমার প্রতি ছালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হবো।[৪৪]

সূরা আল-ইমরানের পুরো সূরাটিতেই 'নুন' এবং 'মীম' এর অন্তমিল বিদ্যমান। যা আল-কুরআনের সাধারণ একটি রীতি। যখন সূরা সমাপ্তির কাছাকাছি পৌঁছেছে এবং একদল ঈমানদারের দো'আর প্রসঙ্গ এসেছে, তখন অন্তমিলনের ধরনও পরিবর্তন হয়ে গেছে।

৪২। আল-কুরআন, ১৯ : ২-৪

৪৩। আল-কুরআন, ১৯ : ১৬-১৭

৪৪। আল-কুরআন, ১৯ : ৩০-৩৩

Dhaka University Institutional Repository

যেমন আল-কুরআনে উল্লেখ রয়েছে,

ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحنك وقنا عذاب النار ـ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظلمين من انصار .

(ঈমানদারগণ বলে ঃ) হে পরওয়ারদিগার ! এসব আপনি অনর্থক সৃষ্টি করেন নি। সকল পবিত্রতা আপনার। আমাদেরকে আপনি জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে দিন। হে প্রতিপালক ! নিশ্চয় আপনি যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করলেন তাকে অপমানিত করে ছাড়লেন। আর জালিমের জন্য তো সাহায্যকারী নেই।[৪৫]

বাক্যান্তে বিরতি ও অন্তমিল পরিবর্তনের ধারা আল-কুরআনের অনেক জায়গায়ই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সকল জায়গায় পরিবর্তনের রহস্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা বলতে পারি না।

আল-কুরআনের সূরা ও ছন্দের রীতি-নীতি, আলোচ্য বিষয়ও স্থানের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তন হয়ে যায়। তবু জোড় দিয়ে বলা যায়, কুরআনের সুরা ও ছন্দ একটি বিশেষ নিয়মের অধীন। সর্বদা তা বাক্য ও তার পরিধির অনুরূপ হয়ে থাকে। এটি এমনই একটি নীতি যার কোন ব্যতিক্রম ঘটে না।[৪৬]

সূরা আন্ নাযিয়াতে সূরা ও ছন্দের দু'টি নীতি আছে যা এ সূরায় পাওয়া যায়। সূরার এ অংশটি ছোট-ছোট বাক্যের সমাহার এ সমস্ত বাক্যে মৃত্যু ও কিয়ামতের ধারা বর্ণনা করা হয়েছে। যেখানে দ্রুত ও বলিষ্ঠ তাৎপরতা পাওয়া যায়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

النزعت غرقا ـ والنشيطت نشطا ـ والسبحت سبحا ـ والسبقت سبقا.

"শপথ সেই ফেরেশতাগণের যারা ডুব দিয়ে আত্মা উৎপাটন করে। শপথ তাদের যারা আত্মার বাঁধণ খুলে দেয় মৃদুভাবে। শপথ তাদের যারা শন্তরণ করে দ্রুতগতীতে। শপথ তাদের যারা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়"।[৪৭]

সূরা ও ছন্দের দ্বিতীয় প্রকার পাওয়া যায় নিমোক্ত আয়াতগুলোতে। এ আয়াতগুলো ধীরগতি সম্পন্ন এবং দীর্ঘতম দিকে মধ্যমাকৃতির। হযরত মূসা (আঃ) সংক্রান্ত যে সমস্ত আলোচনা এসেছে এ আয়াত ক'টি তারই অংশ বিশেষ। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

هل اتك حديث موسى اذ ناده ربه بالواد المقدس طوى ـ اذهب الى فرعون انه طغى ـ فقل هل لك الى ان تزكى .

"মূসা (আঃ)-এর বৃত্তান্ত তোমার নিকট পৌঁছেছে কি ? যখন তার রব তাকে তূর উপত্যকায় আহবান করেছিলেন, (এবং বলেছিলেন) ফির'আউনের নিকট যাও, নিশ্চয় সে সীমালংঘন করছে। অতঃপর বলো তোমার পবিত্র হওয়ার আগ্রহ আছে কি ?"[৪৮]

৪৫। আল-কুরআন, ৩ : ১৯১-১৯২

৪৬। সাইয়্যেদ কুতুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫-১৪৬

৪৭। আল-কুরআন, ৭৯ : ১-৪

৪৮। আল-কুরআন, ৭৯ : ১৫-১৯

Dhaka University Institutional Repository

আমি ওপরে দু'ধরনের সুর ও ছন্দের আলোচনা করলাম। আমার মনে হয় এ দু'ধরনের পার্থক্য ও নিয়ম-নীতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই। দু'টোর মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট। উভয়টির আলোচনাস্থলও এক ও অভিন্ন। উভয়স্থানে সুর ও ছন্দ স্বকীয়তায় ভাস্বর।

এবার সুর ও ছন্দের তৃতীয় প্রকার নিয়ে আলোচনা করব। এ প্রকারের সুর ও ছন্দ বিশেষ করে দো'আর বাক্যসমূহতে পাওয়া যায় এবং সেখানে নরম সুর হৃদয়ের আবেগকে তুলে ধরা হয়। অবশ্য এধরণের আয়াতগুলো কিছুটা দীর্ঘ। যেমন ঃ

ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحنك فقنا عذاب النار ـ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظلمين من انصار ـ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادى للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفرلنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار.

"হে পরওয়ারদিগার ! এসব আপনি অনর্থক সৃষ্টি করেন নি। সকল পবিত্রতা আপনার, আমাদেরকে আপনি দোজখের শাস্তি থেকে বাঁচান। হে আমাদের পালনকর্তা ! নিশ্চয় আপনি যাকে দোজখে নিক্ষেপ করলেন তাকে অপমানিত করে ছাড়লেন। আর জামিলদের জন্যতো কোন সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা নিশ্চতরূপে জেনেছি একজন আহবানকারীকে ঈমানের দিকে আহবান করতে। (এই বলে যে,) তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আনো। তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে প্রভু ! আমাদের সকল গুনাহ মাফ করে দিন এবং আমাদের সকল দোষ-ত্রুটি দূর করে দিন এবং আমাদের মৃত্যু দিন নেককার লোকদের সাথে"।[৪৯]

অন্য এক দো'আয় বলা হয়েছে ঃ

ربنا انك تعلم ما نخفى وما نعلن وما نخفى على الله من شئ ـ فى الارض ولا فى السماء الحمد لله الذى وهب على ا لكبر اسمعيل واسحق ان ربى لسميع الدعا .

"হে আমাদের প্রতিপালক ! আপনিতো জানেন, যা আমরা গোপনে করি এবং প্রকাশ্যে করি। আল্লাহর কাছে পৃথিবীতে ও আকাশে কোন কিছুই গোপন নেই। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে বার্ধ্যকে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা দো'আ শ্রবণ করেন।[৫০]

এখানে আল-কুরআনের সুর-তরঙ্গের আরো একটি ছন্দায়িত ধরন সম্পর্কে আলোচনা করব। কিন্তু এটি ওপরের উদাহরণের মত বেশী মনোযোগ ও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে না। ইরশাদ হচ্ছেঃ

يايتها النفس المطمئنة ـ ارجعى الى ربك راضية مرضية ـ فادخلى فى عبدى وادخلى جنتى .

"হে প্রশান্ত মন, তুমি তোমার রবের দিকে প্রত্যাবর্তন করো সন্তুষ্টি ও স্নেহভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তভূর্ক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর"।[৫১]

৪৯। আল-কুরআন, ৩ : ১৯১-১৯২
৫০। আল-কুরআন, ১৪ : ৩৮-৩৯
৫১। আল-কুরআন, ৮৯ : ২৭-৩০

Dhaka University Institutional Repository

যখন পাঠক উচ্চস্বরে এ আয়াত পাঠ করেন তখন এর কোমল সুর-তরঙ্গ অনুভূত হয়। এ আয়াতে যে সুর-তরঙ্গ পাওয়া যায়, তা ঐ তরঙ্গের মতো যা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেয়ে শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যায়। ঐ আয়াতে প্রাপ্ত সুর-তরঙ্গ মৃদু ও তীব্র উভয় অবস্থায়ই শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। আমি এ প্রসঙ্গের এখানেই যবনিকা টানলাম। যেন সুর-তরঙ্গের অর্থে সাগরে আর হাবুডুবু খেতে না হয়।[৫২]

আল-কুরআনের সম্মোহনী শক্তি

আল-কুরআন অবতীর্ণের প্রাক্কালে স্বয়ং কুরআনই আরবদেরকে সম্মোহনী শক্তিতে সম্মোহিত করেছিল। যার অন্তরকে আল্লাহ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন তিনি এবং যাদের মনের উপর ও চোখের উপর পর্দা পড়ে গিয়েছিল তারাও এ কুরআনের সম্মোহনী শক্তির প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে। যদিও তারা এ কুরআন থেকে কোন উপকৃত হতে পারে নি। কিন্তু কতিপয় ব্যক্তিত্ব এমন ছিলেন, যারা শুধুমাত্র নবী করীম (সাঃ)-এর অনুপম ব্যক্তিত্ব ও মাধুর্যে প্রভাবিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। যথা ঃ রাসূল (সাঃ)-এর স্ত্রী মুহ্তারামা খাদিজা (রা.), হযরত আবু বকর (রা.), হযরত আলী (রা.), তাঁর মুক্ত করা কৃতদাস যায়িদ (রা.) প্রমুখ। এদের ছাড়া প্রাথমিক পর্যায়ে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তখন রাসূল (সাঃ) এর এতবেশী শক্তি ও ক্ষমতাশালী ছিলেন না যে, তারা তাঁর ক্ষমতা ও শক্তিমত্তায় বিমোহিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বরং তাদের ইসলাম গ্রহণের মূলে ছিল আল-কুরআনের মায়াবী আকর্ষণ।[৫৩]

হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা এবং ওয়ালিদ বিন মুগিরার প্রভাবিত হওয়ার ঘটনা দু'টো উপরোক্ত ব্যক্তব্যকেই স্বীকৃতি দেয় এবং প্রমাণ করে যে, আল-কুরআনের সম্মোহনী শক্তি অত্যন্ত প্রবল। যা শুধু ঈমানদারদের নয় বরং কাফিরদেরকেও প্রভাবিত করতো।

হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে আতা ও মুজাহিদ (র.) এক রিওয়ায়াতে বর্ণনা করেছেন যা ইব্ন ইসহাক আবদুল্লাহ বিন আবু নাজিয়াহ থেকে সংকলন করেছেন। হযরত ওমর (রা.) বলেন ঃ

আমি সেই দিন ইসলাম থেকে অনেক দুরে অবস্থান করছিলাম, শরাব পানে মত্ত থাকতাম। আমাদের একটি মিলনায়তন ছিল, যেখানে কুরাইশরা এসে জমায়েত হতো। সেই দিন আমি তাদের সন্ধানে গেলাম, কিন্তু কাউকে সেখানে পেলাম না। চিন্তা করলাম অমুক শরাব বিক্রেতার নিকট যাবো, হয়তো সেখানে তাদেরকে পেয়ে যেতে পারি। কিন্তু সেখানে আমি তাদের কাউকে পেলাম না। তখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, মসজিদে হারামে গিয়ে তাওয়াফ করবো। সেখানে গেলাম। দেখলাম হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নামাযে মশগুল। তিনি শাম (সিরিয়ার) দিকে মুখ করে নামাযে দাঁড়িয়েছেন। কা'বা তাঁর ও শামের মাঝে অবস্থিত। তিনি রুকনে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়েমেনীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন। তাঁকে দেখে ভাবলাম, আজ রাতে আমি চুপে চুপে শুনবো, তিনি কি পড়েন। আবার মনে হলো, যদি শুনার জন্য কাছে চলে যাই তবে তো আমি ধরা পড়ে যাব, তাই হাতিমের দিক থেকে এসে কা'বার গেলাফের নীচে চুপ করে বসে রইলাম। আমার ও তাঁর মাঝে একমাত্র কা'বার গেলাফ ছাড়া অন্য কোন আড়াল ছিলো না। যখন আমি নবী করীম (সাঃ)-এর তিলাওয়াত শুনলাম, তখন আমার মধ্যে এক ধরনের ভাবান্তর সৃষ্টি হলো। আমি কাঁদতে লাগলাম। তার পরিণতিতে আমার ইসলাম গ্রহণে সৌভাগ্য হলো।[৫৪]

৫২। সাইয়্যেদ কুতুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

৫৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৫৪। প্রাগুক্ত,পৃ.২৪

Dhaka University Institutional Repository

ইব্‌ন ইসহাকের আরেক বর্ণনায় আছে, একদিন ওমর (রা.) হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে হত্যা করার জন্য নগ্ন তরবারী নিয়ে রাওয়ানা হলেন। সাফা পাহারের পাদদেশে কতিপয় সাহাবীর সাথে নবী করীম (সাঃ) একটি ঘরে বসবাস করতেন। সেখানে প্রায় চল্লিশ জনের মতো পুরুষ ও মহিলা ছিলেন। পথিমধ্যে না'ঈম বিন আবদুল্লাহর সাথে দেখা, তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ ওমর ! তুমি কোথায় যাচ্ছো ? ওমর তার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। না'ঈম বললেন বনী মুনাফের শত্রুতা পরে, তার আগে নিজের বোন ফাতিমা এবং ভগ্নিপতি সাঈদ বিন সায়িদকে সামলাও। তারা মুসলমান হয়ে গেছে। তখন ওমর (রা.) সেখানে গিয়ে দেখলেন, খাববাব (রা.) তাদেরকে কুরআন শরীফ পড়াচ্ছেন।

ওমর (রা.) সরাসরি দরজার ভেতর ঢুকে পড়লেন এবং ভগ্নিপতি সাঈদকে ধরে ফেললেন, নিজের বোন ফাতিমার মাথায় আঘাত করে রক্তাক্ত করে দিলেন। কিছুক্ষণ বাকবিতন্ডায় পর তারা যা পড়ছিলো তা দেখতে চাইলেন। তখন সূরা ত্ব-হা থেকে কিছু অংশ পাঠ করে তাকে শুনানো হলো। যখন সূরা ত্ব-হার কিছু অংশ শুনলেন, তখন হযরত ওমর (রা.) মন্তব্য করলেন, এতো অতি উত্তম কথাবার্তা। তারপর তিনি রাসূল করীম (সাঃ)-এর নিকটে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন।

এ বিষয়ে সমস্ত বর্ণনায় মূল কথা একটি। তা হচ্ছে হযরত ওমর (রা.) কুরআনের কিছু অংশ পড়ে অথবা শুনে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেন। আমরা তো এ ঘটনা শুনি কিংবা বলি কিন্তু এ দিকে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় না যে হযরত ওমর (রা.)-এর যে পরিবর্তন হয়ে ছিল তার মূলে ছিলো আল-কুরআনের আকর্ষণ ও অপ্রতিরোধ্য সম্মোহণী শক্তি।[৫৫]

ওয়ালিদ বিন মুগিরার ঘটনা

ওয়ালিদ বিন মুগিরা কুরআনে হাকীমের কিছু অংশ শুনে তার প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এটি কুরাইশরা বলাবলি শুরু করল, সে মুসলমান হয়ে গেছে। ওয়ালিদ ছিলেন কুরাইশ বংশের এক সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত ব্যক্তি। আবু জাহেলকে তাঁর কাছে পাঠানো হলো। যেন তিনি কুরআনের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের কথা ঘোষণা দেন, যেন কুরাইশরা তার ঐ কথায় প্রভাবিত হয়।

ওয়ালিদ বলতে লাগলেন ঃ আমি কুরআন সম্পর্কে কী বলবো ? আল্লাহর কসম ! আমরা কবিতা ও কাব্যে তোমাদের চেয়ে বেশী জ্ঞান রাখি কিন্তু মুহাম্মদের কাছে যে, কুরআন শুনেছি, তার সাথে এর কোন মিল নেই। আল্লাহর শপথ ! তাঁর কাছে যা অবতীর্ণ হয়, তা অত্যন্ত চমৎকার ও মনোমুগ্ধকর এবং তা প্রাঞ্জল ভাষায় অবতীর্ণ। যা তার সামনে আসে তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। ওটি বিজয়ী হতে এসেছে, পরাজিত হতে আসেনি।

এ কথা শুনে আবু জাহেল বললো ঃ যতক্ষণ তুমি কুরআনকে অবজ্ঞা না করবে ততোক্ষণ তোমার কওম তোমার উপর নারাজ থাকবে। ওয়ালিদ বললেন ঃ আমাকে একটু চিন্তা করার অবকাশ দাও। তারপর তিনি ঘোষণা দিলেন ঃ "এতো সুস্পষ্ট যাদু, তোমরা দেখো না, যে এর সংস্পর্শে যায় তাকেই তার পরিবার ও বন্ধু বান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়"।[৫৬]

৫৫। সাইয়্যেদ কুতুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪

৫৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا سحر يؤثر.

"সে চিন্তা করেছে এবং মনঃস্থির করেছে। সে ধ্বংস হোক, কিভাবে সে মনঃস্থির করেছে। সে দৃষ্টিপাত করেছে সে আবার ভ্রুকুঞ্চিত ও মুখ বিকৃত করেছে। অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে এবং অহংকার করে বলেছে ঃ এতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু বৈ আর কিছু নয়"।[৫৭]

এ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির বক্তব্য যে, ইসলামের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করতো। মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট পৌছলে নিজের অজান্তেই তাদের মন ও মাথা ঝুকে পড়ে কিন্তু যখন বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফিরে আসে তখন সম্মান ও প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য বিদ্রোহ তাদের মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। এতেই প্রমাণিত হয় আল-কুরআনের আকষর্ণীয় শক্তি কত তীব্র যা যাদুকেও হার মানায়।

এখানে ভাবনার বিষয় আল-কুরআন হযরত ওমর ও ওয়ালীদ বিন মুগিরা দু'জনের উপরই প্রভাব ফেললো। কিন্তু তাদের আচার-আচরণে আসমান-যমিনের পার্থক্য। হযরত ওমর (রা.) আল্লাহ তা'আলাকে ভয় পাবার কারণে আল্লাহ তার দিলকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন। পক্ষান্তরে ওয়ালিদ বিন মুগিরাকে অহংকার, দাম্ভিকতা, ও নেতৃত্বের মোহ ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দিলো। কুরআন মাজীদে কাফিরদের কথার যে উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে তাও আল-কুরআনের সম্মোহনী শক্তির একটি প্রমাণ। .. لاتسمعوا لهذا القرآن "তোমরা কুরআন শুনবে না এবং কুরআন পাঠের সময় চেঁচামেচি শুরু করবে, তাতে মনে হয় তোমরা বিজয়ী হবে।"[৫৮]

এখানেও আল-কুরআনের সম্মোহনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের ভয় ছিলো যদি সুষ্ঠভাবে এ কুরআন শুনতে দেয়া হয় বা শোনা হয় তবে তার প্রভাব শ্রোতার ওপর অবশ্যই পড়বে এবং সে তার অনুসারী হয়ে যাবে। কাজেই সকাল-সন্ধায় কুরআন শুনে লোকেরা মোহগ্রস্থ হতে না পারে সে জন্যই শোর-গোল করা বাঞ্চনীয়। কিন্তু যাদের ভেতর সামান্য মাত্রায় হলেও আল্লাহর ভীতি ছিলো শুধু তারাই জাহিলিয়াতের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল। যদি তারা এতে প্রভাবিত না হতো কিম্বা প্রভাবিত হওয়ার ভয় না করত তবে অনর্থক কেন কুরআনের বিরুদ্ধে এতো কাঠখড় পোড়ালো? এতে প্রমাণিত হয় কুরআনের আকর্ষণ কত তীব্র কত দুর্নিবার।[৫৯]

আল-কুরআনে সুন্দরভাবে কুরাইশ কাফিরদের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। যে বক্তব্য দিয়ে তারা কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতো।.... وقالوا اساطير "তারা বলে এগুলো তো পুরাকালের রূপকথা যা সে লিখে রেখেছে। এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় তাকে শিখানো হয়"।[৬০]

৫৭। আল-কুরআন, ৭৪ : ১৮-২৪

৫৮। আল-কুরআন, ৪১ : ২৬

৫৯। সাইয়্যেদ কুতুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৬০। আল-কুরআন, ২৫ : ৫

Dhaka University Institutional Repository

لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين

"তারা আল্লাহর কালাম শুনে বলেঃ "ইচ্ছা করলে আমরাও এমন বলতে পারি। এতো পুরোনো দিনের কিচ্ছা-কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়"।[৬১]

بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر

"এ কুরআন অলিক স্বপ্ন মাত্র। বরং এটি তাঁর মনগড়া কথা বরং সে একজন কবি"।[৬২]

أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين .

"হে রাসূল তাদেরকে বলে দিন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমরা এরকম দশটি সূরা বানিয়ে নিয়ে এসো"।[৬৩] فأتوا بسورة من مثله "কিম্বা এমন একটি সূরাই তৈরী করে আনো"।[৬৪]

কিন্তু তারা এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় একটি সূরা তৈরী করতেও সক্ষম হয়নি। দশটিতো অনেক দূরের কথা। সত্যি কথা বলতে কি, তারা এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণই করেনি। অবশ্যই নবী করিম (সাঃ)-এর ওফাতের পর কতিপয় কুলাংগার নবুওয়াতের দাবী করেছিল বটে, কিন্তু তার পরিণতি ভাল হয়নি। তাদের এ বাতুলতাকে কেউ গুরুত্বই দেয়নি।

রাসূল (সাঃ) কর্তৃক ইসলামের দাওয়াতের প্রাক্কালে পূর্ববর্তী নবীর অনুসারীদের মধ্যে সত্যিকার অর্থে যারা 'আলিম ও বুজুর্গ ছিলেন, আল-কুরআনের ছায়াতলে স্থান লাভ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, সেসব ভাগ্যবানদের ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে :

لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون . وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين .

"আপনি সব মানুষদের মধ্যে ইহুদী ও মুশরিকদেরকেই মুসলমানদের অধিকতর শত্রু হিসেবে পাবেন। আর মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বে অধিক নিকটবর্তী পাবেন যারা নিজেদেরকে খৃষ্টান বলে। এর কারণ খৃষ্টানদের মধ্যে 'আলিম ও দরবেশ রয়েছে যারা অহংকার করে না। তারা রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার কথা শুনামাত্র দেখবেন তাদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে গেছে। কারণ তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে। তারা আরো বলে, হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম, অতএব, আমাদেরকে অনুগতদের তালিকভুক্ত করে নিন"।[৬৫]

৬১। আল-কুরআন, ৮ : ৩১
৬২। আল-কুরআন, ২১ : ৫
৬৩। আল-কুরআন, ১১ : ১৩
৬৪। আল-কুরআন, ২ : ২৩
৬৫। আল-কুরআন, ৫ : ৮২-৮৩

Dhaka University Institutional Repository

জানার তীব্র আকাংখার যে চিত্র পেশকরা হয়েছে, তা শুধুমাত্র কুরআন শোনার মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছে, এমনকি কুরআন শুনে নিজেদের অজান্তেই তাদের চোখের পানি পর্যন্ত নির্গত হয়েছে। ফলে তাঁরা সত্যের মুখোমুখি হতে পেরেছেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল-কুরআন যে সত্যের দাওয়াত ও শিক্ষা দিতে চায় তা তার নিজস্ব প্রভাব ছাড়া কোন মতেই সম্ভব হতে পারে না। আল-কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا . ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا .

"যারা পূর্ব থেকেই 'আলিম, যখন তাদের সামনে কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, তখন তারা নত মস্তকে সিজদায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং বলে, আমাদের পালনকর্তা পবিত্র মহান। অবশ্য আমাদের প্রতিপালকের ওয়াদা পূর্ণ করা হবে।"[৬৬]

কুরআন শুনে আল্লাহকে ভয় করার চিত্র নিম্নোক্ত আয়াতেও তুলে ধরা হয়েছেঃ

الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد "আল্লাহ উত্তম বাণী (অর্থাৎ কুরআন) অবতীণ করেছেন, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ ও পুনঃ পুনঃ পঠিত। এতে তাদের লোম কাঁটা দিয়ে উঠে চামড়ার উপর, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে। অতঃপর তাদের চামড়া ও অন্তকরণ আল্লাহর স্বরণে বিনম্র হয়"।[৬৭]

উপরোক্ত আয়াত সমূহ থেকে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় এ কুরআনের মধ্যে এমন এক প্রভাব নিহিত, যা তার পাঠক কিম্বা শ্রোতাকে প্রভাবিত না করে ছাড়ে না। হৃদয়কে করে উত্তাল, চোখকে করে অশ্রুসজল। যে ঈমান গ্রহণে আগ্রহী সে কুরআন শুনামাত্রই তার আনুগত্যের শির নত হয়ে যায়। এমনকি, যে কুফুরী ও হঠকারিতায় নিমজ্জিত, সেও যদি কুরআন শোনে তবে তার উপরও কুরআন প্রভাব ফেলে, কিন্তু সে এটিকে যাদু মনে করে উড়িয়ে দেয়। লোকদেরকে সে শুনতে বারণ করে, তবুও সে কুরআনকে চ্যালেঞ্জ করতে সাহস পায় না।[৬৮]

আল-কুরআনের সম্মোহনী শক্তির উৎস

যে সমস্ত মনীষী কুরআন বুঝার ব্যাপারে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছেন এবং আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখনী ধরেছেন, তারা তাদের সাধ্যমত উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেছেন। কিছু 'আলিম কুরআনী বিষয় বস্তুর মিল যোগসূত্র সম্পর্কে কিছু না বলে অন্যভাবে কিছুটা আলোচনা করেছেন। যা কুরআনের বিষয় বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন আল-কুরআন পূর্ণতা প্রাপ্তির পর যে শরী'আত পেশ করেছে তা প্রতিটি জায়গা ও সময়ের উপযোগী। সেই কুরআন এমন কিছু ঘটনাও বলে দিয়েছে যা পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যেই সংঘটিত হয়েছে। তাছাড়া কুরআন বিশ্ব প্রকৃতি ও মানব সৃষ্টিসম্পর্কেও আলোকপাত করেছে ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ আল-কুরআনে প্রচুর বর্ণনা করা হয়েছে।

৬৬। আল-কুরআন, ১৭ : ১০৭-১০৮

৬৭। আল-কুরআন, ৩৯ : ২৩

৬৮। সাইয়্যেদ কুতুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-২৯

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু ছোট ছোট সেইসব মহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক যেখানে কোন শরয়ী বিধান বর্ণনা করা হয়নি? কিম্বা যেখানে কোন অদৃশ্য জগতের বিবরণ পেশ করা হয়নি বা পার্থিব জগতের কোন জ্ঞানও বিতরণ করা হয়নি। যদিও ছোট সেই সূরাগুলোতে সব বিষয়ের সামষ্টিক আলোচনা করা হয়নি যা আল-কুরআনের অনেক সূরায় করা হয়েছে। তবু আল-কুরআন অবতীর্ণের প্রথম দিকে সেগুলো আরবদের সম্মোহন করেছিলো। ঐ সূরাগুলোর মাধ্যমেই এসেছিলো তাদের চিন্তার জগতে আলোড়ন এবং তার সৌন্দর্যের প্রতি তীব্র আকর্ষণ। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, এ ছোট্ট সূরাগুলোর যাদুবলী প্রভাব এতো তীব্র ও অপ্রতিরোধ্য ছিল, যার কারণে শ্রোতা মোহগ্রস্ত না হয়ে পারতো না। আল-কুরআন স্বীয় বৈশিষ্ট্যের প্রভাবেই কাফির ও মুমিনদেরকে তার প্রভাব বলয়ে টেনে নিতে সক্ষম হয়েছে। যারা ইসলাম গ্রহণ করে সৌভাগ্যশালী হয়েছেন, তাদের পিছনে সবচেয়ে বড় অবদান আল কুরআন। এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, আল-কুরআনের ছোট একটি সূরা কিম্বা তার অংশ বিশেষ তাদের জীবনের মোড়কে ঘুড়িয়ে দিয়েছিল।

অবশ্য ইসলাম পূর্ণতা প্রাপ্তির পর যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের পিছনে আল-কুরআন ছাড়াও কিছু আচার-আচরণ এবং বাহ্যিক তৎপরতা ক্রিয়াশীল ছিল। তবে প্রাথমিক পর্যায়ের সৌভাগ্যবান মুমিনেদের পিছনে ঈমানের ব্যাপারে যে বস্তুটি ক্রিয়াশীল ছিল তা কেবল মাত্র কুরআন ছাড়া আর কিছুই নয়।[৬৯]

ইসলাম গ্রহণের মূল চালিকা শক্তি

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হবার পর বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত হয়ে লোকজন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। যেমনঃ

১। কতিপয় লোক রাসূলে আকরাম (সাঃ) ও সাহাবা কিরামের আমল ও আখলাকে প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

২। যারা ইতিপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তারা সবকিছুর উর্ধে দ্বীনকে প্রাধান্য দিচ্ছিলেন এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তারা সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট, নির্যাতন ভোগ করেছিলো, কতিপয় লোক এ ব্যাপারে প্রভাবিত হয়ে মুসলমান হয়েছিলেন।

৩। কিছু লোক এ কথা চিন্তা করে মুসলমান হয়েছিলেন যে, মুহাম্মদ (সাঃ) ও তার সঙ্গী-সাথীরা সংখ্যায় অল্প কিন্তু তবু কোন পরাশক্তি তাদেরকে পরাস্ত করতে পারে না, এটি আল্লাহর সাহায্য ও তত্ত্বাবধান ছাড়া কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না।

৪। কতিপয় লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তখন যখন ইসলাম রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ইসলামের ইনসাফ ও ন্যায় বিচার কার্যকারী ছিল। যা ইতিপূর্বে কখনো দেখেননি।

এরকম আরো অনেক কারণেই মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তার মধ্যে অন্যতম ছিল আল-কুরআনের প্রাণস্পর্শী আবেদন ও মোহিনী টান যা ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় এককভাবে অবদান রেখেছে।[৭০]

৬৯। সাইয়্যেদ কুতুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১

৭০। প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনে সম্মোহনী শক্তির উৎস কোথায় ?

একটি কথা ভেবে দেখা দরকার, তখন পর্যন্ত শরী'আত পরিপূর্ণ ছিল না, অদৃশ্য জগতের খবর ছিল না। জীবন ও জগৎ সম্পর্কেও জোরালোভাবে তেমন কিছু বলা হয়নি। ব্যবহারিক কোন দিক নির্দেশনা তখনও কুরআন দেয় নি, কুরআনের অতি সামান্য একটি অংশ ইসলামের দাওয়াতী কাজ করার জন্য বর্তমান ছিল। তবুও সেখানে যাদু ও সম্মোহনী শক্তির উৎস নিহিত ছিল। যার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে তারা বলতে বাধ্য হয়েছেঃ ان هذا الا سحر يؤثر "এতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ছাড়া আরা কিছুই নয়"।[৭১]

ওয়ালিদ বিন মুগিরা ইসলাম গ্রহণ করতে চেয়েও তা গ্রহণ করার ঘটনাটি সূরা 'আল-মুদ্দাসসিরে' বর্ণিত হয়েছে। অবতীর্ণের ধারাবাহিকতায় এ সূরার অবস্থান তৃতীয়। সূরা 'আলাক' এবং সূরা 'মুজ্জাম্মিল'-এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। আমরা গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাব এ সূরাগুলো কিভাবে ওয়ালীদ বিন মুগীরাকে প্রভাবিত করেছিল। এতে এমন কি যাদু যে, তাকে পেরেশান করেছিল ?

মক্কায় অবতীর্ণ ছোট ছোট এ সূরাগুলো যখন আমরা অধ্যয়ন করি তখন সেখানে শরয়ী কোন আইন কিম্বা পার্থিব কোন ব্যাপারে সামান্যতম কোন ইঙ্গিতও পাই না। অবশ্য সূরা আলাকে মানব সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে সামান্য আলোচনা এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে মানুষকে জমাট বাধা রক্তপিন্ড থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাছাড়া পরবর্তী বছর সমূহের ভবিষ্যৎ বাণীও করা হয়নি। যেমন সূরা 'রোমে' পারস্য বিজয়ের ব্যাপারে ভবিষ্যৎদ্বানীও করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে ওয়ালীদ যেটিকে যাদু বললো, আল-কুরআনে তার শেষ কোথায়? এর উত্তর হচ্ছে, ওয়ালীদ আল-কুরআনে যে অংশকে যাদু বলে আখ্যায়িত করেছে অবশ্যই তার শরয়ী আহকাম ও পার্থিব কোন জ্ঞানের বর্হিভূত বস্তু ছিল। আলোচনার এমন কোন বিষয় সেখানে ছিল না যে ব্যাপারে সে কোন কথা বলতে পারত। অবশ্য এ কথা ঠিক, ইসলামী আকীদা ও আধ্যাত্মিকতা অর্জনের চেষ্টা ছাড়াই সে তার সূক্ষ্ম রহস্য হৃদয়ঙ্গমে করতে সক্ষম হয়েছিল।

এবার আসুন, সর্বপ্রথম অবতীর্ণ সূরা 'আলাক' সম্পর্কে একটু চিন্তা করে দেখি। প্রথম ১৫টি আয়াতের দিকে সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে এর শব্দ গুলো জাহিলি যুগের কবি ও সাহিত্যিকদের ব্যবহৃত শব্দের অনুরূপ, যার সাথে গোটা আরব পরিচিত ছিল। কিন্ত তাদের লেখায় অনেক সামঞ্জস্যহীন শব্দ ও বাক্যের সমাবেশ ঘটত। অনেক সময় তাদের রচনার মধ্যে কোন অন্তমিল ও প্রসঙ্গ পাওয়া যেত না। কিন্তু সূরা আলাকের ব্যাপারটি তেমন ? অবশ্যই নয় ; বরং সেখানে সামঞ্জস্য ও দ্যোতনার এক অপূর্ব সমাহার। প্রতিটি বক্তব্য উন্নত সাহিত্যের মূর্ত প্রতীক। অথচ তা একেবারেই প্রথম দিকে অবতীর্ণ আয়াত। সেখানে বলা হয়েছে "পড়ো"। তবে তা হতে হবে আল্লাহর পবিত্র ও সম্মানিত নামের সাথে। ইক্‌রা বা পড়ো শব্দ দিয়ে উদ্দেশ্য হচ্ছে আল-কুরআন তিলাওয়াত বা অধ্যয়ন। এজন্য আল্লাহর নাম নেয়ার প্রয়োজন যে, তিনি নিজের নামের সাথেই দাওয়াত দেন। আল্লাহর এক সিফাতী নাম "রব" বা প্রতিপালক, তাই তিনি প্রতিপালন বা প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্যই পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এ শব্দগুলো আল্লাহর ভাষায় اقرأ باسم ربك الذى خلق "পড়ো ঐ প্রতিপালকের নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন"।[৭২]

৭১। আল-কুরআন, ৭৪ : ২৪

৭২। আল-কুরআন, ৯৬ : ১

Dhaka University Institutional Repository

তখন ইসলামী দাওয়াতের সূচনাকাল। এজন্য বিশ্লেষণ হিসেবে এমন একটি শব্দকে বেছে নেয়া হয়েছে যা জীবন শুরুর সাথে জড়িত। অর্থাৎ তিনি এমন "রব" الذى خلق "যিনি সৃষ্টি করেছেন।"

خلق الانسان من علق যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন "আলাক" থেকে, অন্য কথায় যিনি মানুষ সৃষ্টি কচ্ছেন জমাট বাধা রক্তপিন্ড থেকে, কত ছোট ও সাধারণ অবস্থা দিয়ে সূচনা। কিন্তু আল্লাহ যেহেতু"রব" বা প্রতিপালাক হওয়ার সাথে সাথে তিনি খালিক বা সৃষ্টিকর্তা ও মেহেরবান, তাই ছোট একটি মাংশ পিণ্ডকে ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ এক মানুষে রূপায়িত করেন। আর তার প্রকৃতি এমন, তাকে কোন কিছু শিখালে শেখার যোগ্যতা আছে। এজন্যই বলা হয়েছে ঃ

اقرأ وربك الاكرم الذى علم بالقلم

"তুমি কুরআন পাঠ কর। তোমার প্রতিপালক অত্যন্ত দয়ালু। তিনি হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষকে তা-ই শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না"।[৭৩]

দেখুন ! একটি আয়াতে কতো সুন্দরভাবে মানুষের শুরু থেকে পূর্ণতার দিকে নেয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। জন্ম ও মৃত্যুর মাঝামাঝি সময়ের কথা একের পর এক বলা হয়েছে। যেন মানুষের চিন্তা ও সহজাত প্রবৃত্তি সেই দাওয়াতের প্রতি সাড়া দেয়।

এ ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা কী বুদ্ধি বিবেকের দাবী-ই ছিল ? এবং বর্তমানে কোথায় এসে পৌছেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এমনটি হয় না। ... كلا ان الانسان ليطغى "সত্যি-সত্যি মানুষ সীমালংঘন করে, কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে (অর্থাৎ তার শুরু ও শেষের কথা ভুলে গেছে।)[৭৪]

সে অহংকার ও দাম্ভিকতার বশে ভুলে গেছে বিধায় তাকে সতর্কতা ও ভৎসনামিশ্রিত বাক্যে সর্তক করা হচ্ছেঃ ان الى ربك الرجعى "এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তাদেরকে তোমার প্রভুর নিকট ফিরিয়ে আনা হবে।"[৭৫]

মানুষের বিদ্রোহ ও দাম্ভিকতার প্রসঙ্গ যখন চলছে তখন তাকে পরিপূর্ণ রূপদানের জন্য বলা হয়েছে। তারা শুধুমাত্র নিজেরাই বিদ্রোহী হয় না বরং অন্যদেরকেও বিদ্রোহী বানাবার চেষ্টা করে।

ارءيت الذى ينهى عبدا اذا صلى ....

"তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছ, যে, নিষেধ করে আল্লাহর এক বান্দাকে যখন সে নামাযে দাঁড়ায়।"[৭৬] কোন ব্যক্তিকে নামাযে বাধা দেয়া অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এ গর্হিত কাজটি তখনই বেশী বেড়ে যায় যখন নামাযী হিদায়াতের পথে অবিচল থাকেন এবং অন্যদেরকে আল্লাহভীতি জাগ্রত করার চেষ্টা করেন।

৭৩। আল-কুরআন, ৯৬ : ১-৫

৭৪। আল-কুরআন, ৯৬ : ৬-৭

৭৫। আল-কুরআন, ৯৬ : ৮

৭৬। আল-কুরআন, ৯৬ : ৯-১০

Dhaka University Institutional Repository

أو أمر بالتقوى.أرأيت إن كان على الهدى. "তুমি কি দেখেছো, যদি সে সৎপথে থাকে অথবা আল্লাহভীতি সম্পর্কে শিক্ষা দেয়"।[৭৭]

চিন্তা করে দেখুন, মানুষ সবকিছু থেকেই অসতর্ক। এমনকি কিভাবে তার জন্ম এবং কোথায় তার শেষ সে খবরটুকু তার নেই। ألم يعلم بأن الله يرى . أرأيت إن كذب وتولى "তুমি কি দেখেছ যদি সে মিথ্যারোপ করে। সে কি জানে, আল্লাহ সবকিছু দেখেন?[৭৮] অতঃপর তাদেরকে শাসানো হচ্ছে ঃ كلا لئن لم ينته لنسفعن بالناصية . ناصية كاذبة خاطئة .

"কখনো নয়, যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি তাকে মাথার চুলগুচ্ছ ধরে হেচড়াবোই মিথ্যাচারী, পাপীর কেশ গুচ্ছ।"[৭৯]

এখানে এমন ভাবে শব্দ চয়ন করা হয়েছে যে, শব্দ নিজেই তার কাঠিন্যকে প্রকাশ করে দিয়েছে। যদি لنسفعا -এর স্থলে সমার্থবোধক শব্দ لناخذن নেয়া হতো তবে অর্থের দিক দিয়ে এত কাঠিন্য বুঝাতো না, যা لنسفعا দ্বারা বুঝানো হয়েছে। এ শব্দ দ্বারা ধারণা হয়, এক ব্যক্তি কোন উঁচু জায়াগায় দাঁড়িয়ে শক্তভাবে কারো চুলের মুঠি ধরে রেখেছে, আর সে দ্রুত নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। ناصية كاذبةخاطية এ শব্দটিতে তাৎপর্য হচ্ছে, কোন বিদ্রোহী কিংবা অহংকারীকে উঁচু স্থান থেকে তার কপালের চুল ধরে হেচকা টানে ভুলুণ্ঠিত করে টেনে হেচড়ে নিয়ে যাওয়া। টেনে হেচড়ে নিয়ে যাওয়ার সময় অবশ্য সে নিজের সঙ্গী-সাথীদের নিকট থেকে চিৎকার করে সাহায্য চাইতে থাকে। যেমন: আল্লাহ নিজেই বলেছেন فليدع ناديه অতএব, সে তার সঙ্গী-সাথীদের আহ্বান করুক। আর سندع الزبانية আমি ডাকবো জাহান্নামের প্রহরীদেরকে।

এ কথা শুনে শ্রোতাদের ধারণা হয় সম্ভবত জাহান্নামের পাইক- পেয়াদা এবং ঐ ব্যক্তির সাথীদের মধ্যে সেই দিন সংঘর্ষ বেধে যাবে। এটি একটি কাল্পনিক চিত্র যা কল্পনার জগতকে ছেয়ে ফেলে। রাসূল (সা.)তার নিজের অবস্থানে অটল থেকে রিসালাতের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। কেউ যদি তার রিসালাতকে অস্বীকার করে মুখ ফিরিয়ে লয়, সেজন্য তিনি কোন পরওয়া করেন না। ইরশাদ হচ্ছে كلا لا تطعه واسجد واقترب "কখনো তুমি তার কথায় প্রভাবিত হয়ো না, তুমি সিজদা কর ও আমার নৈকট্য অর্জন কর।"[৮০]

৭৭। আল-কুরআন, ৯৬ : ১১-১২

৭৮। আল-কুরআন, ৯৬ : ১৩-১৪

৭৯। আল-কুরআন, ৯৬ : ১৫-১৬

৮০। আল-কুরআন, ৯৬ : ১৯

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী দাওয়াতের এ ছিল বলিষ্ঠ সূচনা। এ সূরার বাক্যগুলো বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও বা অবিন্যাসিত মনে হতে পরে কিন্তু এগুলো বিন্যাসিত ও পরস্পর সংশ্লিষ্ট। এ হচ্ছে আল-কুরআনের প্রথম সূরা যার বর্ণনা পদ্ধতিতেই তার অন্তমিলের মিলটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবার অবতীর্ণের দিক থেকে দ্বিতীয় সূরাটির দিকে লক্ষ্য করুন যা সূরা 'আল-মুজ্জাম্মিল' নামে পরিচিত। অবশ্য সূরা 'আল-কলমের' প্রথম দিকের আয়াত গুলোও এর পূর্বে অবতীর্ণ হতে পারে। যা হোক ওয়ালীদ বিন মুগিরা সূরা 'আল-মুজ্জাম্মিলের' নিম্মোক্ত আয়াত ক'টি শুনেই আল-কুরআনকে যাদু বলে আখ্যায়িত করেছিল।

يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا . إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا . فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا .

"যে দিন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ হয়ে যাবে বহমান বালুকা স্তুপ। আমি তোমাদের কাছে একজন রাসূলকে তোমাদের জন্য সাক্ষী করে পাঠিয়েছি, যেমন পাঠিয়েছিলাম ফির'আউনের কাছে একজন রাসূল। ফির'আউন সেই রাসূলকে অস্বীকার করলো, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিলাম"।[৮১]

উল্লেখিত আয়াতসমূহে কিয়ামতের এক ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তা এমন এক ভয়ানক চিত্র, যেখানে মানুষ ছাড়া গোটা সৃষ্টিলোকই তার আওতায় পড়ে যাবে। সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে কঠিন ও ভারী সৃষ্টি হচ্ছে পৃথিবী ও পর্বতমালা। সেদিন সেগুলো কেঁপে ওঠবে এবং চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে এবং কাউকে বিনা অপরাধে গ্রেফতার করা যাবে না। বরং তাদেরকেই গ্রেফতার করা হবে। যাদের নিকট রাসূল এসেছিল এবং তার দাওয়াত পৌঁছেছে। সেই সাথে যাবতীয় দলিল প্রমাণও পূর্ণ হয়ে গেছে।

মক্কায় কাফিরদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে তোমাদের জন্য যে রাসূল পাঠানো হয়েছে তিনি রাসূল হিসেবে নতুন ও প্রথম নন। তিনি তাদের মতোই একজন রাসূল যারা ফির'আউন ও তার মত অন্যান্যদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। আর তোমাদের শান-শওকত ও ক্ষমতা নিশ্চয় ফির'আউনের চেয়ে বেশী নয়। সেই ফির'আউনকে পর্যন্ত কঠিন শাস্তি দেয়া হয়েছে। কাজেই তোমরা কি চাও সেরকম শাস্তিতে নিমজ্জিত হতে?

যখন পৃথিবীর মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে তখন তোমরা যারা কুফুরীতে লিপ্ত আছো, তারা আল্লাহর পাকড়াও হতে কিভাবে বাঁচবে? অথচ সেদিনের ভয়াবহতা দেখে দুশ্চিন্তায় শিশুরা পর্যন্ত বুড়ো হয়ে যাবে, পৃথিবী ও পাহাড় কেঁপে ওঠবে। এ ভয়ংকর চিত্রের ভয়াবহতা থেকে কোন সৃষ্টিই নিরাপদ থাকবে না। যখন কল্পনায় সেই বিভিষিকার চিত্র প্রতিফলিত হয়, তখন কেউ প্রভাবিত না হয়েই পারে না। আর মানুষের অন্তরই এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহর এ ওয়াদা পুরো হওয়ার মতোই একটি ওয়াদা। যা কার্যকরী হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই এবং তা থেকে পালানো বা আশ্রয় নেয়ার মতো কোনো জায়াগাও নেই।

৮১। আল-কুরআন, ৭৩ : ১৪-১৭

Dhaka University Institutional Repository

কাজেই বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে সময় থাকতেই আল্লাহর পথে চলে আসা। সেই ভয়ংকর বিপর্যয়ের রাস্তায় চলার চেয়ে আল্লাহর পথে চলা অধিকতর সহজ।

হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে দেখা গেছে, তিনি সূরা 'ত্ব-হার' প্রথম দিকের কিছু আয়াত পড়ে বা শুনে ইসলামের দিকে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

সূরা 'ত্ব-হা' ছিল অবতীর্ণের ক্রমানুসারে ৪৫ নং সূরা। এর পূর্বে যে সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল তা নিচে পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হলোঃ

১। সূরা আলাক	২৫। সূরা আল-কদর
২। সূরা আল-মুজ্জাম্মিল	২৬। সূরা আশ-শামস
৩। সূরা আল-মুদ্দাসির	২৭। সূরা আল-বুরূজ
৪। সূরা আল-কলম	২৮। সূরা আত্ তীন
৫। সূরা আল-ফাতিহা	২৯। সূরা আল-কুরাইশ
৬। সূরা আল-লাহাব	৩০। সূরা আল-কারিয়াহ
৭। সূরা আল তাকভীর	৩১। সূরা আল- কিয়ামাহ
৮। সূরা আল-'আলা	৩২। সূরা আল-হুমাযা
৯। সূরা আল-লাইল	৩৩। সূরা আল-মুরসালাত
১০। সূরা আল-ফজর	৩৪। সূরা ক্বাফ
১১। সূরা আল-আদদোহা	৩৫। সূরা আল বালাদ
১২। সূরা আল- ইনশিরাহ	৩৬। সূরা আত্ তারিক
১৩। সূরা আল- আসর	৩৭। সূরা আল-কামার
১৪। সূরা আদিয়াত	৩৮। সূরা সা'দ
১৫। সূরা আল-কাওসার	৩৯। সূরা আল-আ'রাফ
১৬। সূরা আত্ তাকাসুর	৪০। সূরা আল-জ্বিন
১৭। সূরা আল-মাউন	৪১। সূরা ইয়াসীন
১৮। সূরা আল-কাফিরুন	৪২। সূরা আল-ফুরকান
১৯। সূরা আল-ফীল	৪৩। সূরা আল ফাতির
২০। সূরা আল-ফালাক	৪৪। সূরা আল-মারইয়াম
২১। সূরা আন্ নাস	৪৫। সূরা ত্ব-হা -[৮২]
২২। সূরা আল-ইখলাস	
২৩। সূরা আন নাজম	
২৪। সূরা আবাসা	

৮২। সাইয়্যেদ কুতুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

উপরোল্লেখিত সমস্ত সূরাই মক্কায় অবতীর্ণ। অবশ্য এ সূরাগুলোর মধ্যে কিছু আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। আসুন এবার আমরা উল্লেখিত সূরাসমূহের ওপর সাধারণভাবে একটু নজর বুলিয়ে নেই, যেভাবে আমরা ওয়ালীদের ঘটনাটি পর্যালোচনা করেছি, সেভাবে এ সূরাগুলো পর্যালোচনা করা এখানে সম্ভবপর নয়। আমরা এতটুকু আলোচনা করতে চাই, সূরাগুলোর মধ্যে এমন কি যাদু নিহিত আছে, যার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পরবর্তীগণ ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

আল-কুরআনের বর্ণনা রীতি

পেছনের যাবতীয় আলোচনার মূল কথা হলো আল-কুরআন একক ও ব্যতিক্রমী পদ্ধতিতে তার বক্তব্য পেশ করে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার চেষ্টা করে। এমনকি দলিল প্রমাণ কিংবা যুক্তি -তর্ক উপস্থাপনের বেলায়ও সেই একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। তাছাড়া কল্পনা ও রূপায়নের মাধ্যমে প্রতিটি ঘটনাকে ছবির মত উপস্থাপন করেছে। অর্থাৎ কুরআন অশরীরি অর্থকে শরীরি এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে উপস্থাপন করেছে।

আমরা দেখতে চাচ্ছি বর্ণনার এ শৈল্পিক পদ্ধতি কতটুকু সফল ও কার্যকরী। এটিই আমাদের এ পুস্তকের বিষয়বস্তু। আল-কুরআন দীনি যে প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যে এসেছে, আইনগত যেসব প্রসঙ্গ আল-কুরআন আলোচনা করেছে, সেগুলো আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়, ইত্যেমধ্যে আমরা যেসব আলোচনা করেছি সেখানে এসব বিষয়ে কিছু আলোচনা এসেছে, তা শুধু এজন্য, কুরআন সেই বিষয়টিকে কিভাবে উপস্থিত করেছে এবং তার ধরন ও পদ্ধতি কি, সেই বিষয় সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

অনেকে আল-কুরআনের বিষয়বস্তুকে যখন গভীর ভাবে দেখেন তার প্রশস্ততা, সর্ব ব্যাপকতা ও মাহাত্ম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন, তখন বলে ওঠেন এ বিষয়বস্তুই এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য । আর এটিই যথেষ্ট।

আল-কুরআনের বর্ণনা, উপস্থাপনের ঢং ও তার চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ, সেগুলো গৌণ ব্যাপার। তাদের দৃষ্টিতে আল-কুরআনের অলৌকিকত্ব, তা সবকিছু বিষয়বস্তুর মধ্যে। অবার অনেকে শব্দ ও বাক্য নিয়ে আলোচনা করেন এবং বলেন, আল-কুরআনের অলৌকিকত্ব পৃথক পৃথকভাবে উভয়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট ।

এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে- আল-কুরআন তার বর্ণনার যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, উদ্দিষ্ট বিষয়বস্তু তা থেকেই সৃষ্ট। তাই দু'টোর মর্যাদাই সমান। আমরা শব্দ ও অর্থ নিয়ে অনর্থক বিতর্কে জড়ানো পছন্দ করছি না। যদিও প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও ভাষাতত্ত্ববিদগণ সে সব শব্দ ও অর্থ নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়েছেন।

ইবনু কুতাইবা, কুদামাহ, আবু হিলাল আসকারী প্রমুখ সাহিত্যিক ও ভাষা তত্ত্ববিদগণ এ বিষয়ে কলম ধরেছেন। তবে আমরা মনে করি এ বিষয়ে আবদুল কাদির জুরজানী "দালাইলুল ইজায" গ্রন্থে যা লিখেছেন তা গভীর পান্ডিত্য ও ভারসাম্যপূর্ণ । তিনি লিখেছেন- একজন জ্ঞানী ব্যক্তি একথা চিন্তাও করতে পারেন না, শব্দ নিয়ে কেনো বিতর্ক চলতে পারে, তা শব্দ শুধু এজন্যই।

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য শব্দটি কী অর্থে প্রয়োগ করা হবে তা নিয়ে কথা হতে পারে। মনঃপুত কোন অর্থ নিয়েও বির্তক হতে পারে না। হাঁ অর্থের সাথে সংশ্লিষ্ট যে বির্তক করা যেতে পারে তাহলো বোধগম্য অর্থটি কোন অর্থের সাথে সংশ্লিষ্ট শব্দটি সেই অর্থেরই প্রতিনিধিত্ব করে। তাছাড়া সেই অর্থ কেবল তখনই প্রকাশ হতে পারে, যখন তা এক বিশেষ ছন্দে ও মাত্রায় সংকলন করা যায়; নইলে নয়। শব্দ বিন্যাস বা ছন্দ পৃথক পৃথক হবে অথচ অর্থেরও মিল থাকবে, তা সম্ভব নয়।

যদি আব্দুল কাদির জুরজানী এ উদ্দ্যেশ্যে সংক্ষেপে কিছু লিখতেন, আমরা তা হুবহু তুলে দিতাম। কিন্তু আফসোস, তিনি পুরো পুস্তকই এ আলোচনা দিয়ে ভরে দিয়েছেন। সেজন্য আমরা তার চিন্তাকে পুরোপুরি উপস্থাপন করতে পারছিনা। এমনকি কোন অংশের উদ্ধৃতিও দিতে পারছি না। আমরা দেখিছি তার উপকরণ বড় জটিল।

কিন্তু বলিষ্ট যে কথাটি বলা যায় তা হচ্ছে এ সব ব্যাপারে সমাধানের যোগ্যতা তার ছিল, তিনি যদি বিষয় নিয়ে আরেকটু অগ্রসর হতেন তাহলে শৈল্পিক চূঁড়া স্পর্শ করতে পারতেন।

আমরা আব্দুল কাদিরের দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে বলতে চাই, তার রচনার বিন্যাস ও ছন্দ, অর্থের চিত্রাংকনে বড় পারদর্শি । যেখানে অন্তর্নিহিত একটি অর্থ বুঝানোর জন্য দুটো পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, সেখানে মন ও মানসে দুটো ভিন্ন অর্থই প্রতিভাত হয়। মনে হয় সেই অর্থ ও বর্ণনার ধরনের মধ্যে এমন একটি সম্পর্ক আছে যা গ্রহণের পর সেই ব্যাপারে আর কোন সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে না, যাতে শব্দ ও অর্থের মধ্যে পৃথক চিন্তা করা যেতে পারে। একটি অর্থের প্রকাশ এমনভাবে হয় যখন মিল একরকম হয়। শব্দের অবস্থা ভেদে যতটুকু পরিবর্তন প্রতিভাত হবে অর্থের মধ্যে অনুরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়। অনেক সময় মেধাগত দিক প্রভাবিত হয় না, কিন্তু মন-মানসিকতার পরিবর্তন হয়ে যায়। প্রকাশ থাকে যে, শিল্পকলায় যেই জিনিসের ওপর নির্ভর করা হয় তা হচ্ছে মনোজাগতিক অবস্থা এজন্য শিল্পকলায় যে পদ্ধতিতে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়, তা শুধু মনোজগৎকে প্রভাবিত করার জন্যই করা হয়। এজন্যই যখন বাক্যের প্রভাবে পরিবর্তন সুচিত হবে, তখন অর্থের মধ্যেও পরিবর্তন আসবে।

উপরোক্ত আলোচনা এ কথারই ইঙ্গিত করে, আল-কুরআন দৃশ্যায়নের যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি সেই বর্ণনা পদ্ধতি যেখানে কুরআনী অর্থ, উদ্দেশ্যে ও বিষয়কে সেই রূপই দেয়া হয়েছে যে রূপে আমরা তা দেখতে পারি। আর এ অবস্থাটি তার মান মর্যাদার নির্ণয়ক। যদি সেখানে এ অবস্থা না হয়ে অন্য কিছু হতো তাহলে বর্তমানের মত তা গুরুত্বপূর্ণ হত না।

উদাহরণ দিয়ে আমরা বিষয়টিকে আরো পরিস্কার করতে চাই। যদি বিভিন্ন জায়গায় এ ধরনের উদাহরণ আছে এবং আমরা সেবিষয়ে বিশদ বিবরণও দিয়েছি যা থেকে আল-কুরআনের বাচন ভঙ্গির ধরণটি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। তবু এখানে আরো কিছু উদাহরণ পেশ করছি।

আল-কুরআনের বর্ণনা-রীতির প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থাকে চিত্ররূপ দিয়ে বোধগম্য অবস্থায় তুলে ধরা। একই পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক চিত্র অতীতের ইতিহাস, ঘটনা ও উদাহরণ কিয়ামতের দৃশ্যাবলী শাস্তি ও শান্তির দৃশ্যসহ মানুষের স্বরূপকে এমন ভাবে আল-কুরআন তুলে ধরেছে, মনে হয় এরা সবাই চোখের সামনে উপস্থিত। এভাবে কুরআন চৈন্তিক বিষয়কে

Dhaka University Institutional Repository

ইন্দ্রিয়মানুভূতির আওতায় এনে দিয়েছে। আবার চিন্তা শক্তির মাধ্যমে সেগুলোর মধ্যে গতিও সৃষ্টি করা হয়েছে। যা কল্পনার চোখে সর্বদা চলমান মনে হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে আল-কুরআন দৃশ্যায়মানের যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে তা অন্য পদ্ধতি থেকে গুরুত্বপূর্ণ কেন, যেখানে অর্থ এবং অবস্থা আসল রূপে বর্ণনা করা হয় ? তদ্রুপ কোন দুর্ঘটনা কিংবা কাহিনীকে প্রকৃত অবস্থায় বর্ণনা করা হয়। যদি কোন দৃশ্যের বর্ণনা উদ্দেশ্য হয় এবং তাও যদি সাদা মাটা কোন কিছু শব্দে বর্ণনা হয়, তার কল্পিত চিত্র না থাকা।

আল-কুরআনের গর্হিত ধরন ও পদ্ধতির মযার্দা সম্পর্কে শুধু এতটুকু বলাই যথেষ্ট, প্রথমে আমরা সেগুলো তার আসল সূরত বা অবগুঠন মুক্ত অবস্থায়ই দেখি, তারপর দৃশ্যাকারে কল্পনায় তা সামনে নিয়ে আসা হয়। এভাবে উভয় অবস্থা পরস্পর সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

প্রথম অবস্থায় অর্থ মেধা ও অনুভূতিকে সম্বোধন করে এবং বহনকারী প্রতিবিম্ব থেকে পৃথক হয়ে তার কাছে পৌঁছে। আর যখন চিত্রায়ন পদ্ধতিতে অর্থ ইদ্রিয় ও বিবেককে সম্বোধন করে এবং বিবেক প্রভাবিত হয়ে পড়ে তখন ব্যতিক্রমী পথে এ প্রভাব মানুষের কাছে পৌঁছে । সে সব পথের মধ্যে মেধাও একটি পথ। এটি বলা যাবে না যে, মেধাই একমাত্র পথ। এ পথ ও পদ্ধতি ছাড়া আর কোন পথই নেই।

এতে কোন সন্দেহ নেই, আল-কুরআন দৃশ্যায়নের যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছে তা অত্যন্ত চমকপ্রদ। সকল আকীদার দাওয়াত দিতেই এ পদ্ধতিটি ভারসাম্যপূর্ণ কিন্তু আমরা শুধু শৈল্পিক সৌন্দর্যের দিকটির যাচাই করতে চাই। নিঃসন্দেহে এ বর্ণনারীতি শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এজন্য শৈল্পিক প্রথম দাবী বিবেককে প্রভাবিত করে সেখানে শৈল্পিক আকর্ষণ সৃষ্টি করা। সেই প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে জীবনের অভ্যন্তরীণ দিককে আলোকজ্জ্বল করা এবং দৃশ্যের মাধ্যমে চিন্তা শক্তির খোরাক যোগানো। উদ্দিষ্ট বাক্যটি এভাবেই সচিত্র ও মূর্তমান হয়ে ওঠে। ইতোপূর্বে আমি যে সব উপমা দিয়েছি তা থেকে একটি উপমা পূনরায় তুলে ধরলাম।

১.ঈমানের প্রতি কঠোর ঘৃণা প্রকাশের কথাটি, যারা ঈমানের পথ থেকে দূরে চলে যায়, তাদেরকে কুরআন সোজা সোজি বলে দিলেই পারতো, অমুক অমুক ব্যক্তি ঈমানকে ঘৃণা করে। এ বাক্যটি শোনামাত্র মানুষের চিন্তায় ঘৃনার কথাটি বদ্ধমূল হয়ে যেত এবং পূর্ণ নিশ্চয়তা এবং এতমিনানের সাথে এ শব্দটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারত। কিন্তু এ ঘৃণার বহিঃপ্রকাশের চিত্রটি নিচের বাক্যটির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে এভাবে ঃ

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ . كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ . فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ .

"তাদের কি হলো, উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ? যেন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গর্দভ। হট্টগোলের কারণে পলায়ন পর"। [৮৩]

৮৩। আল-কুরআন, ৭৪ : ৪৯-৫০

Dhaka University Institutional Repository

এপদ্ধতিতে বর্ণনায় মেধার সাথে সাথে দৃষ্টিশক্তি এবং চিন্তাশক্তিও অংশগ্রহণ করে। সেই সাথে যারা ঈমানকে ঘৃণা করে তাদের একটি সুন্দর ব্যঙ্গচিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। জংলী গাধা যেমন শোরগোল শুনে পালাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে দিকবিদিক দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে তেমনিভাবে কাফির ও মুশরিকরাও আল্লাহর কথা শুনে পালাতে চেষ্টা করে। এছবিতে শৈল্পিক সৌন্দর্য তখনই সৃষ্টি হয় যখন কল্পনার হট্টগোলের কারণে গাঁধার দলের দৌড়ে পালানো, নড়াচড়া এবং তাদের পিছনে ধাবমান বাঘের দৃশ্যটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

২. আরবরা যে সব বাতিল মাবুদের উপাসনা করত তাদের দূর্বলতা ও অসহায়ত্বের কথাটি সাদামাটাভাবে বলে দিলেই হতো, আল্লাহকে ছাড়া তোমরা যাদেরকে ডাকো তারা আল্লাহর এক নগন্য সৃষ্টির চেয়েও দূর্বল।

এভাবে বক্তব্যটি অন্য কিছুর সাথে না মিলে সোজা মানুষের চিন্তার দরজায় পৌছে যেতো।

কিন্তু তা না করে বরং চিত্ররূপ দেয়া হয়েছে। এভাবে-

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ.

"তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূঁজা অর্চনা কর তারা কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয়, তারা মাছির কাছ থেকে তা উদ্ধার করতেও সক্ষম নয়। প্রার্থনাকারী ও যার প্রার্থনা করা হয়। উভয়ই কতো অসহায় "।[৮৪]

মূর্ত ও চলমান হয়ে গোটা চিত্রটি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এবং তা তিনটি স্তরে প্রতিভাত হয়।

১। তাদের বাতিল 'মাবুদরা একটি মাছিও সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়।

২। সবাই মিলে যদি চেষ্টা করে তবু নয়।

৩। সৃষ্টিতো দূরের কথা, মাছি যদি তাদের কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তারা সেই বস্তু মাছির কাছ থেকে উদ্ধার করতেও সম্পূর্ণ অক্ষম। এ হচ্ছে তাদের (বাতিল মাবুদদের) দুর্বলতা ও অক্ষমতার ছবি। এছবিতে এমন ভঙ্গিতে বিষয়টিকে উপস্থপন করা হয়েছে যাতে মানুষের মনে বাতিল মাবুদদের সম্পর্কে অবজ্ঞা ও ঘৃণার সৃষ্টি হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এখানে কি মিশ্রতার অতিশয়োক্তি ঘটনো হয়েছে এবং বালাগাত (ভাষার অলংকার) কি মিশ্রতার অতিয়োক্তিতে একাকার হয়ে গেছে ? নিশ্চয় নয়। এখানে অতিশয়োক্তির কোন উপাদান নেই, মূল কথা হচ্ছে সমস্ত বাতিল 'মাবুদ যদি একটি মাছি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে তবু তা করতে সক্ষম হবে না।[৮৫]

৮৪। আল-কুরআন, ২২ : ৭৩

৮৫। সাইয়্যেদ কুতুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪-৩১৫

Dhaka University Institutional Repository

নিঃসন্দেহে মাছি অতি ছোট ও নগন্য একটি প্রাণী। কিন্তু তা সৃষ্টি করার মধ্যে ঐ ধরনের অলৌকিকত্বই বিদ্যমান যা একটি উট কিংবা হাতি সৃষ্টি করার পিছনে থাকে, এ মু'জিযা জীবন সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত। চাই তা কোন বড় প্রাণী কিংবা কোন ছোট প্রাণীর । শুধু বড় বড় প্রাণী সৃষ্টি করাটাই মু'জিযা নয় বরং অতি তুচ্ছ ও নগন্য একটি প্রাণী সৃষ্টি ব্যাপারেও অলৌকিকতা বিদ্যমান।

এই ছবিতে যে শৈল্পিক সৌন্দর্য বর্তমান তা হচ্ছে তারা যেহেতু (বাতিল 'মাবুদরা) একটি মাছি সৃষ্টির করার যোগ্যতাও রাখে না, কাজেই তারা আর কি সৃষ্টি করতে সক্ষম, এ থেকে আপনা আপনি তাদের দূর্বলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তারপর বলা হয়েছে সৃষ্টি করাতো দূরের কথা যদি একটি ছোট্ট মাছি তাদের কোন কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তা তারা উদ্ধার করতেও সক্ষম নয়। এসব কিছুই শৈল্পিক সৌন্দর্যের উপকরণ ।

৩. কিয়ামতের ভয়াবহতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে সাধারণভাবে বলে দিলেই হতো, " সেদিন বন্ধুকে ভূলে যাবে, আর যাদের অনুসরণ করা হয় তারা তাদের অনুসারীকে প্রত্যাখান করবে। এভাবে বলে দিলে যে বর্ণনা একেবারে মান সম্পন্ন হতে না, তা ঠিক নয়, কিন্তু কুরআন যে ঢংয়ে ছবি এঁকেছে এর সাথে তার সম্পর্ক নেই, বরং এটি প্রাণ স্পন্দনে ভরপুর।

"সেদিন দুর্বলেরা বড়দেরকে বলবে, আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম অতএব, তোমরা আমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করবে কি ? তারা বলবে, যদি আল্লাহ আমাদেরকে সৎপথ দেখাতেন তাহলে আমরা তোমাদেরকে সৎপথ দেখাতাম। এখন আমরা ধৈর্যচ্যুত হই বা ধৈর্য ধারণ করি সবই সমান, আমাদের রেহাই নেই"।[৮৬]

উপরিউক্ত আয়াতে তিনটি দলের চিত্র অংকিত হয়েছে। যা মূর্তমান হয়ে কল্পিত দৃশ্য আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়।

ক) দুর্বললোক

এরা বড় লোকদের করুণা বিখারী ছিলো, এরা সর্বদা নিজেদের দূর্বলতা মূর্খতা ও মুখাপেক্ষীতার কারণে নেতাদের জামার আস্তিনের মধ্যে আশ্রয় খুঁজতে ব্যাকুল থাকত। কিয়ামতের দিন তারা তাদের নেতাদের নিকট প্রথমে এ অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য নিবেদন করবে তারপর তারা তাদেরকে গুমরাহ করার জন্য দায়ী করবে।

৮৬। فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص

আল-কুরআন, ১৪ : ২০

Dhaka University Institutional Repository

খ) অহংকারী

এদল হচ্ছে নেতৃস্থানীয়, আমীর, ওমরা গোছের লোক, তখন লাঞ্ছনা ও অপমানে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠবে। নিজেদের পরিণতি তারা তাদের নেতাদের নিকট প্রথমে এ অবস্থা দেখতে পাবে। অনুসারীদেরকে দেখে তারা অত্যন্ত রাগান্বিত হবে। এদিকে অনুসারীদের অবস্থা হবে, নেতাদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থা দেখেও তারা বিরত না হয়ে তাদের নিকট মুক্তির জন্য আবেদন করবে। অথচ তারাই তখন মুক্তির জন্য অপরের মুখাপেক্ষী থাকবে। কিন্তু কেউ তাদের জন্য এগিয়ে আসবে না। তখন অনুসারী বলতে থাকবে এ নেতারাইতো আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে। অবশ্য এতে কোন উপকার তাদের সেদিন হবে না। আর নেতারা শুধু একথা বলেই চুপ হয়ে যাবে, যদি আল্লাহ আমাদেরকে হিদায়াতের পথ দেখাতেন, তবে আমরাও তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে পারতাম।

গ) শয়তান

ইবলিশ ধোঁকা, প্রতারণা এবং শয়তানী সহ সমস্ত অপকর্মের হোতা। সেদিন সে তার অনুসারীদের লক্ষ্য করে বলবে, আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা করেছিলেন কিন্তু আমি যে ওয়াদা তোমাদের কাছে করেছিলাম তা ছিলো মিথ্যে প্রতারণা। তারপর স্পষ্ট ভাষায় বলে দেবে আমিতো তোমাদেরকে জোর করে পথভ্রষ্ট বানাইনি। আমিতো শুধু তোমাদেরকে আহবান করেছি। অমনি তোমরা দৌড়ে এসেছো। কাজেই আমাকে ভৎর্সনা না করে নিজেদেরকে ভৎসনা করো।

এরপর সে শেষ কথা বলে দেবে। তোমরা যে সমস্ত কাজে আমাকে অংশীদার মনে করছ, সে সমস্ত কাজের দায় দায়িত্ব থেকে আমি নিজেকে মুক্ত ষোঘণা করছি।

উপরের ছবিতে যে দৃশ্যের উপস্থাপনা করা হয়েছে তা একক ও অনন্য বৈশিষ্ট্য অধিকারী, এ দৃশ্যে আমরা দেখি নেতা ও অনুসারীগণ কেউ কাউকে চিনছে না। সবাই নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছে । তবু সে স্বীকারোক্তি কোনো কল্যাণ বয়ে আনছে না। উপরন্ত এ বীভৎস দৃশ্য দেখে নিজের অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, যদি সে এমন কথা না-ই বলবে তবে আর তাকে শয়তান বলা হবে কেন। এ চিত্রটি মানুষের পুরো মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। যদি সাদাসিদে ভাবে কথা গুলো বলে দেয়া যেতো, তবে ঐ শৈল্পিক সৌন্দর্য আর প্রস্ফুটিত হতো না, যা এই চিত্রে হয়েছে।

৪. সাধারণভাবে শুধু এ কথা বলে দিলেই হতো কাফির মুশরিকরা যে আমল করেছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই এ অগ্রহণযোগ্য আমলকে যে সব কাফিররা প্রধান্য দিচ্ছে তারা নিঃসন্দেহে বোকার স্বর্গে বাস করছে। তারা স্থায়ী বিভ্রান্তির শিকার, সেখান থেকে তাদেরকে ফেরানো বা সঠিক পথ প্রদর্শনের আর কেউ নেই। তাদের মস্তিস্ক এ বুঝকে গ্রহণ করে নিয়েছে। কিন্তু যখন একথাগুলো এভাবে বলা হয়, যেভাবে নিম্নোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে তখন তার মধ্যে জীবনের স্পন্দন এবং গতি সৃষ্টি হয়ে যায়। ইচ্ছে অনুভূতির পৃথিবীকে আলোড়িত করে।

Dhaka University Institutional Repository

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ . أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ.

"যারা কাফির তাদের কর্ম মরূভূমির মরিচিকার মত, যাকে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। এমনকি সে যখন সেখানে যায় তখন কিছুই পায় না, পায় আল্লাহকে, অতঃপর আল্লাহ তার হিসেব চুকিয়ে দেন আল্লাহ তো দ্রুত হিসেব গ্রহণকারী। অথবা তোমাদের কর্ম উত্তাল সমুদ্রবক্ষে গভীর অন্ধকারের মত, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের পর তরঙ্গ এবং ওপরে ঘণ কালো মেঘ আছে একের পর এক অন্ধকার। যখন সে তার হাত বের করে তখন সে তা একেবারেই দেখতে পায় না। বস্তুত: আল্লাহ যাকে আলোহীন করেন সে তার কোন আলোই পায় না।" [৮৭]

আলোচ্য আয়াতে শৈল্পিক এক ছবি আঁকা হয়েছে যা একজন মানুষকে চূড়ান্ত ভাবে সম্মোহিত করে দেয় । এ যেন এক রূপকথা। চিন্তা শক্তি এখানে তার সমস্ত ক্ষমতার প্রকাশ ঘটিয়েছে, কিন্তু রঙ্গিন ছবির উপকরণ এবং তাকে চলমান করার জন্য এখনো এক বিরাট তুলি এবং উৎকৃষ্ট ক্যামেরার প্রয়োজন।

প্রশ্ন হচ্ছে এমন তুলি ও ক্যামেরা কোথা হতে, কোথা থেকে সরবরাহ করা হবে যা সেই অন্ধকারের কথা বলা হয়েছে। তারপর এক পিপাসার্তের ছবি যে মরিচিকার পিছনে দৌড়ে চলেছে, সেখানে এমন জিনিস পায়, যা সে স্বপ্নেও চিন্তা করেনি। অথাৎ মহান আল্লাহর সত্তা। অতঃপর আল্লাহ চোখের পলকে তার হিসেব চুকিয়ে দেন।

এ আয়াতে আমরা সেই দীনি উদ্দেশ্য দেখতে পাই যে জন্য এ দৃশ্যটির অবতারণা করা হয়েছে। সেই সাথে আমরা এক অত্যাধুনিক শিল্পকলারও পরিচয় পাই যা সদা প্রাণবন্ত এ ছবিতে বিদ্যমান।

৫. নিচের আয়াত ক'টিতে হিদায়াত পাওয়ার পর গুমরাহ হয়ে যায় তাদের সুন্দর একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পূর্বের দেখা উদাহরণের সাথে এটি মিল আছে। এখানেও কিছু জীবন্ত ছবি একের পর এক পাওয়া যায়।

৮৭। আল-কুরআন, ২৪ : ৩৮-৩৯

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে ঃ

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ . مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ . صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ . أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ . يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

"তারা সেই সমস্ত লোক যারা হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করে। বস্তুত তারা তাদের এ ব্যবসায় লাভবান হতে পারেনি এবং হিদায়াতও তাদের নসীব হয়নি। তাদের অবস্থা সেই ব্যক্তির মত যে কোথাও আগুন জ্বালালো, যখন আগুন তার চতুর্দিক আলোকিত করে ফেললো তখন আল্লাহ তার চার দিকের আলো ওঠিয়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন। ফলে তারা কিছুই দেখতে পায় না। তারা বধির, মুক ও অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরে আসবে না। আর তাদের উদাহরণ সেই সব লোকের মত যারা দূর্যোগপূর্ণ ঝড়ের রাতে পথ চলে, যা আধার, গর্জনের সময়ে কানে আঙ্গুল দিয়ে রক্ষা পেতে চায়, অথচ কাফিরই আল্লাহ কর্তৃক পরিবেষ্টিত। বিদ্যুতের চমকে যখন সামান্য আলোকিত হয় তখন কিছুটা পথ চলে। আবার যখন অন্ধকার হয়ে যায়, তখন ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। আল্লাহ যদি ইচ্ছে করেন, তবে তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি কেড়ে নিতে পারেন, আল্লাহ তো সবকিছুর ওপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান"।[৮৮]

উল্লেখিত আয়াত ক'টিতে পর্যায়ক্রমে এক মনোজ্ঞ চিত্র অংকন করা হয়েছে। "কিছু লোক রাতের আধাঁরে আগুন জ্বালালো, তাতে তাদের চার দিক আলোকিত হয়ে গেল, হঠাৎ সে আলো অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায় তারা সীমাহীন আধারে ডুবে গেল।

এবং সেই আধাঁরের মধ্যে তারা পথ চলতে লাগল সাথে শুরু হলো ঝড় বৃষ্টি।

একদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত অপরদিকে মেঘের গুরু গম্ভীর নিনাদ, সাথে বিদ্যুতের চকম। ভয়ে দিশেহারা বিজলীর সামান্য ঝিলিক দেখলেই বজ্রপাতের ভয়ে কানে আঙ্গুল ঠেসে ধরে, আবার বিজলীর ঝিলিকে সামান্যক্ষণের জন্য আলোকিত হয়, সে আলোকে ক'কদম পথ চলে পুনরায় থমকে দাঁড়ায়।

এরূপ জীবন্ত ও চলমান ছবি তুলতে অত্যন্ত মুল্যবান ও স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরার প্রয়োজন। কিন্তু এখানে ক্যামেরা না সামান্য ক'টি শব্দের মাধ্যমে জীবন্ত চলমান ছবিটি উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে ছবিটিকে প্রাণবন্ত ও চলমান করার জন্য এমন কিছু আছে কি ? যা ক্যামেরার দ্বারা সম্ভব কিন্তু শব্দের দ্বারা সম্ভব হয়নি। বরং মানব সত্তা শাব্দিক ছবি দেখেই বেশী আনন্দিত হয়।

৮৮। আল-কুরআন, ২ : ১২-১৬

Dhaka University Institutional Repository

কারণ এর সাথে চিন্তা শক্তিও কাজ করে। সে ছবি আঁকে আবার মুছে দেয় এবং ছবিকে চলমানও করে। এ সময় মানব সত্তার মধ্যে আবেগের ঢেউ খেলে যায়। বিবেক প্রভাবিত হয়। হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়। জানেন এটি কেন হয় ? শুধু কিছু শব্দের প্রভাবে।[৮৯]

আল- কুরআনের বর্ণনাভঙ্গির বৈশিষ্ট্য

মহাপ্রাক্রমশালী আল্লাহর অসমান্য ও অনুপম কলম যেসব জড় বস্তুর স্পর্শ করেছে তাঁর মধ্যেই জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি হয়েছে। যে পুরনো বস্তুকে ছোয়া দিয়েছে তা-ই নতুন রূপে আবির্ভূত হয়েছে। এর কারণ সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অলৌকিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সৃষ্টি অন্যান্য মু'জিযা বা কুদরতের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়।

সকাল বেলার দৃশ্য প্রতিদিন দেখা যায়, জীবনে বার বার আসে এ সকাল, কিন্তু কোন মানুষের চোখ তা দেখে না। الصبح اذا تنفس

"সকাল বেলার শপথ, যখন তা অতিক্রান্ত হয় "।[৯০]

রাত সময়ের নিদিষ্ট একটি অংশের নাম কিন্তু কুরআনের বর্ণনায় তাকে জীবিত ও নতুন মনে হয়।

والليل اذا يسر "এবং রাতের শপথ, যখন তা অতিক্রান্ত হয়"। [৯১]

আল-কুরআনের মতে দিন দ্রুতবেগে রাতের পেছনে ধাবমান, রাতকে ধরার জন্য يغشى الليل والنهار يطلبه حثيثا . "তিনি পড়িয়ে দেন রাতের ওপর দিনকে। এমতাবস্থায়, দিন দৌড়ে রাতের পেছনে আসে"।[৯২]

ছায়া এক পরিচিত বস্তু, কিন্তু কুরআন, তাকে জীবন্ত ও চলমাল প্রাণীরূপে উপস্থাপন করেছে ঃ . فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه "অতঃপর তারা সেখানে একটি দেয়াল দেখতে পেলেন, যা ঝুঁকে রয়েছে, পড়ে যাবার উপক্রম, তা তিনি সোজা করে দাঁড় করে দিলেন"।[৯৩]

আল-কুরআন যে সমস্ত বস্তুর ছবি এঁকেছে তার মধ্যে আসমান জমিন, চন্দ্র, সূর্য, পাহাড়, জঙ্গল, আবাদী জায়গা, অনাবাদী জমি, গাছপালা ইত্যাদি অন্যতম। এগুলোর জীবন্ত ছবি দিয়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সে ছবিকে কেউই মৃত বলতে পারে না। একেবারে জীবন্ত চলমান।

এ হচ্ছে আল-কুরআনের বর্ণনা ও উপস্থাপনার পদ্ধতি। যা আল কুরআনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে পূর্ণতার দ্বার প্রান্তে পৌছে দিয়েছে।[৯৪]

৮৯। সাইয়্যেদ কুতুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২-৩২৩

৯০। আল-কুরআন, ৮১ : ১৮

৯১। আল-কুরআন, ৮৯ : ৪

৯২। আল-কুরআন, ৭ : ৫৪

৯৩। আল-কুরআন, ১৮ : ৭৭

৯৪। সাইয়্যেদ কুতুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫-৩২৭

Dhaka University Institutional Repository

আল- কুরআনের সূরা অবতীর্ণের ক্রমধারা

সূরার নাম	অবতীর্ণ ক্রম	সংকলন ক্রম
❒ সূরা আল আলাক/ সূরা ইকরা বিইসমি	০১	৯৬
❒ সূরা আল মুয্যাম্মিল	০২	৭৩
❒ সূরা আল মুদ্দাসসির	০৩	৭৪
❒ সূরা আল কলম	০৪	৬৮
❒ সূরা আল ফাতিহা/ আস সাবাউল মাছানী	০৫	০১
❒ সূরা লাহাব/ সূরা মাসাদ	০৬	১১১
❒ সূরা আত্ তাকভীর	০৭	৮১
❒ সূরা আল আ'লা	০৮	৮৭
❒ সূরা আল লাইল	০৯	৯২
❒ সূরা আল ফাযার	১০	৮৯
❒ সূরা আদ দোহা	১১	৯৩
❒ সূরা ইনশিরাহ/ সূরা আলাম নাশরাহ/ সূরা আশ শরহ	১২	৯৪
❒ সূরা আল আসর	১৩	১০৩
❒ সূরা আল আদিয়াত	১৪	১০০
❒ সূরা আল কাওছার	১৫	১০৮
❒ সূরা আল তাকাছুর	১৬	১০২
❒ সূরা আল মাউন	১৭	১০৭
❒ সূরা আল কাফিরুন	১৮	১০৯
❒ সূরা আল ফীল	১৯	১১৫
❒ সূরা আল ফালাক	২০	১১৩
❒ সূরা আন নাস	২১	১১৪
❒ সূরা আল ইখলাছ	২২	১১২
❒ সূরা আন নাযম	২৩	৫৩
❒ সূরা আবাসা	২৪	৮০
❒ সূরা আল কাদর	২৫	৯৭
❒ সূরা আশ শামস	২৬	৯১
❒ সূরা আল বুরূজ	২৭	৮৫
❒ সূরা আত তীন	২৮	৯৫
❒ সূরা কুরাইশ	২৯	১০৬

Dhaka University Institutional Repository

❒ সুরা আল ক্বারিয়াহ	৩০	১০১
❒ সুরা আল ক্বিয়ামাহ	৩১	৭৫
❒ সূরা আল হুমাযা	৩২	১০৪
❒ সূরা আল মুরসালাত	৩৩	৭৭
❒ সূরা ক্বাফ	৩৪	৫০
❒ সূরা আল বালাদ	৩৫	৯০
❒ সূরা আত ত্বরিক	৩৬	৮৬
❒ সূরা আল ক্বামার	৩৭	৫৪
❒ সূরা সাদ	৩৮	৩৮
❒ সূরা আল আ'রাফ	৩৯	০৭
❒ সূরা জ্বিন	৪০	৭২
❒ সূরা ইয়াসীন	৪১	৩৬
❒ সূরা আল ফুরক্বান	৪২	২৫
❒ সূরা ফাতির	৪৩	৩৫
❒ সূরা মারইয়াম	৪৪	১৯
❒ সূরা ত্ব-হা	৪৫	২০
❒ সূরা ওয়াকিয়া	৪৬	৫৬
❒ সূরা আশ শুয়ারা	৪৭	২৬
❒ সূরা আন নামল	৪৮	২৭
❒ সূরা ক্বাসাস	৪৯	২৮
❒ সূরা বাণী ইসরাঈল/ সূরা আসরা	৫০	১৭
❒ সূরা ইউনুস	৫১	১০
❒ সূরা হুদ	৫২	১১
❒ সূরা আল হিযর	৫৩	১২
❒ সূরা আল আনআম	৫৪	১৫
❒ সূরা আস সাফফাত	৫৫	০৬
❒ সূরা লুকমান	৫৬	৩৭
❒ সূরা আস সাবা	৫৭	৩১
❒ সূরা আয যুমার	৫৮	৩৪
❒ সূরা আল মু'মিন/ সূরা গাফির	৫৯	৩৯
❒ সূরা হা-মীম আস সাজদা/ সূরা ফুসসিলাত	৬১	৪০

Dhaka University Institutional Repository

❒ সূরা আশ শুরা	৬২	৪১
❒ সূরা আয যুখরুফ	৬৩	৪২
❒ সূরা আদ দুখান	৬৪	৪৩
❒ সূরা আল জাছিয়া	৬৫	৪৪
❒ সূরা আল আহকাফ	৬৬	৪৫
❒ সূরা আয যারিয়াত	৬৭	৪৬
❒ সূরা আল গাশিয়া	৬৮	৫১
❒ সূরা আল কাহফ	৬৯	৮৮
❒ সূরা আন নাহল	৭০	১৮
❒ সূরা নূহ	৭১	১৪
❒ সূরা ইবরাহীম	৭২	৭১
❒ সূরা আম্বিয়া	৭৩	১৪
❒ সূরা আল মু'মিনুন	৭৪	২১
❒ সূরা আস সাজদাহ	৭৫	২৩
❒ সূরা আত তুর	৭৬	৩২
❒ সূরা আল মুলক	৭৭	৫২
❒ সূরা আল হাক্কাহ	৭৮	৬৭
❒ সূরা আল মা'আরিজ	৭৯	৬৯
❒ সূরা আন নাবা	৮০	৭০
❒ সূরা আন নাযিয়াত	৮১	৭৮
❒ সূরা ইনফিতর	৮২	৭৯
❒ সূরা ইনশ্বিকার	৮৩	৮২
❒ সূরা আর রূম	৮৪	৮৪
❒ সূরা আল আনকাবূত	৮৫	৩০
❒ সূরা আল মুতাফফিফীন	৮৯	২৯
❒ সূরা আল বাকারা	৯০	৮৩
❒ সূরা আল আনফাল	৯১	০২
❒ সূরা আল ইমরান	৯২	০৩
❒ সূরা আল আহযাব	৯৩	৩৩
❒ সূরা মুমতাহিনা	৯৪	৬০
❒ সূরা আন নিসা	৯৫	০৪

Dhaka University Institutional Repository

❒ সূরা আল যিলযাল	৯৬	৯৯
❒ সূরা আল হাদীদ	৯৬	৫৭
❒ সূরা মুহাম্মদ/ সূরা কিতাল	৯৭	৪৭
❒ সূরা আর রা'দ	৯৮	১৩
❒ সূরা আর রাহমান	৯৯	৫৫
❒ সূরা আদ দাহর/ সূরা ইনসান	১০০	৭৬
❒ সূরা আত তালাক	১০১	৬৫
❒ সূরা আল বায়্যিনাহ	১০২	৯৮
❒ সূরা আল হাশর	১০৩	৫৯
❒ সূরা আন নূর	১০৪	২৪
❒ সূরা আল হাজ্জ	১০৫	২২
❒ সূরা আল মুনাফিকুন	১০৬	৬৩
❒ সূরা আল মুজাদালাহ	১০৭	৫৮
❒ সূরা আল হুজুরাত	১০৮	৪৯
❒ সূরা আত তাহরীম	১০৯	৬৬
❒ সূরা আত তাগাবুন	১১০	৬৪
❒ সূরা আছ সফ	১১১	৬১
❒ সূরা আল জুম'আ	১১২	৬২
❒ সূরা আল ফাতহ	১১৩	৪৮
❒ সূরা আল মায়িদা	১১৪	০৫
❒ সূরা আত তাওবা/ সূরা বারয়াত	১১৫	০৯
❒ সূরা আন নাসর'	১১৬	১১০

৯৫

৯৫। সাইয়্যেদ কুতুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪-৩৩৬

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনের উপসংহার পদ্ধতি

কুরআনের শৈলীর আরেকটি দিক উপসংহার পদ্ধতি। কুরআনের যেসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও সিফাতের বর্ণনা এসেছে তা সমাপ্ত করা হয়েছে। ان الله على كل شئ قدير "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকটি বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।[৯৬]

আবার যেখানে কোন রহস্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে সেখানে ان الله عليم بذات الصدور "নিশ্চয় আল্লাহ অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত"[৯৭] বাক্য দ্বারা শেষ করা হয়েছে।

আবার যেখানে আল্লাহর অধিক ক্ষমতা বা শক্তির পরিধি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেখানে وهو على كل شئ قدير "তিনি প্রত্যেকটি বস্তুর উপর ক্ষমতাবান"।[৯৮] বাক্য দ্বারা উপসংহার টানা হয়েছে।

যেখানে বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'আলার অপার অনুগ্রহ, দয়া, অনুকম্পা প্রদর্শনের বর্ণনা এসেছে সেখানেই انه هو الغفور الرحيم "নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু"[৯৯] বাক্য বা অনুরূপ সমঅর্থবোধক বাক্য দ্বারা শেষ করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে যেখানেই আশ্চর্য জনক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে বা মানুষকে অবাক করে দেয় এমন ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে সেখানেই আল্লাহ তা'আলা انه هو السميع العليم "নিশ্চয় তিনি পরম শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী"[১০০] দ্বারা উপসংহার টানা হয়েছে।

৯৬। আল-কুরআন, ৩ : ২০ (শেষাংশ)

৯৭। আল-কুরআন, ৬৪ : ৪ (শেষাংশ)

৯৮। আল-কুরআন, ২ : ২৯ (শেষাংশ)

৯৯। আল-কুরআন, ৩৯ : ৫৪ (শেষাংশ)

১০০।আল-কুরআন, ১৭ : ১ (শেষাংশ)

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনের ভাষা, সাহিত্যশৈলী, অলংকার ও বিন্যাস পদ্ধতি সম্পর্কে প্রাজ্ঞ মনীষীগণের মন্তব্য

ড. ত্বাহা হুসাইন বলেন, এতে সন্দেহ নেই কুরআন আরবী গদ্যের আদি গ্রন্থ। কিন্তু তোমরা এও জান যে, কুরআন গদ্য নয়, তদ্রুপ কুরআন কাব্যও নয়। কুরআন কুরআনই। একে অন্য কোন নাম দেয়া যায় না। কুরআন যে কাব্য নয় তা সহজে প্রতিভাত হয়, কারণ কাব্যের বাঁধা ধরা নিয়ম এতে অনুপস্থিত। আর কুরআন গদ্যও নয়, এজন্য এর স্টাইল বিশেষ বৈশিষ্ট্য মন্ডিত যা অন্য কোন গদ্যে পাওয়া যায় না। আয়াতের শেষাংশ বিশেষ নিয়মে সুবিন্যাস্ত। সুরের ঝংকারে আয়াতগুলো মাধুর্যমন্ডিত । কাজেই কুরআন গদ্য বা পদ্য কোনটিই নয়। আমরা একে গদ্য পদ্য বলতে পারি না। কুরআন একটি একক পদ্ধতি, অনুপম ও অতুলনীয়। পূর্বেও এর সমতুল্য কিছু ছিল না এবং পরেও এর সমতুল্য কিছু হয়নি বা হবে না। এর পদ্ধতির অনুকরণ কেউ করতে পারেনি। একথা সত্য যে, কুরআনের একটি বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে, যার সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা চলে না।[১০১]

পাশ্চাত্য মণীষী সেল বলেন, "একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, কুরআনের ভাষা স্বচ্ছতা ও ঔজ্জ্বল্যের দিক দিয়ে চূড়ান্ত সোপানে উন্নীত। মুহাম্মদ (সা.) কুরআনের অলৌকিকত্ব দিয়ে নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করতে পেরেছেন, বড় বড় ব্যক্তি ও পন্ডিতদের তিনি চ্যালেঞ্জ করেছেন। হাজার হাজার মানুষ যে যুগে কুরআনের ভাষা ও শৈলীর বিপরীতে চমকপ্রদ কিছু সৃষ্টি করে বিজয়ী হতে প্রচন্ড উৎসাহী ছিল। কিন্তু তাদেরকে মাত্র একটি আয়াত বা সূরা রচনা করতে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। জবাবে তারা নিশ্চুপ, নিস্তবদ্ধ ও নীরব ছিল"।[১০২]

সেল আরো বলেন,

The style of Quran is generally beautifull and fluent and in many places specially where the majesty and attributes of god are described sublime and magnificent.[১০৩]

১০১। ড. ত্বাহা হুসাইন, *মিন হাদিসিস শিরি নাসরি,* মিসরঃ দারুল কলম, ১৯৬৮ খৃ. ১০ম সং, পৃ. ২৫

১০২। The Encyclopedia of Islam (Urdu) Lahor : The University of panjab : p. 125.

১০৩। Ibid.

Dhaka University Institutional Repository

আলী ইব্ন রব্বান আত্-তাবারী বলেন,[১০৪] আল কুরআনের ত্রুটি বিহীন রচনাশৈলী ও সাহিত্যরীতি জগতের কোন ভাষায় বা সাহিত্যে মিলবে না। [১০৫]

আল কুরআনের রচনাশৈলী ও সাহিত্যরীতি সম্পর্কে জারীর আত তাবারীর অভিমত হচ্ছে "আল কুরআনের চিরন্তন বাণী একটি অবিনশ্বর মু'জিযা, যা চিরদিন অক্ষুন্ন থাকবে। মানুষের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার দ্বারাও এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। কুরআনের রচনাশৈলী ও ভাষার লালিত্য এতই অসাধারণ যে, যা অন্যসব আসমানী কিতাবের গুণাবলীকে ম্লান করে দেয় এবং তদানীন্তন খ্যাতনামা কবি, আর যুগ যুগান্তরের কত সাহিত্যরথী ও বাগ্মীদের হতবাক করে দিয়েছে। কুরআনের বিরুদ্ধে তাদের সকল সাধনা ও প্রচেষ্টাও একান্তভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।[১০৬]

আল কুরআনের শৈল্পিক বিন্যাস ও রচনাশৈলীর উৎকর্ষের কারণেই আল-কুরআনের বিচ্ছুরণ ঘটেছে অপূর্ব সুর মূর্ছনায়। কুরআন পাঠ কালে পাঠকের হৃদয় পুলকিত হয়, স্বর্গীয় আনন্দে তার প্রতিটি ইন্দ্রিয় ছুঁয়ে যায়। কুরআনের প্রতি মানুষের আকর্ষণ মূলত কুরআনের বিন্যাস পদ্ধতি ও শৈলীর কারণেই।

১০৪। আল-কুরআনের রচনাশৈলী যে, এর মু'জিযার একমাত্র প্রমাণ এই মতবাদটি 'আল্লামা তাবারী (রহঃ)-ই তাঁর *"আদদীন ওয়াদ দৌলাহ"* গ্রন্থে জোড়ালো ভাষায় প্রকাশ করেন। (বিস্তারিত দ্রঃ তাবারী, আদদীন ওয়াল দৌলাত, মিশরঃ ১৯৩৩ খৃ.।

১০৫।'আল্লামা আলী বিন রব্বান আত-তাবারী, *আদদীন ওয়াদ দৌলাহ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

১০৬। আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জরীর আত-তাবারী, *জামিউল বয়ান আত তাবিল আইয়িল কুরআন,* বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪১৫হিঃ/১৯৯৫ খৃ. খ. ১, পৃ. ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতিহাস দর্শন ঃ একটি পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতিহাস দর্শনঃ একটি পর্যালোচনা

ইতিহাস পরিচিতি

অভিধান ও বিশ্বকোষে ইতিহাস

"ইতিহাস ঃ ইতিবৃত্ত, পূর্বাবৃত্ত। ইতিবৃত্ত অর্থঃ বৃত্তান্ত, ইতিহাস। পূর্বাবৃত্ত অর্থঃ পূর্ববৃত্তান্ত, ইতিহাস- পূর্বাবৃত্ত"।[১]

"ইতিহ এই প্রকার, তদ্রুপহঃ সমাচার, পরম্পরাগত উপদেশ, পুরাতন কথা, জনশ্রুতি কিংবদন্তী। ইতিহাস হলো, যাতে পরম্পরাগত উপদেশ আছে, পূর্ব বৃত্তান্ত, পুরাবৃত্ত, প্রাচীন কথা, ইতিবৃত্ত, History, অতীতের কথা যা হয়ে গেছে তার যথাযথ চিত্র। যিনি অসংখ্য লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করে তাদের আদর্শ রূপে বিরাজমান, তার চরিত্রকথা যাতে বিবৃত হয়েছে, তা-ই ইতিহাস। ইতিহাসের ভিত্তি ব্যক্তি বিশেষের জীবনী। অতীত ঘটনার ফলাফল দর্শনে বর্তমানকে কিরূপভাবে আয়ত্ব করলে ভবিষ্যতে সুফল লাভ হয়, ইতিহাস তাই নির্দেশ করে।"[২]

আভিধানিক অর্থ ঃ

'ইতিহাস' শব্দের আরবী প্রতিশব্দ তারীখ। অর্থ সময় নির্দিষ্ট করণ। আরবী ভাষায় এই উক্তিটি ارخت الكتاب ورخته 'আমি লেখার সময়টি লিখে দিয়েছি'।

আবু নাসর ইসমাঈল ইব্ন হাম্মাদ আল-জাওহারী (রঃ) লিখেছেন ঃ "তারীখ" (التاريخ) অর্থ সময় বলা যা আরবী ارخ বা ارخ থেকে নির্গত। এর অর্থ বন্য গাভীর সদ্যজাত স্ত্রী বাচ্চা। তারীখও যেহেতু প্রত্যেক দিন নতুন নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ ঠিক বাচ্চার মত। এই জন্যই এ থেকেই তারীখ শব্দটি গঠিত হয়েছে। কারো কারো মতে, শব্দটি ফারসী "মাহরোজ" থেকে গৃহীত। 'মাহ' অর্থ চাঁদ- যা শুধুমাত্র রাত্রে দেখা যায় ও আলো দেয়, আর "রোজ" অর্থ দিন অর্থাৎ এই দিন-রাত্রি। এর তাৎপর্যগত অর্থ চলমান দিন রাত্রির ঘটনাবলী।[৩]

"কোন জিনিসের তারীখ অর্থ তার শেষ মাথা। এই কারণে প্রখ্যাত ঘটনাবলী যে সময়ে সংঘটিত হয় "তারীখ" অর্থাৎ ইতিহাস তার বিবরণ পেশ করে"। [৪]

১। আশুতোষ দেব, *শব্দবোধ অভিধান,* কলিকাতা: ১৯৯৭, পৃ.১৫৪

২। শ্রী-জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস, *বাংলা ভাষার অভিধান,* কলিকাতা:১৯৫৯, পৃ. ২০৯

৩। 'আল্লামা সাখাভী, *আল-ইলান বিত্তাওবিখ লিমমান যমমুত তারিখ,*মিসর: দারুল কলম, ১৮৬৮ খৃ. পৃ.২৭-২৮

৪। আবুল ফারজ কুদামাহ, *কিতাবুল খারাত,* বৈরুত: তা.বি.পৃ. ৯০১

Dhaka University Institutional Repository

পারিভাষিক অর্থ

একটি সময় বলে সেই সময়কার সমস্ত অবস্থা নির্ধারণ করা। মোট কথা প্রাথমিক, মধ্যবর্তী ও তৎপরবর্তী সময়ের অবস্থা অনুসন্ধানে যা কিছুই জানা যায় তা-ই ইতিহাসের অন্তর্গত। তাই সৃষ্টি লোকের উৎপত্তি ও নবী রাসূলগণের আগমন, কার্যাবলী ও অন্তর্ধান, রাষ্ট্রীয় ওলট পালট, সর্বধ্বংসী ঝড়-ঝঞ্ঝা, যুদ্ধ সংগ্রাম ; এ সবই ইতিহাসের বিষয়বস্তু। অতীত হয়ে যাওয়া জাতি জনগোষ্ঠী সমূহের ইতিবৃত্ত, কিয়ামত ও তৎপূর্বে সংঘঠিতব্য বড় ঘটনা- যা প্রত্যক্ষ সাধারণ পর্যবেক্ষণে এসেছে এবং যার বিবরণ পাঠ করে সকলেই উপকৃত হতে পারে তা-ই ইতিহাস। এক কথায় "ইতিহাস" এমন একটি বিষয় যা সমস্ত কালের ও সময়ের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে, ঘটনার সময় কাল নির্ধারণ করে। সংক্ষেপে বললে সমগ্র জগতের ঘটনাবলী আলোচনা পর্যালোচনা করাই ইতিহাসের কাজ। [৫]

ইতিহাসের বিষয়বস্তু

ইতিহাসের আলোচ্য কাল হচ্ছে সময় ও মানুষ। এ দু'টি জিনিসকে কেন্দ্র করেই ইতিহাসের চাকা আবর্তিত হয়। এ দু'টির বাস্তব ও খুঁটিনাটি সমস্ত অবস্থাই ইতিহাসে বর্ণিত হয়, যা কালের স্রোত ধারায় মানুষের সম্মুখবর্তী হয়।[৬]

1. History, L. French historia: a learning by inquiry, information, knowledge, narrative. History, knowing, learned, wiseman, par-historian to inquire into examine relat, (Par history) a narrative events connected with a real or imaginary object, person or career, tale, story, such a narrative directed to the exposition of the natural unfolding on inter dependence of the events treated of passion greed and retribution.

2. (a) Systematic written account comprising a chronological record of events including a philosophical explanation of the cause of origin of such events, distinguished from annals onecodotory such.

(b) A treatise presenting systematically related natural phenomena.

(c) An account of a rich person and person background his past health and present illness.

৫। উদ্ধৃত, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামের ইতিহাস দর্শন*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ২০০৩, পৃ. ১৪

৬। 'আল্লামা সাখাভী , প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮

Dhaka University Institutional Repository

3. A branch of knowledge that record and explains past events as steps in the sequence of human activities, the study of charactor and significance of human activities, used with qualifying objective.[৭]

History :

1. An account of what has happened, narrative: story; tale.
2. a. what has happend in the life or development of a people country, institution, ect.

   b. A Systematic account of this usually with as analysis and explanation.
3. All recorded events of the past.
4. The branch of knowledge that deals systematically with the past; a recording analyzing co-ordinating and explaining of past events, abbreviated hist.
5. A known of recorded pass, as, this, coat has a strange history.
6. Something that belongs to the past, as, the argument is history now.
7. Something important enough to be recorded.[৮]

History: The term history has had a dual meaning. Originally it referred to a record of past human events the word are used by the ancient greek herdotus meant inquiry- but in modern times of term has come to be applied to actual past events in human affairs on even in nature. In fact however, human knowledge of pass events especially those beyond living memory traditions and physical evidence all of which must be interpreted. History therefore is most usefully understood do refer do the historians reconstructions of the past. [৯]

৭। Webster's Third New International Dictionary, D. Philp Babcock Govs, London:1959,P.1073

৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

৯। উদ্ধৃত, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামের ইতিহাস দর্শন*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ২০০৩, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

The term history may be employed in two quite different senses: it may mean (1) The events and action that together make up the human past, or (2) The accounts given of that past and the modes of investigation where by they are arrived at or constructed. When used in the first, sense, the word refers to what as a mater of fact happened, while when used in the second it refers to the study and description of those happenings. The nation of the philosophical reflection upon history and its nature is consequently open to more then one interpretation and contemporaneous writers have found inconvenient to regard it as converting two maix types of undertaking. on the one hand, they have distinguished philosophy of history in the traditional or classical senses, this is conceived to be a first-order enquiry, its subject matter being historical process as a whole and its aim being, broadly speaking, one of providing an over all elucidation of explanation of the course and direction taken by that process, on other hand, they have distinguished philosophy of history considered as a second order enquiry have attention is not focused upon the actual sequence of events themselves but, instead, upon the procedures in approaching and comprehending their to material. [১০]

ইতিহাস : বাংলা বিশ্বকোষের ভাষ্য

ইতিহাস (History) সাধারণ অর্থে ইতিহাস হল মানবের অতীত কাহিনী। বিশেষ অর্থে বলতে গেলে তা অতীতের আলেখ্য। শুধুমাত্র অতীত ঘটনাপঞ্জি ও দলিলপত্রে প্রাপ্ত বিষয়াদিই এর আলোচ্য বিষয় নয় ; বরং অতীত সম্পর্কে অন্যান্য প্রকার যেমন- কীর্তিস্তম্ভ, দালান-কোঠা, প্রাচীন শিল্পকলা, ব্যবসায় সংক্রান্ত কাগজপত্র ও সংবাদপত্র প্রভৃতি যা কিছু পাওয়া যায় তাও ইতিহাসের অন্তর্গত। যে আমলের ঘটনাপঞ্জি পাওয়া যায় না, তাকে প্রাগৈতিহাসিক কাল বলা হয়। তবে এই প্রাগৈতিহাসিক কাল বিভিন্ন জাতি সংস্কৃতির জন্য বিভিন্ন রকমের(যেমন- উত্তর আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানদের কাহিনী-১৯শ শতকের বিশ্ববাসীর নিকট প্রগৈতিহাসিক ছিল।) লেখার প্রচলন অব্যাবহিত পরেই প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি মিশর, মেসোপটেমিয়া ও চীনে ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জি লিপিবদ্ধ হতে থাকে। নিজেদের কীর্তি ও বিজয় কাহিনী ভাবী-বংশধরদের অবগতির জন্য রেখে যাওয়ার ব্যাপারে বিজয়ী রাজাদের অভিলাষ এ বিষয়ে সহায়ক হয়েছিল। তবে গ্রীকরাই খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ট শতকে প্রথম সু-সংবদ্ধ ইতিহাস রচনা করে। খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে সম্পাদিত লোগোগ্রাফায় (Logografoi) একটি সুসংবদ্ধ ইতিহাস। "হীরডোটাস"কে প্রথম ঐতিহাসিক বলে অনুমান করা হয়। দ্বিতীয় গ্রীক ঐতিহাসিক হলেন- "থিউসিডিডীস"।

১০। The new Encyclopedia Britnnica, London: Fifteen Edition-2002, P.1380

Dhaka University Institutional Repository

তিনি পোলাপসীয় যুদ্ধের ইতিহাস লিখেন। ইতিহাস লেখার ব্যাপারে তিনি হিরডোটাসের অস্পষ্ট পথ পরিহার করে যথাসম্ভব নির্ভূল ভাবে ঘটনাবলী সন্নিবেশ করার চেষ্টা করেন। তৃতীয় নামজাদা গ্রীক ঐতিহাসিক হলেন 'ফেনোফল'। তিনি বিবরণমূলক ইতিহাস রচনাতেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। পুরাতন যুগে গ্রীক ঐতিহাসিকগণ ইতিহাস লেখায় যে ধরন প্রর্বতন করেছিলেন আজকালও তা অনুসৃত হয়। প্রথম দিকে থিউসিডিডীষ-এর ধারণাই প্রাধান্য লাভ করে এবং রোমান আমলের দু'জন বিখ্যাত ঐতিহাসিক পোলিবিয়াস ও ডাইঅন ক্যালিয়াস কম-বেশী তাঁরই অনুসরণ করেন।[১১]

অপর পক্ষে রোমান ঐতিহাসিক লিভি বিবৃতিমূলক ইতিহাস লেখার উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। ট্যাসিটাস মোটামুটি থিউডিডীষকেই অনুসরণ করেন। ঘটনার নির্ভূলতার প্রতি তার অত্যধিক ঝোঁক ছিল। ইয়াহুদী ঐতিহাসিক জোসীফাস এর মধ্যে একই প্রবনতা কিছুটা দেখা যায়। কিন্তু মধ্যযুগ ইতিহাস থেকে এই ভাবধারার বিলুপ্তি ঘটে। মধ্যযুগে ইতিহাস লেখায় দু'ধরনের ভাবধারা বিরাজ করে। তন্মধ্যে একটি বিশ্বজনীন ইতিহাস এই শ্রেণীর লেখকগণ সেন্ট আগাসটিনের "সিটি অব গড়" হতেই অনুপ্রেরণা লাভ করেন। ওরোশীয়াস এই মতবাদকে তুলে ধরেন এবং পরবর্তীকালে সেভিল এর ইষিডোর এর ন্যায় ছোটখাট ঐতিহাসিকগণ তা অনুসরণ করেন। অপরটি হলো ঘটনাপঞ্জি প্রনয়ন এই শ্রেণীর ঐতিহাসিকদের লেখায় স্থানীয় গীর্জার সামান্য ঘটনাবলীর ইতিবৃত্ত থেকে শুরু করে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সুশৃঙ্খলভাবে স্থান পেত। স্যাকসোম্যাটিকাস, ফাইযিং এর অটো, ওয়েনডোভারের রজার এবং প্যারিসের ম্যাথিউ এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক। এই সময় ব্যাপক ভিত্তিক জাতীয় ইতিহাস লেখারও প্রচেষ্টা হয়েছিল। এই ব্যাপারে ফ্যাশডোরাস ও গ্রেগরি যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তা অনুসারীর অভাবে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। এই সময়ের ঘটনাপঞ্জিগুলোর অধিকাংশই যাজক শ্রেণীদের সম্পর্কে লিখিত এবং যেহেতু জ্ঞানার্জন শুধুমাত্র গির্জার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সেহেতু ঘটনাপঞ্জিগুলো গির্জার প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেই লিখিত হয়েছে। রেনেসাঁস ও তৎপরবর্তী কালের মানবিক ইতিহাস লেখকগণ বিনা প্রমাণে ঘটনাবলী সংযোজিত করায় উপরিউক্ত মনোভাবের কঠোর সমালোচনা করেন। এদের মতে ঘটনাপঞ্জিতে স্থানপ্রাপ্ত ঘটনাগুলোর নির্ভুলতা সন্দেহাতীত হওয়া উচিত ছিল। বীড়ের একলীযিয়াস হিসট্রি ইতিহাস লেখার এক নতুন গুরুত্বপূর্ণ শাখার সূত্রপাত করেছিল। ক্রুসেড অংশ গ্রহনকারীদের জীবন বৃত্তান্ত বা আধা জীবন বৃত্তান্তসমূহে টাইন এর উইলিয়ামের সমালোচনামূলক ইতিহাসের জন্ম (১২ শতক) হয়েছিল। বাইজ্যান্টাইন ও মুসলিমদের সংস্পর্শে আসার পর ইতিহাস লেখার বিষয়ে পশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত হয়। প্রথমদিকে বাইজ্যান্টাইন ইতিহাস শুধুমাত্র ঘটনাপঞ্জি প্রনয়নে সীমাবদ্ধ থাকে।

১১। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম,প্রাগুক্ত, পৃ.১৬

Dhaka University Institutional Repository

বিখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক মাসউদী, শামস উদ্দীন তাবারী ও ইব্ন খালদুনের লেখা পাশ্চাত্যের উপর কতদুর প্রভাব বিস্তার করেছিল তা বির্তকের বিষয়। ইব্ন খালদুন- অবশ্য মহান ঐতিহাসিকদের অন্যতম বলে স্বীকৃত। ১২ শতকে নতুন জ্ঞান সকল প্রকারের লেখার ধাচ্ ও প্রকৃতিকেই পরিবর্তন করে দেয়। চতুর্থ ক্রুসেডের অন্যতম নায়ক ভীলার দো'আ এর লেখার যে ধর্ম বা গোষ্ঠী নিরপেক্ষতার পরিচয় ফুটে ওঠে, পরবর্তী বহু লেখকের লেখায় তার প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থক দৃষ্ট হয়। রেনেসাঁস-এর সময়ে মানবতাবাদের যে উন্মেষ হয় তার ফলে সমস্ত ইতিহাস বিষয়টিই নতুনরূপে পরিগ্রহ করে। এই সময়ের ঐতিহাসিকগণ গ্রন্থ সমালোচনা এবং সন্নিবেশিত দলিল ও সূত্রগুলো সত্যের কষ্ঠিপাথরে যাচাই করে নেয়ার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। পুরাতন গতানুগতিক পথ পরিহার করে সত্যানুসন্ধানী মন লয়ে ইতিহাস প্রনয়নের ব্যাপারে এ পর্যায়ে যারা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে পেটরার্ক, লোরেনতসো, ভাললা, প্যাদিউয়ার, মারসিলিয়াম, হোআন লুইস, ভীভেস এর নাম উল্লেখযোগ্য। ক্লাসিক্যাল শিক্ষা পুনঃপ্রবর্তনের পর ঐতিহাসিকদের উপরও তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এবং বলা যায় সৃষ্টিধর্মী গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ম্যাকিআভেলী ও গৌঈতচারদীনা গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিকদেরই পদাংক অনুসরণ করেছেন। সপ্তদশ শতকে ঝাঁ বোদ্যাঁ ঝাঁ মায়ীই ইতিহাস লেখার সমালোচনামূলক পন্থা গ্রহণ করেন এবং আধুনিক ইতিহাসের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। ১৮ শতকীয় "এনলাইটেনমেন্ট পন্থী" পন্ডিতগণ "ভলতেয়ার" ইতিহাস লেখাকে বিশ্বজনীন রূপ দান করেন এবং মানুষের সামাজিক ও নৈতিক দিকটাকে ইতিহাসের অন্ত-র্ভূক্ত করেন। তিনি ইতিহাস লেখার মামুলী রীতিকে সম্পূর্ণ রূপে বর্জন করেন। মতেসকি আর এসপিরিট ডেস্ লইস এ মানবেতিহাসের মূল প্রাকৃতিক ভিত্তিতে ফিরে যাওয়ার আভাস প্রচ্ছন্ন।[১২]

১৮ শতকে জোভাননী বাৎ- তীসতা ভীকো ইতিহাসকে সমকালীন ধ্যান-ধারণার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এ ব্যাপারে ইংল্যান্ডের এওয়ার্ড গিবন এর নিকট হতে উৎসাহজনক সাড়া পাওয়া যায়। এ শতকের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব প্রাচীনতার নিগড় মুক্ত হয় এবং ভাষা বিজ্ঞান ক্লাসিক্যালপন্থীদের প্রভাব মুক্ত হয়। ১৯ শতকে এই দুই বিজ্ঞান বস্তুবাদী সমালোচনামূলক ইতিহাস প্রনয়নের অগ্রগতিতে বিশেষ সহায়ক হয়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক লেওপলটফন রাংকে ছিলেন নুতন বস্তুবাদী মতবাদের পথিকৃত। তাঁর এবং সমসেন, ড্রইযেন ও ট্রাইচকে প্রমুখ তার উত্তরাধিকারীদের প্রচেষ্টার ফলে সমালোচনার রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন ও ঐতিহাসিক পদ্ধতি বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে। জার্মান ঐতিহাসিকগন ইতিহাস লেখাকে পেশায় পরিণত করেন এবং ইতিহাসকে পর্যায়ক্রমিক করেন।

১২। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য দেশেও ইতিহাস লেখার উন্নতি ঘটে। ফ্রান্সে ফুসতেলা দ্য কুলাঝ-এর নেতৃত্বে আধুনিক ইতিহাস লেখার কাজ পূর্ণ উদ্যমে শুরু হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জর্জ ব্যানক্রফ্‌ট এর পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ যে গতি সঞ্চার করেছিলেন এডওয়ার্ড চানিং এর ন্যায় সুক্ষ্মদর্শী এবং হেনরী অ্যাডামষ ও ফ্রেভারিক জে. টারনামের ন্যায় শক্তিশালী ঐতিহাসিকগণ তা অক্ষুন্ন রাখেন। সম্পূর্ণ পৃথক উপায়েই তারা ইতিহাস অধ্যয়নের উন্নয়ন শুরু করেন। ইংল্যান্ডের স্যামুয়েল আর গর্ভিনার ও চার্লস এইচ. ফার্থ পুরাতন হুইগ ঐতিহাসিক টমাস বি. ম্যাকলিও অন্যান্যদের মতবাদকে দোষমুক্ত মনে করেন। ইত্যবসরে ইতিহাস দর্শনকে ব্যাপকতর করার কাজেও ভাটা পড়েনি। হেগেলের দর্শনের অনুসারী একটি আদর্শবাদী ঐতিহাসিক শ্রেণী গড়ে ওঠে এই মতবাদকে ক্রমশ প্রসারিত করতে থাকেন। অন্যান্য মতাদর্শ সাধারণ দর্শন বা তত্ত্ব অভিমূখী হয়। পরবর্তী কয়েকজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক হলেন টমাস রাক্‌ল, অসভালট স্পেংলার, বেনেদ্যেতো, ক্রোচে ও আরন্ড টয়েনবী কার্ল মার্কস -এর মতবাদ প্রসার লাভের ফলে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসের ব্যাখ্যা শুরু হয় এবং অন্যান্য মতবাদ কোনঠাসা হয়ে পড়ে। অর্থনীতি ইতিহাসের অন্যান্য মতবাদীর লোকও ছিলেন। তারা হলেন যুক্তরাষ্ট্রে হারভি রবিনসন এবং চালর্স-এ বিয়ার্ড। তবে সাধারণ গতি ধারা বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের দিকেই ছিল এবং ঐ গতিধারা বিংশ শতাব্দিতেও অব্যাহত থাকে। নৃতত্ত্ব ও সমাজ বিজ্ঞান হতেও ইতিহাসের নূতন নূতন অবদান আসতে থাকে। তৎফলে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সূত্রপাত হয়। বিভিন্ন মতবাদের সমাবেশে ইতিহাস লেখা এত জটিল হয়ে ওঠে যে, সংক্ষেপে তা বর্ণনা করা সম্ভব না। তবে এই কথা বলা যেতে পারে যে, বিংশ শতাব্দির মধ্যভাগে সাধারণ গতিধারা ছিল ও বিজ্ঞান ভিত্তিক ইতিহাস রচনা এবং ইতিহাসের ক্ষেতকে সমগ্র সমাজে সম্প্রসারিত করার প্রচেষ্টা চলে।[১৩]

১৩। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮

Dhaka University Institutional Repository

এশিয়ার ইতিহাস

ইউরোপের মত প্রাচীনকাল থেকে এশিয়ায়ও ইতিহাস রচনার লক্ষ্য ছিল ঘটনাবলীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করণ। (প্রধানত ঘটনাপঞ্জি রূপে) বর্ষপঞ্জি লিখন, বা সরকারী মহাফেজখানার বিবৃতি তৈরী। চীনে চৌরাজ বংশের শাসনের মাঝামাঝি সমস্ত রাজপরিবারে ও বিভিন্ন রাজ্যের ইতিহাস বিশেষত শূচিং বা ইতিহাসের দলিল, এবং লু এর বর্ষপঞ্জিসমূহ (কনফিউশিয়াম রচিত) সংকলিত হয়। স-সূনা চিয়েন (খৃ. আনু ৮৭ খ্রী. পূ.) চীনের প্রথম সাধারণ ইতিহাস রচনা করেন। পরবর্তীকালের বংশ ইতিহাস লেখকের জন্য তার ইতিহাস ছিল আদর্শ। তারপরে প্রথম শতাব্দীতে পা নূ সাবেক হানদের ইতিহাস লিখেন। টাং Tang বংশের আমলে তিন রাজা থেকে শুরু করে বাকী সময়ের বিবরণ সম্বলিত আটটি আদর্শমানের ইতিহাস লিখা হয়। একাধিক রাজকীয় কমিশনের উপর এর সংকলনের ভার অর্পিত ছিল। প্রাচীন উৎকীর্ণ লিপিসমূহে সংগ্রহণ করার পর সসূ-মা কুয়াং ৪০৩ খৃ. পূ. থেকে শুরু করে ৯৫৯ পর্যন্ত সময়ের একটি সামঞ্জপূর্ণ ইতিহাস রচনা করেন (১০৬৬-১০৮৪)। মিথ্যা ইতিহাস রচনা করে মানচু শাসকগণ অতীতকে গৌরব মন্ডিত করার চেষ্টা করতেন। উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিশ শতকের কাং ইউ-ওয়াই-ওয়াং থিয়েন-টিয়েন ও ওরাং ওয়াই কর্তৃক ইতিহাস রচনার ধারা চীনের ইতিহাসে সমালোচনামূলক রীতি উদ্ভব হয়। আনুমানিক খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে জাপানীরা রাজকীয় মহাফেজখানা সংরক্ষণ শুরু করেন এবং ষষ্ঠ শতকের মধ্যে একটি নির্ভুল কালানুক্রমিক বিবরণ (Chronology) প্রণীত হয় কজিকী (Kojiki) নামক গ্রন্থে পৌরাণিক আমল থেকে রাজবংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ বলে বিশ্বাস করা হয়। তার পরিপূরক যুগে লিখা হয় বিস্তারিত নিহোনশিকী এবং যা নবম শতকের শ্রেষ্ঠ পর্যন্ত পাঁচটি সরকারী ইতিহাস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়। সতেরশ শতকে চীনাদের বংশীয় ইতিহাসের আদর্শে তোকূগাওয়া মিৎ সুকুনী (১২৮-১৭০১) জাপানের একটি ইতিহাস রচনা শুরু করেন। ১৯০৬ পর্যন্ত তার পরিপূরক খন্ডসমূহ প্রকাশিত হয়। মুতূবী নোরিংগা (১৭৩০-১৮০১) শিনেটো ধর্ম ও রাজকীয় মর্যাদার পুনর্জীবনের জন্য একটি আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন, কজিকী সম্পর্কীয় তাঁর ব্যাখ্যা গ্রন্থ-এ সমাপ্ত হয়।

পাক ভারতের ঐতিহাসিক দলিলসমূহ খৃ. পূ. ষষ্ঠ শতক থেকে বিদ্যমান, প্রাচীনতর সংগ্রহ থেকে ঐ শতকে নূতনভাবে সকলন শুরু হয়। স্থানীয় শাসকদের বংশ তালিকা পূরাণসমূহে পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতে (মুসলিম বিজয়ের পূর্বে) ইতিহাস রচনায় তেমন প্রচলন ছিল না। ঐ সময় রাজনীতি ও ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কে অর্থ-শাস্ত্র নামীয় গ্রন্থাদি রচিত হত। সপ্তম শতকে শূআত সাং বা হোয়াত সাং রচিত বিবরণ থেকে তদানিন্তন ভারত সম্পর্কে মূল্যবান তথ্যাদি অবগত হওয়া যায়। দশম শতকে আল-বিরুনী প্রমুখ মুসলিমদের লেখায় ভারত সম্পর্কীয় বিবরণ প্রচারিত হতে শুরু করে। পরবর্তীকালে মুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন ফিরিশ্‌তা, আল-বালাযুরী, মাদউদী, মিনহাজুদ্দীন সিরাজ, হাসানুন

Dhaka University Institutional Repository

নিযামী, গুলাম হুসাইন সলীম, যিয়াউদ্দীন বারনী, ইব্ন বতুতা, আবদুল কাদির বদাউনী, আবুল-ফযল, খাকী খান, আবদুল হামিদ লাহোরী, দানিশমান্দ খান ও মুহাম্মদ কাসিক লাহোরী। ইউরোপীয়দের ভারতে আগমনের পর এবং বিশেষত ব্রিটিশ শাসন আমলে পাক-ভারত সম্পর্কে বহু ঐতিহাসিক তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়। ১৯৪৭ এর স্বাধীনতা লাভের পর ভারত ও পাকিস্থানের ঐতিহাসিকগণ এই অঞ্চলের ইতিহাসের পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেছেন। উভয় স্বাধীন দেশের নিজস্ব জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি এই নূতন ইতিহাস রচনাকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত করবে।[১৪]

ইতিহাস বিদ্যার কল্যাণ ও গুরুত্ব

ইতিহাস থেকেই মানুষ সমস্ত বিষয়ে নির্ভুল ও বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়। সর্বপরি দু'টি পরস্পর বিপরীত সংবাদ যার মধ্যে সম্বনয় সাধন সম্ভব হয় না, তার একটি-ই সত্য হতে পারে একসাথে দু'টিই নয়। সেক্ষেত্রে প্রকৃত সত্য সংবাদটি বাছাই করার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে সত্য, নির্ভুল ইতিহাস। যেমন- রাসূলে করীম (সঃ) এর ইন্তিকালের কয়েক বৎসর পর কেউ যদি দাবী করে যে, তাঁর সাক্ষাত ও তাঁর কথা শুনেছে, তাহলে সেই ব্যক্তির জন্মতারিখ ও মদীনায় অবস্থান বা উপস্থিতির সময়কাল নির্ধারণ করার মাধ্যমেই তার এই দাবীর সত্যাসত্য যাচাই করাও সে বিশেষ করে ইসলামের ইতিহাসে উক্তরূপ সমস্যা বরাবর দেখা দিয়েছে এবং কেবলমাত্র ইতিহাসের সাহায্যেই তার সমাধান সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে হাদীসের বর্ণনা ধারায় মূল বর্ণনাকারীর সহিত পরবর্তী বর্ণনাকারীর সাক্ষাত হয়েছে কিনা এবং তার এ বর্ণনা প্রত্যক্ষ যথার্থ কিনা, তা উভয়ের জীবনের ইতিহাস দ্বারাই হতে পারে। কোন বর্ণনাকারী সম্পর্কে যদি একথা সত্য হয় যে, তার জীবনের কোন এক সময় তার স্মৃতিশক্তি দূর্বল হয়ে পড়েছিল এবং হাদীসের বর্ণনা করতে গিয়ে একটির সহিত অপরটি মিশ্রিত করে বসত, তাহলে তার কোন্ বর্ণনাটি এই অবস্থার পূর্বের এবং কোন্টি এই অবস্থায় সময়ের তা নির্ধারণ করা তার বিস্তারিত জীবনালেখ্যের ভিত্তিতেই সম্ভব। কেননা উক্তরূপ অবস্থায় বর্ণিত কোন হাদীস মুহাদ্দিসীনের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে। এইরূপ সমস্যাও অত্যন্ত বাস্তব এবং ইতিহাস-ই এই সমস্যার সঠিক সমাধান দেয়। এই কারণে প্রখ্যাত তাবেঈ মুহাদ্দিস মনীষী সুফিয়ান সাওরী (রঃ) বলেছেনঃ " এই শ্রেণীর হাদীস বর্ণনাকারী যখন মনগড়াভাবে হাদীস বানিয়ে বর্ণনা করতে শুরু করল, তখন আমরা তাদের প্রতিরোধ করার জন্য ইতিহাসকে দাঁড় করে দিলাম।" বস্তুত ইসলামী ইতিহাসে মনগড়ভাবে মিথ্যামিথ্যি হাদীস বর্ণনার একটি অতিরিক্ত ফিত্না প্রচন্ডরূপে ধারণ করেছিল।

১১। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৮-১৯

Dhaka University Institutional Repository

আসমাউল রিজাল (اسماء الرجال) পর্যায়ের বর্ণনাকারীদের জীবনালেখ্যমূলক গ্রন্থাবলী দ্বারাই সেই ফিত্নাকে প্রতিরোধ করা এবং হাদীস যাঁচাই গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করা বাস্তবভাবেই সম্ভবপর হয়েছিল। ইতিহাসের এ অবদান কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না ; বরং জ্ঞান রাজ্যে এটি মুসলমানদের নযীরবিহীন কৃতিত্ব।

নবী-রাসূলগণের জীবন বৃত্তান্ত, তাদের দাওয়াত, আদর্শ প্রতিষ্ঠার জিহাদ ও ত্যাগ তিতিক্ষা, কষ্ট স্বীকার ইত্যাদি ইতিহাসে বিস্তারিত উল্লেখ থাকে। সেই সাথে তাঁদের উপদেশ-নসীহত ও লিপিবদ্ধ থাকে। দুনিয়ার সাধারণ মানুষের জন্য খুবই কল্যাণকর হয়ে থাকে।

অনুরুপভাবে অতীতকালের শাসন-প্রশাসন, নেতা ও রাষ্ট্রনায়ক, তাদের শাসন নীতি ও পদ্ধতি, সর্বোপরি শাসন, প্রশাসন- তথা রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থার সূচনা প্রশাসনিক উত্থান ও পতনের কারণসমূহ প্রভৃতি যেহেতু সামগ্রিকভাবে গোটা মানব জীবনের সহিত অত্যন্ত গভীরভাবে সম্পৃক্ত তাই এসব ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ পরিবর্তীকালের লোকদের পক্ষে শুধু কল্যাণকরই নয়, বিশেষভাবে জরুরীও। এই সব বিষয়ে যার ভাল ও নির্ভুল জ্ঞান থাকবে, তার হৃদয় সদাজাগ্রত ও সদা সক্রিয় থাকবে। অতীত থেকে ভবিষ্যতের চলার পথে বহু প্রকারের কল্যাণময় জ্ঞান আহরণ করা এবং নিজ জীবনের গতিকে নির্ভুলভাবে গতিশীল বানানো সম্ভব এই ইতিহাসের সাহায্যে।[১৫] কুরআন মজীদের সূরা ফাতিহার শেষ তিন আয়াতে ইরশাদ হচ্ছেঃ

اهدنا الصراد المستقيم ـ صراط الذين انعمت عليهم غيرالمغضوب عليهم والضالين ـ الفاتحة.

"আমাদেরকে সঠিক দৃঢ়-ঋজু পথ দেখাও, সেই লোকদের পথ, যাদের তুমি পুরুস্কৃত করেছ, যারা গযবপ্রাপ্ত নয়, যারা পথ ভ্রষ্টও নয়।"[১৬] এ আয়াত ৩টিতে তিনটি আলাদা আলাদা জনগোষ্ঠির উল্লেখ রয়েছেঃ

১) আল্লাহ্র নিয়ামত প্রাপ্ত লোক।(তারা নবী, ছিদ্দিক, শহীদ ও সালিহ)

২) যারা আল্লাহ্র নিকট থেকে গযবপ্রাপ্ত এবং

৩) যারা গুমরাহ- পথভ্রষ্ট।

১৫। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২১

১৬। اياك نعبد واياك نستعين ـ اهدنا الصراط المستقيم ـ صراط الذين انعمت عليهم . غيرالمغضوب عليهم .

আল-কুরআন, ১ : ৪-৭

Dhaka University Institutional Repository

তিন শ্রেণীর লোক মূলত অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এদের প্রত্যেকের সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত না থাকলে সিরাতুল মুস্তাকীমের পথে চলা বা সে পথের সন্ধান পাওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। আর এই সন্ধান অতীতের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস থেকে পাওয়া যেতে পারে। অন্যথায় আয়াত ক'টির গভীর ও বিস্তারিত তাৎপর্য অনুধাবনও সম্ভব নয়। এ থেকে প্রকৃত ও সত্য ভিত্তিক ইতিহাসের গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ ইব্ন ইয়াকুব আল জানাদী তাঁর লিখিত ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকায় এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেনঃ " আল্লাহ্ তা'আলা তাওরাত কিতাবে অন্যান্য সব বিষয় ছাড়াও একটি অধ্যায় এমন নাযিল করেছেন, যাতে অতীত হয়ে যাওয়া উম্মাত সমূহের বিস্তারিত অবস্থা এবং তাদের সময় কালের মেয়াদ বিধৃত। শুধু তাই নয়, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশেষ যে কালাম সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রূপে নাযিল করেছেন অর্থাৎ কুরআন মজীদ, তাতেও অতীত কালের বহু উম্মাহর যেমন নূহ, হুদ, মারইয়াম এবং আদ ও সামুদের, কিংবা মূসা-হারুন, ফির'আউন ও কারুন, আসহাফে কাহফ ও আর-রাকীম, আর তারও পূর্বের নামরুদ ও ইব্রাহীম (আঃ) সংক্রান্ত বাস্তব ঘটনাবলী উদ্ধৃত করেছেন।[১৭]

এ পর্যায়ে তিনি নিজেই এরশাদ করেছেন ঃ

وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين - هود -

"আর (হে মুহাম্মদ) নবী- রাসূলগণের এইসব কাহিনী যা আমরা তোমাকে শুনাচ্ছি তা এমন সব বিষয় যা দ্বারা আমরা তোমার হৃদয়কে দৃঢ় ও মজবুত প্রত্যয় পূর্ণ করেছি। এতে তুমি মহাসত্যের জ্ঞান লাভ করলে। আর ঈমানদার লোকেরা মূল্যবান নসীহত ও স্মরণ পেয়ে গেলে।"[১৮]

এ আয়াত অনুযায়ী অতীত কালের নবী রাসূলগণের যে কিসসা-কাহিনী কুরআন মজীদে বিবৃত হয়েছে, তার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য খোদনবী করীম (সঃ) এর হৃদয়কে দৃঢ় প্রত্যয় পূর্ণ স্থিতিশীল ও প্রশান্ত বানান। আর পরবর্তী লক্ষ্য ঈমানদার লোকদেরকে মহাসত্যের জ্ঞানদান, উপদেশ-নসীহত এবং অতীতের ঘটনাবলীর স্মরণ বস্তুত, সাধারণ মানুষের জন্য তা এ অমূল্য সম্পদ। এই সম্পদ লাভ করার মাধ্যম হচ্ছে ইতিহাস।

১৭। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

১৮। আল-কুরআন, ১১ : ১২০

Dhaka University Institutional Repository

"ইতিহাস থেকে যদি এতটুকু জ্ঞানও লোকেরা লাভ করে যে, সময়-কাল কখনই একই অবস্থায় স্থিতিশীল থাকে না, পরিবর্তন ও বিবর্তন ও দল বদলই তার স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় প্রকৃতি, তা হলে তা-ই যথেষ্ট ছিল।"[১৯]

কালের আবর্তন, বিবর্তন ও পরিবর্তনের কথা কেবলমাত্র ইতিহাস পাঠের মাধ্যমেই জানা যেতে পারে। মানুষ স্বভাবতই দুনিয়ায় স্থায়ী থাকার অভিলাষী। জীবন্ত লোকদের মধ্যে জীবিত থাকাই চিরন্তন কামনা ও বাসনা। গতকাল যা দেখা গেছে, শোনা গেছে এবং দূর অতীতের যেসব ঘটনা ও সংশ্লিষ্ট লোকদের কাহিনী যা আমরা ইতিহাসে পাঠ করি এই দুয়ের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য অনুভূত হয় না। ইতিহাসের গ্রন্থ পাঠে স্পষ্ট মনে হয়। আমরা যেন তাদের সময়ে জীবিত ছিলাম। যেন এখনও তাদের সঙ্গে রয়েছি। নানা জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধানে ইতিহাস শানিত দরবারীর মত কাজ করে। দৃষ্টান্ত স্বরুপ একটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করা যাচ্ছে। নবী করীম (সঃ)-এর ইন্তিকালের পর খাইবরের ইয়াহুদীরা দাবী করতে শুরু করে যে, রাসূল কারীম (সঃ) তাদের উপর জিযিয়া ধার্য না করার সিদ্ধান্ত করেছিলেন এবং জিযিয়া আদায় করা থেকে তাদেরকে তিনি নিস্কৃতি দিয়ে ছিলেন। অতএব, তাদের উপর যে জিযিয়া ধার্য করা হচ্ছে তা প্রত্যাহার করা হোক। তারা এ দাবী করে যে, তাদের উপর জিযিয়া ধার্য না করার যে চুক্তি হয়েছিল তার দলিল-দস্তাবেজও তাদের রয়েছে। এই নিয়ে তারা দারুন বিতর্কের সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত তা তাদের দাবীর সমর্থনে কথিত সেই দলিলটিও পেশ করে। কিন্তু সে দলিলটি খুঁটিয়ে দেখার পর স্পষ্ট হলো যে, তার উপর হযরত সা'দ ইব্ন মু'আয (রাঃ) এর সাক্ষ্য রয়েছে। অথচ তিনি খায়বর বিজয়ের পূর্বেই ইন্তিকাল করেছেন। কাজেই কথিত সময়ে কোন দলিল লিখিত ও স্বাক্ষরিত হলেও তাতে তাঁর স্বাক্ষর থাকতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, সে দলিল হযরত মু'আবিয়া ইব্ন আবু সুফিয়ানেরও স্বাক্ষর দেখা যায়। অথচ তিনি খায়বর বিজয়ের অনেক পর মক্কা বিজয়কালে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তখন পর্যন্ত অমুসলিম বিজিতদের উপর জিযিয়া বিধিবদ্ধই হয়নি। মূলত তা বিধিবদ্ধ হয় খায়বর বিজয়ের অনেক পর। তাই ঐতিহাসিক অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতেই ইয়াহুদীদের পেশ করা দলিল জাল প্রমাণিত হয়ে যায়।[২০]

১৯। আল জামাল আবুল হাসান আলী ইব্ন আবুল মনসুর ইব্ন হুসাইন আল-আজদী (রহঃ), *আল-ইখতেবারুল আওয়ালুল ইসলামিয়্যাহ,* মিশরঃ দারুল কলম,তা.বি. পৃ. ২০৬

২০। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত,পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে ইতিহাসের মাধ্যমে মানুষ চিরন্তনের কামনা ও বাসনা চরিতার্থ করতে পারে। ইতিহাস বিদ্যার উচ্চতর মর্যাদা সর্বজন স্বীকৃত। কালের ঘটনাবলী, অতীত জনগণের জীবন কাহিনী, সে লোকদের মৃত্যুর পর তাদের সংক্রান্ত ঘটনা ও কীর্তি কলাপের সংবাদ জাগরিত থাকে, তা ইতিহাস পাঠেই জানা যেতে পারে। যারা নসীহত গ্রহণ করতে প্রস্তুত, তারা তা থেকেই অতি বড় মূল্যবান উপদেশও লাভ করতে পারে। আর যারা চিন্তা গবেষণায় অভ্যস্ত তারা সে বিষয়ে গবেষণা ও চিন্তা-বিবেচনা যাচাই পরখ চালিয়ে জাতীয় উত্থান ও পতনের মূলতত্ত্ব উদ্ধার করতে পারেন। ইতিহাস ও তার আওতাভূক্ত তথ্য বিরাট কীর্তি-কলাপের দিকে পথ নির্দেশ করে। মানুষের উত্তম চরিত্র ও কার্যাবলী করার অনুপ্রেরণা দেয়। খারাপ ও ক্ষতিকর কার্যাবলী থেকে মানুষকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে।

এসব কারণে ইতিহাস গ্রন্থ প্রনয়ণ ও ইতিহাস অধ্যয়নের উপর ইসলাম খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছে। আর এই ইসলামী সমাজ শুরু থেকেই ইতিহাস সংরক্ষণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য দিয়েছে। ইতিহাসকে বিশ্বাসযোগ্য, নির্ভরযোগ্য, সন্দেহমুক্ত এবং সর্বতোভাবে নির্ভুল করার জন্য বিশেষ তাকীদ দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে মিথ্যা বর্ণনা ও অনির্ভরযোগ্য সূত্রলব্ধ তথ্য অগ্রাহ্য করে চলতে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে। ফলে মুসলিম সমাজ ও জনতা ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়নে যে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, দুনিয়ার অপর কোন সমাজ বা জনতা সে তুলনায় কিছুই করেনি।[২১]

ইব্‌ন খালদুনের দৃষ্টিতে ইতিহাস

ইব্‌ন খালদুনের মতে, ইতিহাস সে সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত যা সব জাতির লোকেরই সাধারণভাবে পড়ে ও পড়ায় এবং সে জন্য দূর দেশের বন্ধুর ও বিপদ সংকুল পথের পরিভ্রমণ করে। সাধারণ ও মূর্খ লোকেরাও সে বিষয়ে অবহিত লাভের জন্য আগ্রহী হয় এবং সর্বকালের রাজা-বাদশাহ শাসক ও বড় বড় বিদ্যান ব্যক্তিরাও সে জন্য অপরিসীম আগ্রহ উৎসাহ ও আন্ত রিক কৌতুহলবোধ করেন। সকলের জন্যই তাতে সুরুচীর পরিতৃপ্তি সামগ্রি থাকে। কেননা, ইতিহাস একদিকে যদিও বাহ্যত শুধু অতীত দিনগুলো এবং বিলিন হয়ে যাওয়া রাজ্য সাম্রাজ্যের অবস্থা আমাদের সামনে উপস্থাপিত করে। কালের পরিবর্তনশীল ধারাবাহিকতায় বিশ্ব সৃষ্টিকুল যে বিপ্লব ও প্রতি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে গেছে, রাষ্ট্র ও সমাজসমূহ সেভাবে বিস্তৃতি ও অগ্রগতি লাভ করেছে শেষ পর্যন্ত নিঃশেষ ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তাও তেমন স্পষ্ট করে তোলে, তেমনি ইতিহাসের অভ্যন্তরে একটি গভীর সূক্ষ্মদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে থাকে।

২১। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব লোকের অন্তর্নিহিত কার্যকরণ এবং তার মূলে সদাকার্যকর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মৌলনীতিও আমাদেরকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়।

ইব্ন খালদুন লিখেছেন, ইতিহাস এক অতীত উঁচুমানের জ্ঞান বিভাগ। তার কল্যাণ বিলুপ্ত অত্যন্ত শুভফল উৎপাদক। প্রাচীন জাতি ও জনগোষ্ঠি সমূহের নৈতিক অবস্থায় নবী-রাসূলগণের জীবনালেক্ষ্য, শাসক-প্রশাসকদের প্রশাসন ব্যবস্থা এবং তাদের রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে ইতিহাস। যে কেউ বৈষয়িক ব্যাপারাদিতে অতীত লোকদের পদাংক অনুসরণ করবে, সে অবশ্যই কল্যাণময় ভাগ্যের অধিকারী হবে।[২২]

এজন্য বহুসংখ্যক জ্ঞান-সূত্রের সন্ধান করা বিভিন্ন জ্ঞান তত্ত্ব জ্ঞানের সহিত পরিচিত লাভ করা, নির্ভূল চিন্তা ও গভীর সূক্ষ্ম দৃষ্টির অধিকারী হওয়াই ইতিহাস লেখকের জন্য একান্তই জরুরী, যেন তার লিখিত ইতিহাস থেকে নির্ভূল সত্য পথের সন্ধান লাভ করা পাঠকের পক্ষে সম্ভব হয় এবং অতীত ভুল-ভ্রান্তি ও পদস্খলন সাথে সম্মুখের দিকে চলতে পারে।

বস্তুতঃ ইতিহাস যদিও শুধু পুরাতন কাহিনীর পুনরুদ্ধৃতিই করা হয়, তৎলব্ধ মৌলনীতি রাজনৈতিক বিধি-বিধান, সমাজ সভ্যতার প্রকৃতি ও মানব সমাজের উত্থান-পতনের উপর গভীর দৃষ্টি রাখা হয়, অনুপস্থিত ও অবর্তনমানকে ভিত্তি করে উপস্থিত ও বর্তমানকে নির্মাণ করার কৌশল জানা না যায়, তাহলে ভুল-ভ্রান্তি পদস্থলন ও সভ্যপথ হারানোর আশংকা থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় থাকে না। আর তা হলে ইতিহাসে বিচরণ ও অধ্যয়ন সম্পূর্ণ নিস্ফল হয়ে যাওয়া অবধারিত।[২৩]

ইব্ন খালদুন তাঁর গ্রন্থের ভূমিকা অংশে প্রাচীন ঐতিহাসিকদের নিজ নিজ গ্রন্থে উল্লেখিত বহু সংখ্যক কাহিনীর উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন না করার দরুন তাঁরা এই সব ভিত্তিহীন কাহিনীকে নিজেদের গ্রন্থে ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা কাহিনীকে নিজেদের গ্রন্থে ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। অথচ একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিবেচনা করলেই তাঁরা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারতেন যে, এগুলো নিছক কাহিনী, এগুলোর কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। তিনি লিখেছেন, বিশ্ববাসী জাতি ও জনগোষ্ঠিসমূহের আদালত অভ্যাস, অবস্থা ও ধর্মপালন চিরকাল এক ও অভিন্ন এবং অপরিবর্তিত ধারায় চলে না। বরং দিন ও কালের স্রোতের সাথে সাথে এই সবই এক অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে পরিবর্তিত হতে থাকে। মানুষ ও জনবসতি সমূহও একই অবস্থায় অবিচল থাকে না, যেমন, ভূ-পৃষ্ঠ, সময়-কাল ও রাজ্য- সাম্রাজ্যের কোন স্থিতি নেই। এটাই মহান আল্লাহ্‌র নিয়ম।

২২। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

২৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

এই পরিবর্তনের বড় কারণ হচ্ছে, প্রত্যেক সমাজ ও জনগোষ্ঠিই কম-বেশী শাসক-প্রশাসক দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাদের অনুসরণ করে চলতে বাধ্য হয় ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক তাতে বিজ্ঞান সম্মত কথাটির যথার্থ প্রমাণিত হয় ঃ الناس على دين ملوكهم "জনগণ তাদের শাসক-প্রশাকদের রীতিনীতি সাধারণভাবে মেনে চলে"। "ফলে পরবর্তী ও পূর্ববর্তীদের আদত-অভ্যাসের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ বাঁধে। জনগণ পূর্ববর্তী শাসকদের কিছু কিছু অভ্যাস ও নবতর শাসকদের কিছু কিছু অভ্যাস গ্রহণ করে। অথচ নিজেদের জাতীয় চরিত্রও পূর্ণমাত্রায় পরিত্যাগ করতে পারে না। ফলে এই সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে। মোট কথা জনগোষ্ঠী সমূহ নিজেদের শাসন-পদ্ধতির পরিবর্তনের সাথে সাথে আদত-অভ্যাস ও অবস্থা সমূহের মধ্যে পরিবর্তন হতে থাকে। ইতিহাস যদিও একটা বিশেষ সময় কাল কিংবা একটি বিশেষ জাতি সত্তার অবস্থা লিপিবদ্ধ করণের নাম, কিন্তু সেই সাথে বিশ্ব জাতিসমূহ প্রাচীনকালের সাধারণ অবস্থা বর্ণনা করাও ঐতিহাসিকদের জন্য অনিবার্য। মূলত মানব সমাজ ও সমষ্টির সহিত অবস্থা সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়াই ইতিহাসের কাজ।"[২৪]

ইব্ন খালদুন তাঁর ইতিহাস দর্শন আলোচনায় মানুষকে অন্যান্য সৃষ্টিসমূহ থেকে এক বিশিষ্ট সৃষ্টিরূপে দেখেছেন। মানুষ তার জ্ঞান-বুদ্ধি, উদ্ভাবনী শক্তি, শিল্প প্রতিষ্ঠার দরুন একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। দুনিয়ার অন্যান্য জীব বা প্রাণীর মধ্যে এই গুণের কোন অস্তিত্ব নেই। দ্বিতীয়ত, মানুষ সমাজলব্ধ হয়ে কোন প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে বাস করতে হয়। মৌমাছি ও অন্যান্য পোকা-মাকড়ের মধ্যে এই ধরনের প্রশাসনিক অবস্থা থাকলে তা সে সবের ক্ষেত্রে সহজাত। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তা চিন্তা ও তত্ত্বগত যা মানুষকে উদ্ভাবন চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাতে বাধ্য হয়। সে জন্য উপায় উপকরণও তাকে সংগ্রহ করতে হয়। চতুর্থত, মানুষকে গোষ্ঠি বদ্ধ হয়ে জীবন-যাপন করতে হয়। সে জন্য তারা শহর, নগর ও বসতি গড়ে তোলে, যেখানে তারা একত্রে বসবাস করে। স্বজাতীয়, স্বমতের, স্বরুচির লোকদের সহিত পারস্পারিক গভীর সম্পর্ক ও প্রেম প্রীতি গড়ে উঠে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে। ফলে মানুষ বসতির দিক দিয়ে দুটি পর্যায়ে অবস্থান করে একটি শহর ও নগরবাসী আর অপরটি গ্রামবাসী। মানুষের এ অবস্থার মৌল কারণ হল মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই সামাজিক, সমাজবদ্ধ হওয়া ছাড়া মানুষের জীবন-সম্ভব নয়, মহান আল্লাহ্ মানুষকে জন্মগত ও সৃষ্টিগতভাবেই খাদ্য সংগ্রহের উপর একান্ত ভাবে নির্ভরশীল বানিয়েছেন, স্বীয় খাদ্য সংগ্রহ বা উৎপাদনের ক্ষমতা ও যোগ্যতা মহান আল্লাহ্ তাদের মধ্যে গচ্ছিত রেখেছেন। কিন্তু কোন মানুষ একান্ত একাকী স্বীয় জীবন উপকরণ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় না। সেজন্য সে বহু মানুষের কর্মের ও শ্রমের সহযোগিতায় ও অনুকূল্য গ্রহণ করতে বাধ্য। [২৫]

২৪। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

২৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ নিজের সত্ত্বাকে বাঁচাবার জন্য গোষ্ঠীর অন্য লোকদের সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মুখাপেক্ষী। এই উভয় দিক দিয়েই ব্যক্তি সত্ত্বার সংরক্ষণ ও গোষ্ঠী সত্ত্বার সংরক্ষণ, সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে বাধ্য। এই সমাজের জন্য একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থাও অনিবার্য। সেই প্রশাসনিক কর্তৃক ধারণ ও পরিচালনের জন্য একটি সার্বভৌমত্ব এবং তার ধারকের প্রয়োজন যা পরস্পরের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বহাল রাখবে। যুলুম ও সীমালংঘন থেকে পরস্পরকে প্রতিরোধ করবে, পূর্ণমাত্রার নিরপেক্ষতা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করবে।

এই মানুষের সামাজিক হেদায়েতের জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাদের নিকট ওহী ও কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে তাদের জন্য জীবন যাপন পদ্ধতিও বিধান অবতীর্ণ করেছেন, যেন তা অনুসরণ করে মানুষ ইহকালীন সমস্ত ভ্রষ্টতা ও পদস্খলন থেকে বাঁচতে পারে, রক্ষা করতে পারে নিজেকে পরকালীন শাস্তি থেকে।[২৬]

তিনি বলেছেন, দেশ ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা মানুষের এক স্বাভাবিক দাবী মানুষের সমাজ সমষ্টির জন্য একান্তই অপরিহার্য। সেই সাথেই এ কথাও সত্য যে, মানুষ স্বভাবত ও প্রকৃতগত ভাবেই Evil, Wickedness, bad temper ইত্যাদির তুলনায় কল্যাণ ও মঙ্গল, পবিত্রতা, benebolence ইত্যাদির অধিক নিকটবর্তী। এ কারণে কল্যাণ ও মঙ্গল স্বভাব-চরিত্র, রীতিনীতি ও আচার আচরণ দেশ ও রাষ্ট্রের জন্য শোভন। তাই রাষ্ট্র পরিচালকদের উত্তম পবিত্র চরিত্রের অভাব ও ত্রুটি একটি রাষ্ট্রেরই ত্রুটি ও বিচ্যুতি হয়ে দেখা দেয় স্বাভাবিক ভাবে। তাছাড়া দেশ রাষ্ট্র ও রাজনীতির লক্ষ্য আল্লাহর সৃষ্টিকুলের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা প্রদান এবং সে জন্য আল্লাহ্র খিলাফতের বাস্তব রূপায়ন যেন আল্লাহ্র বিধান বান্দাগণের উপর দ্যবী ও কার্যকর করা যায়। আল্লাহ্র এই বিধানই সার্বিক কল্যাণের বাহন।

মানবীয় আইন-বিধান মুর্খতা ও শয়তানী ওয়াস্ওসা প্রসূত। তাই মানুষের কল্যাণ বিধানে তা সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। বৈষয়িক জীবন সমষ্টির উন্নতির মূলে এই তত্ত্বই নিহিত। তাই মহান আল্লাহ যখন কোন জনগোষ্ঠিকে স্বাধীন দেশ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা দান করেন তখন তার পূর্বেই তার নৈতিক অবস্থার সংস্কার ও সংশোধন করেন। তারপর তাকে এই নিয়ামত দান করেন। পক্ষান্তরে যে জাতি সমষ্টি পরাধীনতার শৃঙ্খলে বন্ধী যে জনগোষ্ঠী অতি দ্রুত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়।

তিনি লিখেছেন, কোন জনগোষ্ঠী যখন রাষ্ট্র ও প্রশাসন ক্ষমতা লাভ করে তখন এমন একটি সময় অবশ্যই এসে পড়ে তা স্বাভাবিক ভাবেই বিলাসী ও জাক-জমকপূর্ণ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আর এই বিলাসীতা সংশ্লিষ্ট লোকদের মধ্যে অলসতা, অর্কমন্যতা ও শ্রমবিমূখতার সৃষ্টি করে। ফলে জনগোষ্ঠী পতন ও ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। তার যৌবন সহসাই বার্ধক্যের নূজতার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

২৬। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

তিনি এও বলেছেন, মানুষের ন্যায় রাষ্ট্র সাম্রাজ্যের একটি স্বাভাবিক বয়সসীমা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। অবশ্য এই স্বাভাবিক বয়সসীমা স্বাভাবিক কারণেই হ্রাস বৃদ্ধিও পেয়ে থাকে। ইব্ন খালদুনের মতে, বেদুঈনত্ব ও নাগরিত্ব রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দুটি স্বভাবগত অবস্থার রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সূচনা হয় বেদুঈনত্ব থেকে। পরে স্বচলতা ও উপায় উপকরণের প্রাচুয্যের দ্বারা উন্মুক্ত হওয়ার দরুন নাগরিকত্ব অর্জিত হয়।[২৭]

ইব্ন খালদুন রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে দু'ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন, যে, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব যদি কোন মানুষের হয় এবং সমাজের বিদ্বান-বুদ্ধিমান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই রাষ্ট্রীয় আইন-বিধান রচনা করেন, তাহলে তা হবে মানবীয় বিবেক বুদ্ধি ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা। আর তা যদি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে কোন নবী বা রাসূলের মাধ্যমে মানুষের হস্তগত হয় এবং সেই অনুযায়ী রাষ্ট্র চলে, তাহলে তা হবে দ্বীন ভিত্তিক রাষ্ট্র। এই দ্বীনী রাষ্ট্রই মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের বাহন হয়ে থাকে। নিছক বৈষয়িক রাষ্ট্র মানুষের জীবন লক্ষ্য হতে পারে না। তা মৌলিক ভাবেই নিষ্ফল, অর্থহীন ও ব্যর্থ। দ্বীন-ই মানুষের মৌলিক জীবন লক্ষ্য, তা-ই মানুষের পরকালীন সৌভাগ্য ও চিরন্তন সুখের নিয়ামক ও ব্যবস্থাপক। আল্লাহ্‌র নিকট থেকে যত শরী'আত নাযিল হয়েছে, তাতে শুধু এবাদতের ব্যবস্থাই নয়। জনগণের পারস্পরিক কাজ-কর্ম ও লেনদেন থেকে শুরু করে রাষ্ট্র ব্যবস্থা তাই মানুষের সমষ্টিক জীবনের জন্য স্বভাব সম্মত ব্যবস্থা। একেই বলা হয় খিলাফত বা ইমামত। খলীফা বা ইমাম নিয়োগ বা নির্ধারণ অবশ্য কর্তব্য কাজ। রাসূলে কারীম (সঃ) যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁর ইন্তেকালের পর সেই রাষ্ট্রই দ্বীনী খিলাফতে পরিণত হল। উত্তর কালে এই খিলাফত-ই ব্যক্তিগত শাসনে তথা বংশীয় রাজতন্ত্রে রুপান্তর হয়ে গিয়েছিল। বস্তুত রাষ্ট্র ক্ষমতা যখন এক ব্যক্তির কুক্ষিগত হয়ে পড়ে এবং তা আল্লাহ্‌র দ্বীন কায়েমের কাজে নিযুক্ত না হয়ে ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব ও ইচ্ছা বাসনা চরিতার্থ করার কাজে নিয়োজিত হয়, তখন তা এক রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার রাষ্ট্র। উমাইয়া বংশের শাসকগণ যদ্দিন আল্লাহ্‌র দেওয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনা করেছেন এবং সকল অন্যায় ও যুলুম থেকে দূরে রয়েছেন, ততদিন তাঁদের অবস্থা ভালই ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের বংশধররা যখন বিলাসিতায় নিমজ্জিত হয়েছে, আল্লাহ্‌র নাফরমানীর কাজে লিপ্ত হয়েছে, তখনই তাদের পতন আসন্ন হয়ে পড়েছে। আব্বাসীয় বংশের শাসন ও অনুরুপ কারণে বিপর্যস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আর তাই-ই হচ্ছে ইতিহাসের শিক্ষা।[২৮]

২৭। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

২৮। 'আল্লামা ইব্ন খালদুন, *কিতাবুল 'ইবির ওয়াদ দেওয়ানুল মুবতাদা ওয়াল খবর ফী আইয়ামেল 'আরবে ওয়াল 'আজম ওয়াল বারার ওয়া মিন 'আছরেহিমমিন দুনিল মুলতানিল আকবর,* মিশরঃ দারুল কলম, তা.বি. পৃ. ৭০২

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাস প্রণয়নে মুসলমানদের অবদান

দ্বীন ইসলাম ও মুসলিম সমাজের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে যে সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্ভাবন করেছে, "ইতিহাস" তন্মধ্যে অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামে রাসূলে (সঃ) এর কথা ও কাজ এবং সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-এর অনুসৃত আদর্শ ও রীতিনীতির যে আইনগত গুরুত্ব দৃষ্টান্তমূলক মর্যাদা, দুনিয়ার অপর কোন ধর্ম ও সমাজে তার চিহ্নও খুঁজে পাওয়ার যাবে না। বর্তমানের জন্য অতীতের শুধু গুরুত্বই নয়, পরম পবিত্রতার এবং শরী'আত ও সমাজের ধারাবাহিকতা ও ক্রমবিবর্তনের যে রূপ প্রথম দিকেই মুসলমানদের মানসপটে সৃষ্ট ও মুদ্রিত হয়েছিল, তা তাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনা-দুর্ঘটনা সমূহ জীবন চরিত্র ও জীবন-কাহিনী এবং কথা ও আচরিত রীতি-নীতিকে সংরক্ষিত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্ববোধ সহকারে উদ্বুদ্ধ করে। এই কারণে তারা চিন্তা করতে বাধ্য হয়ে যে, অতীত সম্পর্কে জ্ঞান লাভের মাধ্যম হচ্ছে সংবাদ দান। আর সংবাদের গাম্ভীর্যপূর্ণ মর্যাদা বর্ণনা পদ্ধতি দ্বারা নির্ধারিত হয়। যেমনঃ কোন প্রত্যক্ষদর্শী ঘটনার সংবাদ দিল। আর সংবাদটি জানা-শোনা ও পরীক্ষিত বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌছল,

বস্তুতঃ যে ঘটনা আমাদের সম্মূখে বা আমাদের উপস্থিতিতে সংঘটিত হয়নি সে সম্পর্কে অন্যান্য লোকদের প্রত্যক্ষদর্শী রুপে বর্ণনা দান এবং তাদের সততা, বিশ্বস্ততা ও সংবাদ সংরক্ষণ যোগ্যতার উপয় নির্ভর করা ছাড়া বিশ্বাসযোগ্য অপর কোন উপায় বিবেক-বুদ্ধির নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হতে পারে না।

মানুষ সামাজিক জীবনের নিত্যকার ব্যাপারাদিতে সাধারণ ও স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বাস্য সাক্ষ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করে থাকে, তা-ই করে এসেছে আবহমান কাল থেকে। কিন্তু সাক্ষ্য প্রকৃতরুপে সংরক্ষিত থাকার ব্যাপারে সুক্ষাতিসূক্ষ্ম যাচাই ও পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর মাধ্যমে ইতিহাস রচনায় মুসলমানদের অবদান মানবতার ইতিহাসে বেনযীর তুলনাহীন।

মোটকথা মুসলামানদের একান্ত নিজস্ব দ্বীনী সংস্কৃতি জাতীয় মেজাজ প্রকৃতি ও স্বভাবগত বিবেক-বুদ্ধি ও মেধা স্মৃতিশক্তির সামগ্রিক দাবী পূরণের জন্য তারা তাদের বর্ণনা পরম্পর ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ সহকারে প্রাপ্ত সংবাদাদি সংগ্রহ ও একত্রিত সুবিন্যস্ত করতে শুরু করেন। প্রত্যেকটি সংবাদের সাথে এই সনদ বর্ণনা পরম্পর ধারাবাহিকতা স্বতন্ত্রভাবে অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হিসাবে সংরক্ষিত হয়েছে।

বস্তুতঃ সনদসহ সংবাদের এই প্রক্রিয়া সর্ব সম্মতভাবে ইসলামী বুদ্ধি-বৃদ্ধির এক নযীরবিহীন অবদান। ইসলামের পূর্বে না আরবদের মধ্যে এই পদ্ধতির কোন প্রচলন ছিল, না প্রতিবেশী সভ্যতার আলোক মন্ডিত ? জাতিসমূহে এর কোন ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আরব গোত্র সমূহের পারস্পারিক যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কিত বর্ণনা প্রত্যেক গোত্রের নিজস্ব হত।

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনাবলীকে গৌরব অহংকারের ভাবধারায় ভরপুর ও নিজস্ব রক্তে রক্তীম করে পেশ হত। সে বর্ণনার উৎস ও সূত্রের কোন উল্লেখ থাকত না। সে সব বর্ণনার সত্যতা যথার্থতা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় যাচাই পরীক্ষা করার কোন চিন্তা বা প্রয়োজনবোধও কারুর ছিল না এবং তারও স্থিতি অর্জন প্রচেষ্টায় রক্তকে উত্তপ্ত করাই ছিল তাদের একমাত্র কাজ ও প্রতি মুহূর্তের ব্যস্ততা। ইয়ামেন ক্রমাগত কয়েক শতাব্দিকাল ধরে ব্যবসায় বাণিজ্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ছিল। কিন্তু তথায় কোন ঐতিহাসিক বর্ণনার সন্ধান পাওয়া যায় না, এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার।

ইরান ও গ্রীসে লেখনীর মাধ্যমে ইতিহাস সংরক্ষণের প্রচলন ছিল। কিন্তু সনদ সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা কিংবা চেষ্টা ছিল না। এ দু'টি দেশের কোন একটিতেও ইতিহাস সভ্য বাস্তবতার ও নির্ভরযোগ্য সনদ সূত্রের উপর ভিত্তিশীল ছিল না। বরং উভয় দেশের ইতিহাসই কিংবদন্তী উপকথা, রূপকথা, পৌরানিক কিস্‌সা কাহিনী ও সর্ব প্রকারের কাল্পনিক ও মনগড়া কথাবার্তা ছিল ভারাক্রান্ত।

"সনদ ভিত্তিক সংবাদ" সংবাদ প্রক্রিয়াকে মুসলমানগণ দ্বীন ও শরী'আতের কারণে সর্ব প্রথম হাদীসের জন্য ব্যবহার করেন, দ্বীনের দিক দিয়ে কুরআনের পরপরই এবং সঙ্গে সঙ্গেই গুরুত্বপূর্ণ মৌল উৎস হচ্ছে হাদীস। তাই হাদীস বর্ণনা ও গ্রহণের ক্ষেত্রে শরী'আতে গ্রহণযোগ্যমানকে পুরাদস্তর প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। এই মানকে কার্যকর করার লক্ষ্যে আনুমানিক কতিপয় বিদ্যার উদ্ভাবন অনিবার্য হয়ে পড়ে। ইতিহাস ও "আস-মাউল রিজাল" নামে বর্ণনাকারীগণের নির্ভরযোগ্য জীবনালেখ্য রচনার প্রয়োজন এই কারণে তীব্রভাবে অনুভূত হয়। বর্ণনাকারীদের সঠিক অবস্থার পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকলে সনদ অর্থহীন হয়ে যায়। আর তাদের সম্পর্কে জ্ঞান অসম্পূর্ণ হয়ে যায়। আর তাদের সম্পর্কে জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও প্রয়োজন পুরণে সক্ষম হয়ে থাকবে। যদি তাদের সমকালীন সমস্ত অবস্থা সঠিকভাবে চোখের সম্মুখে ভাস্বর হয়ে না থাকে।

হাদীস ও ইতিহাসের পারস্পরিক আংগিক সম্পর্কের কারণে ইতিহাসের পক্ষে হাদীসের অবয়ব ও রূপ ধারণ করা ছিল খুবই স্বাভাবিক। ফলে ইতিহাসও সনদসহ সংবাদ হয়ে দাড়ায়। সংবাদের সুপ্ত সংগ্রীহিত হওয়ার পর সে সবের প্রণয়ন একটি নীতির উপর ভিত্তি করে বিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ করণের সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যার যত সমাধানই সম্ভাব্য ছিল মুসলমানগণ সে বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা চালিয়েছেন এবং যে সমাধানকেই কল্যাণকর পেয়েছেন সেটিকেই এই সীমার মধ্যে ব্যবহার ও চালু করেছেন। তাই বিশুদ্ধতা ও বিশ্বস্ততার বিচারে মুসলমানদের লিখিত ইতিহাস পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ হয়েছে।[২৯]

২৯। ইব্‌ন খালদুন, *মুকাদ্দমা*, মিশর: দারুল কলম, তা.বি, পৃ.৮০৯

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাসের বিকাশ

ইতিহাস বলতে সাধারণভাবে জাতিসমূহের সাধারণ ঘটনাবলী বর্ণনা করা, বংশনানুক্রমে সেই ঘটনাবলী সুবিন্যস্ত করা, তারিখ অনুযায়ী ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা দান বুঝায়। আরবী ভাষায় ইতিহাসের প্রতি শব্দ "তারীখ" যেমন تاريخ الطبرى 'তাবারী লিখিত ইতিহাস'। تاريخ بغداد 'বাগদাদের ইতিহাস' "تاريخ مكة 'মক্কার ইতিহাস', প্রভৃতিভাবে এই শব্দের ব্যবহার রয়েছে।

ইসলামে ইতিহাস বিন্যস্তকরণ বিদ্যা পর্যায়ে বংসানুক্রমিক ঘটনাবলী বিন্যস্তকরণ এবং জীবন ও কাহিনী উভয়ই ইতিহাসের পর্যায়ে গণ্য।[৩০]

মুসলিম সমাজে ইতিহাস রচনার বিকাশকে নিম্নোক্ত চারটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়।

১। প্রথম ইতিহাস রচনাকাল থেকে তৃতীয় হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত।

২। তৃতীয় হিজরী শতাব্দী থেকে ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত।

৩। ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দী শেষ থেকে দশম শতাব্দী সূচনাকাল পর্যন্ত।

৪। দশম হিজরী শতাব্দীর শেষ থেকে এয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত।[৩১]

ক) আরবী ভাষায় ইতিহাস রচনার সূচনা কিভাবে হয়েছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। ইসলাম পূর্ব জাহিলিয়াতের সময়ে আরব দেশে প্রচলিত ও সাধারণভাবে মুখে মুখে বর্ণিত কিস্‌সা কাহিনী এবং দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর তুলনামূলক ভাবে অধিক জ্ঞানপূর্ণ ও সূক্ষ্মরীতিতে ইতিহাস রচনা এর মধ্যে একটি বিশাল শূন্যতা বিরাজ করছে। যা এখন পর্যন্ত ভরাট করা যায়নি। বর্তমান সময়ের বহু সংখ্যক ইতিহাসবিদদের ধারণা হচ্ছে, এই বিকাশের ক্ষেত্রে ফারসী ভাষায় রচিত "শাহনামা" নমুনার ব্যাপক প্রভাব পাচ্ছে। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকের ধারণা আরবী ভাষায় ইতিহাস রচনা বিভিন্ন ধরণের ঐতিহাসিক, অর্ধ ঐতিহাসিক রচনার ধারা সমূহের সংমিশ্রনের ফলে সূচিত হয়েছিল। এই পর্যায়ে আলাদা আলাদা আলোচনা করা হল।[৩২]

৩০। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০

৩১। প্রাগুক্ত, পৃ.৩১

৩২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

Dhaka University Institutional Repository

জাহিলিয়াতের সময় ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহ

এই বিষয়ে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলাভূমি ইয়ামেন থেকে মায়ীনী (Mencan) সাবায়ী হেমইয়ারী শীলালিপিরূপে যা কিছু সংরক্ষিত পাওয়া গেছে, তাতে কোন লিখিত ঐতিহাসিক বর্ণনা পাওয়া যায়নি। যা কিছু পাওয়া গেছে তা নিছক মৌখিক বর্ণনার কিছু নমুনা মাত্র। অর্থাৎ কতিপয় প্রাচীন রাজা-বাদশাহ্দের নাম, দূর অতীতকালের অস্পষ্ট ও আতিশর্য্যপূর্ণ কিস্সা-কাহিনী এবং ইসলামের পূর্ববর্তী শতকের ঘটনাবলী অপেক্ষাকৃত সঠিক কিছু স্পষ্টতায় আচ্ছন্ন স্মারক মাত্র।

প্রথম হিজরী শতাব্দীতে এই সব মৌখিক বর্ণনাকে কল্পনার জোরে অনেকখানি বাড়িয়ে বাড়িয়ে কাহিনী হিসাবে বর্ণনা করা হত। আর এই কাহিনী সমূহকেই প্রাচীন আরবের ইতিহাস মনে করা হত। উত্তরকালে এই কাহিনীর লেখক হিসেবে "ওহব ইব্ন মুনাবিবহর ও 'উবাইদ ইব্ন শাবরাতার' নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই দু'জন লেখকের গ্রন্থাবলীতে এই বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, প্রাচীন আরবদের মধ্যে প্রকৃত ঐতিহাসিক চেতনা ও দৃষ্টি ভঙ্গির আনুপাতিকতার অনুভূতির যথেষ্ট অভাব ছিল। সমকালীন ঘটনাবলীর কাহিনী সংকলনের এই ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। এতদসত্ত্বেও পরবর্তী বংশধররা সেইসব বর্ণনাকে সাধারণভাবে সত্য বলে ধরে নিতে থাকে। ইতিহাস রচয়িতা ও গ্রন্থপ্রণেতাগণও এই সব কাহিনীকে নিজেদের গ্রন্থাবলীতে শামীল করে নিয়েছেন। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ইব্ন ইসহাক, উবাইদ ইব্ন শাবরাতার একজন বর্ণনাকারী। আর আবদুল মালেক ইব্ন হিশাম লিখিত "কিতাবুত তীজান" কে তার বর্তমান রূপেই প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করেছিলেন। "তাফছীরে তাবারী"-র ন্যায় এক মহান অবদানে ও তার এখান ওখান থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। ইব্ন খালদুনও সেইসব বর্ণনাকে স্বীয় মতবাদ প্রমাণ করার জন্য উপস্থাপন করেছেন। মোট কথা এই ধরনের আবরদের ইতিহাস রচনায় সব সময়ই শামিল রয়েছে এবং তা সমালোচনামূলক চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ এবং প্রাচীন ইতিহাসের বিষয়বস্তু স্পষ্ট করে বুঝাবার পথে প্রতিবন্ধকই হয়ে রয়েছে।

উত্তর আরবদের মধ্যে খানিকটা ভিন্নমত অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। যদিও তথায় প্রত্যেকটি গোত্রের নিকট নিজস্ব বর্ণনাসমূহ সংরক্ষিত হত, তবু তা বহু দিক দিয়ে গোত্রীয় দৃষ্টিকোণে অনেকটা উন্নত ও ব্যাপক হত। তাতে বংশ তালিকা সম্পর্কে এমন সামষ্টিক ধারণাও সন্নিবেশিত হয়ে গিয়েছিল যা সমস্ত আরব পরিব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু এসব ধারণার এমন কথা মাত্রই দৃষ্টিগোচর হয় না, যদ্দারা প্রমাণ হতে পারে যে, উত্তর আবরদের কোন একক বা সম্মিলিত ঐতিহাসিক বর্ণনা ধারাও বর্তমান ছিল। গোত্র কেন্দ্রিক বর্ণনাসমূহও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, তার বেশীর ভাগ বর্ণনাই "আইয়্যামুল আরব" (আরবদের ঘটনা ও অবস্থাবলী) সংশ্লিষ্ট। উক্ত কালে ইসলামের বিজয়াভিযান গোত্রীয় বর্ণনা ধারাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করেছে বটে। কিন্তু তার বিশেষত্ব কোনরুপ পরিবর্তন সাধন করেনি। আর নতুন বর্ণনার পটভূমি সংমিশ্রিত হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে এবং পূর্বের ন্যায় তাতে বাড়াবাড়িপূর্ণ কথাবার্তা যথারীতি বয়ে গেছে। সেই কারণে তার অ-যথার্থতাও অনস্বীকার্য। ইসলামী ইতিহাস বিদ্যার উপর তার প্রভাব পড়েছিল অবশ্যম্ভাবী। গোত্রভিত্তিক বর্ণনাসমূহে যে সব তথ্য ও তত্ত্ব নিহিত পরবর্তী কালের গ্রন্থ প্রণেতাগণ খিলাফতে রাশেদার ও বনু উমাইয়ার শাসন আমলের ইতিহাস রচনায় তা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন।

গোত্র সমূহের বংশ তালিকা সংরক্ষণ গোত্রীয় বর্ণনার মধ্যে নিহিত দ্বিতীয় মৌল উপকরণ। কিন্তু বনু উমাইয়া শাসনের প্রাথমিক যুগে সচিবালয় গঠনের কারণে এবং প্রতিপক্ষ আরব জনগোষ্ঠিসমূহের সমর্থকদের মাথাচাড়া দিয়ে উঠার দরুন বংশতালিকা পারদর্শীদের তাৎপরতা হীনতার কারণে বংশ তালিকা বিদ্যায় আশ্চর্য ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হয়।

হিজরী সনের দ্বিতীয় শতাব্দীতে গোত্রকেন্দ্রিক বর্ণনাধারার ক্ষেত্র এতদিন পর্যন্ত বর্ণনাকারী ও বংশ তালিকা পারদর্শীদের জন্য বিশেষ দখলিভূক্ত কার্য হয়ে থাকার পর ভাষা পারদর্শীদের তৎপরতায় প্রশস্ত ক্ষেত্রে পরিণত হয়। তারা প্রাচীন কাব্য ও কবিতার অবশিষ্ট অংশ সংগ্রহ করে একত্রিত করেন ও তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও করেন। এই বিরাট তথ্য স্তুপ সংগ্রহকরণ এবং সে সবকে আলাদা-আলাদা করে সুবিন্যস্ত করণের মাধ্যমে তারা ইতিহাস শাস্ত্রের স্মরণীমানের খেদমত আন্‌জাম দিয়েছিলেন। এই ধরনের তৎপরতার দৃষ্টান্ত আবু উবাইদ (১১০-২০৯ হি. ৭২৮-৮২৪ খৃ.) পেশ করেছেন। তিনি পায় দুই শত ছোট ছোট পুস্তিকা রচনা করেছেন বলে বলা হয়েছে। তার অনেকগুলো তথ্যই পরবর্তী কালের গ্রন্থাবলীতে শামিল করে নেয়া হয়েছে। এসব পুস্তকের মধ্যে উত্তর আরবের সকল বর্ণনা সম্পূর্ণরুপে সন্নিবেশিত রয়েছে। তবে ইসলাম পরবর্তী বর্ণনা সমূহও শামিল রয়েছে। এই বর্ণনা বিভিন্ন প্রদেশ ও অঞ্চল বিজয়ের কাহিনী, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ও যুদ্ধ সম্পর্কিত ছিল।

হিশাম ইব্‌ন মুহাম্মদ কালবীও প্রায় এই ধরণের কাজ সম্পন্ন করেন। তার পিতা আওয়ানা ও মিখনাক যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন হিশাম সেগুলোকে সুবিন্যাস্ত করেন ও প্রচার করেন। তিনি আল-হিরা নগর ও মেখলাকার বাদশাহদের সম্পর্কে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। এটা ছিল তার বিশেষ অবদান। আল-হিরা উক্ত গ্রন্থে সমস্ত তথ্য সাজিয়ে দিয়েছিলেন। হিশাম এসব তথ্য সংগ্রহ করে নিজের কাজে ব্যবহার করেছেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর তথ্য সমূহে শেষ পর্যন্ত শুধু উদ্ধৃতির মাধ্যমেই সংরক্ষিত রয়েছে, তবু এসব বর্ণনার সাধারণ সত্যতা এক কালের অধ্যয়ন, গবেষণা পর্যালোচনা ও যাচাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। হিশাম তার অন্যান্য গ্রন্থাবলীতেও এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তিনি যেসব শিলা লিপি ও লিখিত সম্পদ হাতে পেয়েছেন তা সবই কাজে লাগিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাচীন পদ্ধতির সংরক্ষক মনীষীদের হাত থেকে তা রক্ষা পায়নি। তবে অবিশ্বাস্য জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত করতে চেষ্টার এক বিন্দু ত্রুটি করা হয়নি। [৩৩]

৩৩। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩২

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের প্রাথমিক কালের ইতিহাস

হিশাম আল কালবী আল-হীরার প্রাপ্ত উৎস ও সূত্র থেকে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাছাড়া আরবী ভাষার বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাস রচনার সূচনা নবী করিম (সঃ) জীবন রচিত ও কার্যাবলী অধ্যয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট। এই কারণে এ শাস্ত্রের উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় নবী করিম (সঃ) এর যুদ্ধ ও জিহাদ সমূহের সাথে।

এ পর্যায়ে "মাগাযী" مغازي সামরিক অভিযান শব্দটি একটি পরিভাষা হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিত হয়ে পড়ে। প্রাথমিক কালের জীবন চরিত্র রচনায় তার ব্যবহার হতে থাকে। এই পর্যায়ের প্রাথমিক কেন্দ্র ছিল "মদীনা তাইয়্যেবা"। অতঃপর দ্বিতীয় শতাব্দীতে "মাগাযী" পর্যায়ে গ্রন্থ প্রণেতাগণ ইসলামী রাজ্যের অপরাপর কেন্দ্রসমূহেও পরিদৃশ্যমান হয়েছেন। "মাগাযী" সম্পর্কিত ইল্‌মে হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার দরুন ইতিহাস গ্রন্থ রচনার পদ্ধতির উপর সনদের ব্যাপক উল্লেখের কারণে ইলমে হাদীসের প্রভাব পড়ে। এই কারণে সেই সময় থেকেই আরবদের ঐতিহাসিক তথ্যের বিশেষত্বে এবং সেসব তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের মানদন্ডে উত্তীর্ণ হওয়ার দিক দিয়ে বিরাট পরিবর্তন সূচীত হল। এখানেই সর্বপ্রথম অনুভূত হয় যে, ইতিহাস আমরা মুসলমানরা অত্যন্ত দৃঢ় ও শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছি এবং প্রতিষ্ঠিত রয়েছি।

যেসমস্ত মুসলিম ঐতিহাসিক "মাগাযী" সংক্রান্ত হাদীস সংগ্রহে বিশেষ খ্যাতিমান হয়েছেন তাদের মধ্যে মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম, ইব্‌ন শিহাব, আল যুহরী (রঃ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি ওমর ইবন আবদুল আযীয (রঃ) পঞ্চম খলিফায়ে রাশীদ এর অনুরোধ বা নির্দেশে বিপুল সংখ্যক হাদীস সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করেন। এর পরবর্তী যুগের তিনজন গ্রন্থ প্রণেতা "মাগাযী" পর্যায়ের গ্রন্থ সংকলন করেন। তাদের গ্রন্থাবলীর মধ্যে দু'খানি যুহরী সংগৃহীত হাদীসের উপর ভিত্তিস্থানীয় এমন আরো দু'খানি গ্রন্থ সম্পন্নরুপে বিনষ্ট হয়ে গেছে। অবশ্য তৃতীয় প্রখ্যাত গ্রন্থ মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ইব্‌ন ইয়ামার লিখিত "সীরাত" পূর্ববর্তী ও সমকালীন গ্রন্থাবলী ছিল। তাতে শুধুমাত্র নবী করিম (সঃ) জীবন রচিতই লিখিত হয়নি। নবুওয়্যাতের ইতিহাস ও সন্নিবদ্ধ হয়েছে। এই গ্রন্থটি মূলত তিনটি বড় বড় খন্ডে বিভক্ত ছিল।

১। " আল-মুবতাদা" (المبتدأ) তাতে প্রথম সৃষ্টিকাল থেকে শুরু করে আরব জাহিলিয়াতের ইতিহাস পর্যন্ত লিখিত হয়েছিল।

২। "আল-মাব'আস"(المبعث) এতে নবী করীম (সঃ) এর জীবন বৃত্তান্ত প্রথম হিজরী সন পর্যন্ত লিখিত হয়েছিল।

৩। "আল-মাগাযী"(المغازي) এতে নবী করীম (সঃ) এর পূর্ণাঙ্গ জীবন কাহিনী ওফাতকাল পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল। এই গ্রন্থে কতক মূল্যহীন মনগড়া ভাবে রচিত হাদীস ও কবিতা সন্নিবেসিত হয়েছে। এই মর্মে গ্রন্থটির তীব্র প্রতিবাদ ও সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু বহু মনীষীই এই গ্রন্থকে জাহিলিয়াতের যুগের ও ইসলামের প্রাথমিক কালের সনদ সম্পন্ন নির্ভর ও বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এর পরবর্তী সময় ইতিহাস অধ্যয়ন ও ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়নের কাজের ক্ষেত্র ও পরিধি অত্যন্ত প্রশস্ত হয়ে যায়।[৩৪]

৩৪। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩-৩

Dhaka University Institutional Repository

খিলাফতের ইতিহাস

নবী করীম (সঃ)-এর ইন্তিকালের পর বিভিন্ন ঘটনা পর্যায়ে ছোট ছোট ও আলাদা-আলাদা পুস্তিকা রচনায় প্রচলন হয়ে গিয়েছিল, পূর্বে তার উল্লেখ হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, এই কাজ শুধু মাত্র ইরাক পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল।

সিরিয়া, আরব বা মিশরে প্রথম দুইশতাব্দীকালে আলিমগণ এ ধরনের কোন পুস্তিকা রচনা করেন নি। এর ফলে ইরাক ও সেখানকার বর্ণনা সমূহ পরবর্তীকালে ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়নের প্রথম সূত্র হওয়ার মর্যাদা পেল। খুলাফায়ে রাশেদীনের ইতিহাস রচনায় অনন্য মদীনা তাইয়্যেবা কেন্দ্রিক হাদীস ও বর্ণনাসমূহের কারণে গ্রন্থ রচয়িতাদের হাদীস ও বর্ণনাসমূহের কারণে গ্রন্থ রচিয়তাদের জন্য মদীনা বাগিচার সহিত সংশ্লিষ্ট উপকরণ তথ্যাদি লাভের উৎস হয়ে দাঁড়ায়। মদীনার কোন লিখিত উপকরণ পাওয়া গিয়েছিল কিনা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। তবে মদীনা কেন্দ্রিক হাদীসমূহ বাৎসরিকক্রম অনুযায়ী সংকলিত হওয়ার কারণে যে উপকরণাদি পাওয়া গেছে, তা খুবই সহীহ-বিশুদ্ধ। উমাইয়া শাসন আমলে এই ধরণের দলীল পত্র ও অকাট্য প্রমাণাদি দামেস্ক ও ইরাক উভয় স্থানে বর্তমান ছিল, তা অসংখ্য সূত্রের ভিত্তিতে প্রমাণিত। এই সব উপকরণের সাহায্যে পরবর্তী কালের গ্রন্থ প্রণেতাগণ বৎসরানুক্রমিক বিন্যাসের ভিত্তিতে একটি নির্ভুল ও সুসংবদ্ধ পেয়ে গিয়েছিলেন। তাতে প্রত্যেক বছরের হজ্জের অনুষ্ঠানের আমীর বা নেতা এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের তালিকাও উদ্ধৃত ছিল।

এই সব উপকরণের ভিত্তিতে ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য হাদীসবিদ ও ভাষাবিশারদের অনুসৃত রীতি সমূহকে একত্রিত করার ভিত্তিতে সংগৃহীত উপকরণাদি ব্যবহার করার প্রয়োজনও দেখা দিয়েছিল। এই পর্যায়ের বেশীর ভাগ বর্ণনা ইরাকের আরব গোত্রসমূহের ছিল। তন্মধ্যে একটি গোত্রের নাম ছিল 'আযদ'। এই গোত্রের বর্ণনাসমূহ অন্যান্য বর্ণনা সমূহের সাথে একত্রিত করেন আবু মিখনাক (মৃ. ১৫৭ হিঃ ৭৬৪ খ্রী.) একখানি গ্রন্থ সংকলিত করেছিলেন। আর হিশাম আল-কালবী সে সবের মৌখিক বর্ণনা ধারা চালিয়ে ছিলেন। এটা কুফার বর্ণনা। তাতে হযরত আলী (রাঃ) এর পক্ষে সিরিয়দের বিপক্ষে সন্নিবেসিত হয়েছিল। আওরানা ইবনুল হাকাম (মৃঃ ১৪৭ হি. ৭৬৪ খ্রী.) যে কালবী বর্ণনা পেশ করেছেন এবং যার বর্ণনাকারী এই হিশাম আল-কালবী, তা হযরত আলী (রাঃ) এর বিরুদ্ধে, যা সিরিয়দের পক্ষে হওয়ার যথেষ্ট লক্ষণ পাওয়া যায়। তৃতীয় একটি বর্ণনা তামীমী। সাইফ ইব্ন উমর ইসলামী বিজয়াভিযানের একটি ঐতিহাসিক রম্য রচনা প্রকাশ ও প্রচার করেছেন। এ সব গোত্রীয় বর্ণনা পক্ষপাতদৃষ্ট হলেও ইতিহাস বিদ্যার দিক দিয়ে তার কোন মূল্য নেই এমন কথা বলা যায় না। বিশেষ করে এই জন্য যে, এ সময়ের মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাসের প্রথম শতাব্দীর অভ্যন্তরীণ সমস্যাসমূহের উপর বিশেষ আলোকপাত হয়। কেননা এজন্য স্মরনীয় গোত্রভিত্তিক বর্ণনাসমূহ সংগ্রহকারীগণ সনদসূত্রের নিয়ম-কানুন খুব বেশী সতর্কতা সহকারে পালন করেছেন। এই কারণে বাহ্যিক রুপের দিক দিয়ে এই বর্ণনা সমষ্টিসমূহ ইলমে হাদীসের সহিত মিলে যায়। আর সত্য কথা এই যে, এই তৎপরতার সূচনা কুফার সর্বাধিক প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আশ-শাবী (মৃ. ১১০ হি./৭২৮ খ্রী.) নামের সহিত জড়িত। তাঁর মূল বর্ণনা ও প্রক্রিয়ার কোনরূপ বহিঃপ্রভাবের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না।[৩৫]

৩৫। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৩৬

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাস গ্রন্থ রচনার সূচনা

ব্যাপক অর্থে ইতিহাস গ্রন্থ রচনার সূচনা হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে হয়েছে। ব্যাপক অর্থ বলতে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে, রাসূল করীম (সঃ) এর জীবন-চরিত্র সংক্রান্ত তথ্য ও তত্ত্ব, স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন পুস্তিকা ও অন্যান্য উৎস পরস্পর সংমিশ্রিত করে তার ভিত্তিতে সুসংবদ্ধ ঐতিহাসিক বর্ণনা তৈরী করা। এই পর্যায়ের সর্বপ্রথম গ্রন্থকার আহমদ ইব্ন ইয়ইইয়া আল-বালাযুরী (মৃ. ২৭৯ হি./৮৯২ খ্রী.) তো ক্লাসিক্যাল অর্থাৎ প্রাচীন বর্ণনা সমূহ একত্রিত করে গ্রন্থ রচনার কাজ অব্যাহত রেখেছিলেন। তিনি ইব্ন সাদ ও আল-মাদাইনী উভয়েরই শিষ্য। তাঁর দু'টি গ্রন্থ যা এখনও সুলভ, তা থেকে তাঁর উপর শুধু ওস্তাদদের প্রভাবের সন্ধানই পাওয়া যায় না। সেকালের সমালোচনা ও যাচাই পরখ রীতির ও বাস্তব প্রদর্শনী ঘটে। তা সত্ত্বেও একালের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গ্রন্থ তো বিশ্ব ইতিহাস, যাতে প্রথম সৃষ্টি সূচনা থেকে শুরু করে সমগ্র জগৎ ও পৃথিবীর ইতিহাসের সারনির্যাস ছোট বা বড় আকারে নির্ভেজাল ইতিহাসের ভূমিকা স্বরুপ লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই কারণে এই ইতিহাস এবং সংমিশ্রনের যথার্থতম অর্থে সমগ্র দুনিয়ার ইতিহাস নয়। কেননা ইসলামের অভ্যুদয়ের পর থেকে ইতিহাস গ্রন্থকারের মনে অন্যান্য জাতিসমূহের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করার প্রতি কোন আগ্রহ উৎসাহই অবশিষ্ট থাকে না।

এই পর্যায়ে পৌঁছে শুধু (হিশাম আল-কালবী গ্রন্থটি বাদে) আরবী ভাষায় ইতিহাস রচনা স্রোতের সহিত ইরানী বর্ণনা ধারাও এসে মিলিত হয়ে যায়। যদি ইরানী "খোদায়ে নামার" অনুবাদ এক শতাব্দী পূর্বে ইবনুল মুকাফফা (মৃ. ১৩৯ হি./৭৫৬ খ্রী.) আরবী ভাষায় করেছিলেন।

মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত্-তাবারী (মৃঃ ৩১০ হি./৯২৩ খ্রী.) রচিত (تاريخ الرسل والملوك) "রাসূল ও বাদশাহগণের ইতিহাস" গ্রন্থখানি পূর্বোক্ত ধরনের অনুপ্রবেশকারী উপাদান থেকে মুক্ত ও পবিত্র (অবশ্য ইরানের ইতিহাস অংশ বাদ দিয়ে) এই গ্রন্থ প্রাচীন ঐতিহাসিক বর্ণনা উচ্চমানে উন্নীত করা যায়। তার কারণ, তাবারী মূলত ছিলেন মুহাদ্দিস- হাদীসে ইলমে পারদর্শী, তারপর অন্য কিছু। তিনি তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে এই উদ্দেশ্যকে বাস্তাবায়িত করেছেন যে, তিনি ইতিহাসের মাধ্যমে ইসলামী ঐতিহাসিক বর্ণনা সমূহ উপস্থাপনে তাঁর পূর্বকৃত তাফসীর গ্রন্থের ন্যায় বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও যাচাই পরখের নীতি অবিচল অনুসারী থাকবেন এবং এভাবে স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থকে স্বলিখিত তাফসীর গ্রন্থের পরিশিষ্ট বানাবেন। বর্তমানে প্রাপ্য ইতিহাস গ্রন্থখানি মূলত তাঁর লিখিত বিরাট বিশাল গ্রন্থের সার-সংক্ষেপ মাত্র। অবশ্য তাফসীরে তিনি সুস্পষ্ট যাচাই-বাছাই কার্যক্রম সদাসক্রিয় করে রাখলেও ইতিহাস গ্রন্থে তা আনুসাংগিক মাত্র। ফলে একজন হাদীস পারদর্শীর ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই সাইফ-এর আধা ঐতিহাসিক গ্রন্থটিকে আল ওয়াকিদির ইতিহাস গ্রন্থের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তবে কারণ শুধু এতটুকু যে, ওয়াকিদীকে মুহাদ্দিসদের সমাজে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয়। কিন্তু এসব বিষয়ের

Dhaka University Institutional Repository

বিপরীতে তাবারী লিখিত ইতিহাস গ্রন্থের সন্দেহমুক্ত সৌন্দর্য্য বৈশিষ্ট্যকে কোনক্রমেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা যায় না। তার প্রমাণিকা ও ব্যাপকতা এতই অকাট্য যে, এই গ্রন্থ দ্বারা ইতিহাস গ্রন্থ রচনার একটি যুগের অনুমান সাধিত হয়েছে। পরবর্তী কোন গ্রন্থকারই ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাস পর্যায়ে সে সব উপাদান উপকরণকে নতুন করে সংগ্রহ করার ও যাঁচাই পরীক্ষা ও বাছাইর কাজ করেননি। গ্রন্থ রচয়িতাগণ হয় তাবারী গ্রন্থে সন্নিবেশিত শর্ত সমূহের সার-সংক্ষেপ তৈরি করেছেন। কেউ কেউ তার সহিত বালাযুরী সংগৃহীত তথ্য সমূহ যোগ করে দিয়েছেন। অথবা তাবারী যেখানে এসে তাঁর ইতিহাস গ্রন্থকে সমাপ্ত করেছেন, সেখান থেকেই শুরু করেছেন।

কিন্তু তাবারী গ্রন্থের শেষ অংশ শুন্য হস্ত প্রায়। খুবই সামান্য তথ্য সংগ্রহ হয়েছে বলে মনে হয়। এ থেকেই এ শিক্ষা লাভ করা যায় যে, ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়নে নিছক হাদীস গ্রন্থের উপর নির্ভরতা অতীত গর্ভে বিলিন হয়ে গেছে। দপ্তর কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার কারণে রাজনৈতিক ইতিহাস সন্নিবদ্ধ করণে যাদের দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ করা প্রয়োজন সরকারী কর্মচারী ও দরবারী লোকেরা তাদের কাতারে শামিল হয়ে গেছে। এ ব্যবস্থার দরুন বিভিন্ন মাযহারের 'আলিমগণকে ইতিহাস গ্রন্থ রচনায় দ্বিতীয় কাতারে নামিয়ে দেয়া সম্ভপর হয়েছে। এই কারণেই তৃতীয় হিজরী শতাব্দী আরবী ভাষায় ইতিহাস গ্রন্থ রচনার একটি যুগ অতিক্রান্ত হয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা হয়ে গেল।[৩৬]

ইতিহাস বিদ্যা একটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জ্ঞান ধারার মর্যাদায় অভিষিক্ত হলে অত্যন্ত দ্রুততা সহকারেই তার সম্প্রসারণ ও ব্যাপকতা লাভ হতে শুরু করে এবং তৃতীয় ও ষষ্ট হিজরী শতকের মাঝামাঝি সময়ে যে সব গ্রন্থ বিরচিত হয় তার সংখ্যা তীব্রভাবে বেড়ে যায়। কারণ এ সময়ের ঝোক প্রবণতার জরীপ করা ছাড়া খুব বেশী বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

১। তৃতীয় শতকের বিভিন্ন এলাকার মণীষী বিশেষজ্ঞগণ নিজ নিজ স্থানে লভ্য ও চালু বর্ণনাসমূহ সংগ্রহ করে শুরু করতে ছিলেন একটি সাধারণ প্রচলন হিসেবে। তারীখে মক্কার ইতিহাস তো অনিবার্যভাবেই "সীরাত" পর্যায়ের গ্রন্থাবলী শ্রেণীভূক্ত। কিন্তু তা ছাড়াও আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল হেকাম (মৃ. ২৫৭ হি./৮৭১ খ্রী.) কর্তৃক মিসর ও পশ্চিমী রাজ্য সমূহ বিজয়ের অবস্থা পর্যায়ে লিখিত গ্রন্থটি প্রাচীনতম আঞ্চলিক ইতিহাস হিসেবে গণ্য। এই গ্রন্থে ও পূর্বেলিখিত সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থাবলীও পার্থক্য সৃষ্টিকারী বিশেষত্বের ধারক তথ্য উপকরনাদি বর্তমান রয়েছে। এ কথা বিশেষভাবে লক্ষণীয় কিন্তু সেসব গ্রন্থের ন্যায় যাচাই বাছাই পরীক্ষণ ছাটাইর প্রক্রিয়া এ গ্রন্থে প্রয়োগ করা হয়নি।

৩৬। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০

Dhaka University Institutional Repository

বিজয় কাহিনী সমূহ বেশীর ভাগ মাদানী ও অনির্ভরযোগ্য স্থানীয় বর্ণনাদির উপর ভিত্তিশীল। তার ভূমিকা অংশও আসল ও নির্ভেজাল মিশরীয় উপকরণ থেকে গৃহীত নয়। বরং তা বেশীর ভাগ সে সব ইয়াহুদী সূত্রও আরবী বর্ণনা ধারা থেকে গৃহীত যা হাদীসের মাধ্যমে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। অনুরুপ ভাবে কাহিনী ও কম বেশী সহীহ বর্ণনা সমূহকে যাচাই পরখ ব্যতীতই পরস্পর সংমিশ্রিত কার্যক্রম আন্দালুসীয় (স্পেন) প্রাথমিক ইসলামী যুগের ইতিহাসেও রয়েছে।

আবদুল মালিক ইব্ন যুবাইর (মৃ. ২৩৮ হি./৯৪৫ খ্রী.) এর কাজ বলে মনে করা হয়েছে। আল হামাদানী (মৃ. ৩৩৪ হি./৯৪৫ খ্রী.) লিখিত 'আল-ইকলীল' গ্রন্থটির এই অবস্থা। মূলতঃ এ গ্রন্থটি ইয়ামানী পৌরানিক কাহিনীর বিশ্বকোষ নামে পরিচিত। হিজরী তৃতীয় শতকে লিখিত বিভিন্ন শহর নগরের স্থানীয় সম্বিলিত ও আবর্জনা মুক্ত। কিন্তু এই সমস্ত (তারীখ বাগদাদ এর একটি খন্ড ব্যতীত) সম্পূর্ণরুপে ধ্বংস হয়ে গেছে। পরবর্তী শতাব্দী সমূহে এ ধরনের স্থানীয় ভিত্তিকেই ইতিহাস গ্রন্থের ব্যাপক প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্বলিত গ্রন্থাদি একান্নে সূলভ, তা সঠাংশে রুপক ও রোমাঞ্চকর উপকরণ বিবর্জিত না হলেও তাতে যথেষ্ট মূল্যবান উপকরনাদি অবশ্যই সন্নিবদ্ধ রয়েছে। যদিও তা বড় বড় ইতিহাস গ্রন্থে শামিল করা হয়নি।এই কারণে সে গ্রন্থগুলো যথেষ্ট গুরুত্বের অধিকারী। এই সব স্থানীয় ভিত্তিক ইতিহাস গ্রন্থ আরবী ও ফার্সী ভাষায় ইসলামী ইতিহাস প্রণয়নেও কিছুমাত্র কম গরুত্বপূর্ণ নয় [৩৭]

২। তা সত্ত্বেও চতুর্থ হিজরী শতকের পর সাধারণ ইতিহাস ও স্থানীয় ভিত্তিক ইতিহাসের কোনরুপ পার্থক্য করা খুবই দুরুহ ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। এই সমস্ত থেকে নির্ভেজাল ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীর সাধারণ রীতি স্ব-স্ব সময়ের এক একটি ঘটনা বর্ষপঞ্জির পরিগ্রহ করে। তার সাথে অনেক সময় ভূমিকা স্বরুপ বিশ্ব ইতিহাসের একটি সার সংক্ষেপও দেওয়া হত। এই ধরনের বার্ষিকীর গ্রন্থকার বিশ্বজনীন জ্ঞান ও আগ্রহ কৌতুহলের অধিকারী হতে পারেন না। বরং এইরুপ রাজনৈতিক পরিবেশ সবই অত্যন্ত সীমাবদ্ধ মনে হত। যেখানে গ্রন্থাকার বসবাস করে। ফলে দূরবর্তী সংঘটিত ঘটনাবলী সম্পর্কে কোন তথ্য লাভও পরিবেশন করা তার পক্ষে সম্ভব হত না। এভাবে দৃষ্টির সংকীর্ণতাকে মানস জীবনে আরেকটা ইসলামী রাজনৈতিক ঐক্যের অভাবের সাদৃশ্য ও দৃষ্টান্ত মনে করা যায়। এ প্রশ্নটি নিয়ে অবশ্যই আলোচনা পর্যালোচনা করা আবশ্যক। অতঃপর রাজনৈতিক ইতিহাসের গ্রন্থ প্রণয়নের কাজে বেশীর ভাগ সরকারী কর্মচারী ও দরবারী লোকদের হাতে চলে যায়। অন্যদের জন্য ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর যে ইতিহাস গ্রন্থ রচনার কাজ হয়েছে তাতে লেখার স্টাইল, মূল বক্তব্য এবং তার প্রাণশক্তি সবকিছুর উপর স্থান প্রভাব প্রতিফলিত হয়। ধারাবাহিক পদ্ধতিতে ঘটনাবলী সংকলন ও লিপিবদ্ধ করার দক্ষ লিপিকের সচিবগণের জন্য একটা সহজ ও লোভনীয় বাস্তবতা ছিল।

৩৭। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪১

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী দলিল দস্তাবেজ ব্যক্তিগত দেখা সাক্ষাত এবং কোষাধ্যক্ষ ও দরবারী লোকদের সাধারণ গাল-গলাই ছিল তাঁদের তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহের প্রধান সূত্র। এই কারণে ইতিহাস গ্রন্থ রচনার কাঠামোর একটি মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হল। অতঃপর বিস্তারিত ভাবে সনদ সূত্রের উল্লেখের পরিবর্তে মোটামুটি ভাবে সনদ সূত্রের উল্লেখ না করার রীতিই অনুসরণ করতে লাগলেন। কিন্তু সেই সাথে তাদের ঘটনা লিপিবদ্ধ করণে তাদের নিজ নিজ শ্রেণীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় হিংসা-বিদ্বেষ ও দৃষ্টি সংকীর্ণতারও প্রতিবিম্বিত হওয়াও অনিবার্য হয়ে পড়ে। প্রাচীন ধর্মীয় ধারণার ইতিহাস শাস্ত্রের মর্যাদা ব্যাপকতা অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তা সম্পূন্নরুপে পরিত্যাক্ত হল।

ইব্ন মাসকুইয়া (মৃ. ৪২১ হি./১০৩০ খ্রী.) কিম্বা হিলাল আস্সাবী (মৃ. ৪৪৮ হি./১০৫৬ খ্রী.) যে সমকালীন গ্রন্থপঞ্জি রচনা করেছেন, তা প্রমাণ করে যে, তারা বিশেষ স্বীকারের মাধ্যমে শুদ্ধতার মান অনেক উচ্চে এবং নিজেদেরকে রাজনৈতিক হিংসা-বিদ্বেষ থেকে অনেকটা মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই মানদন্ড সকলের নিকট স্বীকৃত হয়েছিল। উবায়দুল্লাহ ইব্ন আহমাদ আল-মুসবিহী (মৃ. ৪২০হি./১০২৯ খ্রী.) ও ইব্ন হাইয়্যান আল-কুরতুবী (মৃ. ৪৬৯ হি./১০৭৭ খ্রী.) লিখিত তারীখে মিসর ও আন্দালুস মিসর ও স্পেনের ইতিহাস গ্রন্থের যে সব অংশ এখনো রয়েছে, তা থেকেই উক্ত কথা প্রমাণিত হয়।

৩। একালে ব্যাপক ইতিহাস বিকৃতকরণ ও জালকরণের কারসাজি সাধারণভাবে চলতে থাকে সাইফ ইব্ন উমর- এর গ্রন্থাবলীর কথা আগেই বলা হয়েছে। তাঁর মতে এসব মিথ্যা রচনাকারীদের মধ্যে এমন অনেকেই রয়েছে, যাদেরকে পুরামাত্রায় জালিয়াত বলা যায় না। বরং সহীহ্ বিশুদ্ধ বর্ণনাসমূহের উপরই সে সবের ভিত্তি স্থাপিত। কিন্তু তারা সাধারণ জনগণের হৃদয়গ্রাহী রোমাঞ্চকর কিস্সা-কাহিনী এবং পক্ষপাতমূলক প্রোপাগান্ডার উপকরণ সমূহ সাধারণভাবে বই মিশ্রিত করে প্রচার করত। তার মূলে যে কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বা দ্বীনী উদ্দেশ্য পূরণ লক্ষ্যরুপে নিহিত ছিল, তা স্পষ্ট করেই বলা যায়।

৪। রাজনৈতিক ইতিহাসের গ্রন্থ প্রনয়ণের কাজ এক্ষণে মুহাদ্দিসীন ও শিক্ষিত মণীষীগণের পরিবর্তে সরকারী ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীই করতে শুরু করে দিল। এই কাজের অধিকার তারাই দখল করে নিয়েছিল। তবে সীরাত-জীবনবৃত্তান্ত লেখার বিশাল ক্ষেত্র তখনও মুহাদ্দিস ও বিজ্ঞ মণীষীদের করায়ত্ত ছিল। এ বিষয়টি ও ক্লাসিক বর্ণনা ধারা একটা সাক্ষ্য ছিল। সত্যি কথা রাজনৈতিক ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ যখন বাদশাহী পরিবারের বর্ষপুঞ্জিকরণ পরিগ্রহ করল, তখন "সীরাত" গ্রন্থাবলী ইতিহাস গ্রন্থ রচনার প্রাচীন ধ্যান ধারণা অধিক দায়িত্বশীলতা ও বিশ্বস্ততা সহকারে সংরক্ষিত করল।

৫। সূচনাকাল থেকেই জীবন-চরিত্র ও ইতিহাসের পারস্পারিক সংমিশ্রনের দরুন জীবন-চরিত্র নির্ভর ইতিহাস গ্রন্থ রচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই পদ্ধতি উজিরদের ইতিহাস সমূহের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য খুবই শোভন ছিল। আলী ইব্ন মুনজির আল-সাইবাকী (মৃ. ৫৪২ হি./১১৪৭-৪৮ খ্রী.) ফাতিমী বংশের খলীফাগণের শাসন আমলের ইতিহাস পর্যায়ে উজীরগণের ইতিহাস লিখেছিলেন। বিচারপতিদের জীবনালেখ্যের জন্যও এ পদ্ধতি মানানসই ছিল। এই পর্যায়ে প্রাচীনতম গ্রন্থাবলীর মধ্যে মিসরের বিচার কমন্ডার জীবনালেখ্য লিখেছেন মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ আল কিন্দী (মৃ. ৩৫০ হি./৯৬১ খ্রী.) আল কাজের্ভার বিচারক মন্ডলীর জীবনী লিখেছেন মুহাম্মদ ইব্ন হারিস আল-খুশানী (মৃ. ৩৬০ হি./ ৯৭০ খ্রী.) আল মূলী (মৃ. ৩৩৫ হি./ ৯৪৬ খ্রী.) এর গ্রন্থ 'কিতাবুল আওরাফ' আব্বাসীয় শাসন আমলের ইতিহাস। এই গ্রন্থটি রাজনৈতিক সাহিত্যিক জীবন কথার সংমিশ্রনের একটি প্রত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শাহী বংশসমূহ যখন উন্নতির উচ্চতর শিখরে আরোহন করল, তখন তাদের জীবন-কাহিনী রচনারও এই পদ্ধতিই অনুসৃত হয়েছে। অবশ্যই পঞ্চম ও ষষ্ঠ হিজরী শতেক এই ধরণের রাজকীয় পরিবার সমূহের ইতিহাস কার্যত বর্ষপঞ্জি সমূহের স্থান লাভ করে। তবে পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে বর্ষপঞ্জি সমূহ প্রকাশ সম্পূর্ণরুপে বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু এ কাজটা ছিল খুবই মারাত্মক। কেননা প্রশাসন ক্ষমতা যখন ব্যক্তিদের হাতে যায়, তবে ব্যক্তি ফ্যাক্টরই প্রবলরুপ পরিগ্রহ করে। আলোচ্য অবস্থায় তাই হয়েছিল।[৩৮]

হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দী (খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী) আরবী ও ফারসী ভাষায় ইতিহাস গ্রন্থ রচনার মধ্যে অধিক ব্যতিক্রম দূরত্ব প্রকট হয়ে উঠে। একে তো মোঘলদের জয়ের পর জয় লাভের দরুন তুর্কী-ইরানী-সংস্কৃতি প্রভাবিত অঞ্চলে সাহিত্যিক ভাষা হিসাবে আরবীর পরিবর্তে ফারসীকে চালু করার কার্যক্রম সম্পূর্ণতা লাভ করে। তাছাড়া এই কালে ভারতেও ইসলাম সম্প্রসারিত হওয়ার কারণে এখানে ফারসী ভাষা চালু হয়ে গেল। আর এরই ফলে এতদাঞ্চলে ফারসী ভাষার ইতিহাস গ্রন্থ রচনার প্রচলন খুবই দ্রুততা ও তীব্রতা সহকারে চালু হয়ে গেল। তা সত্ত্বেও আরবী ভাষায় গ্রন্থ রচনার কাজ বন্ধ ছিল না। বরং তা আরো অনেকখানি বেড়ে গেল। এই ধরনের ব্যাপক প্রশস্ত জ্ঞান তথ্যের সমাহার বর্তমান থাকার কারণে আরবী ও ফারসী ভাষায় যে ইতিহাস সাহিত্য বিরচিত হয়েছে, আলাদা আলাদাভাবে উভয়েরই জরীপ হওয়া আবশ্যক।

১। এই সময়ে আরবী ইতিহাস গ্রন্থ রচনা বেশীল ভাগ সে জন্য প্রস্তাবিত মৌল নীতির উপরই চলেছে। কিন্তু কিছু নতুন সংমিশ্রনের ফলে তাতে পার্থক্যপূর্ণ বিশেষত্ব প্রকাশ ম্লান হয়ে উঠে।

এই পরিবর্তন সমূহের মধ্যে দু'টি অধিকতর স্পষ্ট :

ক) জীবন বৃত্তান্ত রচনা, রাজনৈতিক ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ কারনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে যে পরিবর্তন সংগঠিত হয়ে ছিল তা, আর

৩৮। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩-৪৪

Dhaka University Institutional Repository

খ) সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থাবলীর তথ্য ও উপকরণের প্রকৃতিতে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল তা। এই পরিবর্তন সমূহের ভিত্তিগত অংশ ছিল এইগুলোঃ প্রথম পরিবর্তনটি এই যে, ইতিহাসবিদ 'আলিম সরকারী ইতিহাসবিদদের পাশাপাশি পূনরায় দৃশ্যমান হয়ে উঠলেন। আর দ্বিতীয়টি এই যে, আরবী ভাষায় ইতিহাস প্রণয়নের কেন্দ্র ইরাক থেকে প্রথমে সিরিয়ায় এবং পরে মিসরে স্থানান্তরিত হয়ে গেল।

২। বার্ষিকী পর্যায়ে গ্রন্থাদিতে সুস্পষ্ট করণের নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল, তা ছিল এই যে, তাতে বিশ্ব ইতিহাস পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠল। এভাবেই এই প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত অধিক মানবিক মতাদর্শ যে, উম্মাহর ইতিহাসভূক্ত যাবতীয় ব্যাপারের নামই হচ্ছে ইতিহাস তা পুনরায় চালু হয়ে গেল। যদিও প্রথম শতাব্দী সমূহের ইতিহাস নতুন কোন চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা চালনা হয়নি। মানষিক দৃষ্টিভঙ্গি পারস্পরিক রাজনৈতিক ঘটনাবলী ও জীবন বৃত্তান্ত রচনাকে একত্রিত করার লক্ষ্যে যে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে তাতেও স্পষ্ট হয়ে উঠে। পূর্বে কোন কোন প্রাচীনতম স্থানীয় ইতিহাসসমূহে তাই হয়ে ছিল। ইবনুল কালান্দী (মৃ. ৫৫৫ হি./১১৬০ খ্রী.) লিখিত দেমাশক-এর ইতিহাসের কথা দৃষ্টান্ত স্বরুপ উল্লেখ করা হয়।

৩। ভারতবর্ষে ঘুরী এবং দিল্লীতে সুলতানাতগণের বসবাস স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে ইরানী পদ্ধতিতে ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়নের সূচনা হয়। পরবর্তী শতাব্দী সমূহে হিন্দী ফারসী বার্ষিকী প্রকাশের ব্যাপক ধারা এই ধরণের বর্ণনাভঙ্গী বিশ্লেষণ রীতির সহিত সম্পৃক্ত। হাসান-নিজামী রচিত "তাজুল মায়াসির" (تاج المياسر) এর পর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হচ্ছে জিয়াউদ্দীন রাব্‌নী (মৃ. ৭৫৮ হি./১৩৫৭ খ্রী.) লিখিত গ্রন্থ। তিনি 'তারীখে জাওজেজানীর' পরিশিষ্ট লিখেছেন। সিন্ধু প্রদেশের স্থানীয় বর্ণনা সমূহের কিছু সংখ্যক নিদর্শন পাওয়া গেছে। তাতে হিজরী সনের প্রথম শতাব্দীতে (খৃষ্ট্রীয় অষ্টম শতক) আরব বিজয়কাল পর্যন্ত শামিল হয়ে যায়। অবশ্য "চারনামা" নামে হিজরী সপ্তম শতকে একখানি ইতিহাস সদৃশ গল্প-কাহিনীর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের স্থানীয় ইতিহাস রচনার সম্পর্ক ব্যহ্যত ফারেস-এর সহিতই গভীর মনে হয়।

৪। আরবী ও ফারসী ভাষায় ইতিহাস গ্রন্থ রচনার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ফারসী ভাষার গ্রন্থাবলীতে ঐতিহাসিক জীবনালেখ্য রচনার উন্নতির উৎকর্ষ ব্যাপক মাত্রায় হয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিক জীবনালেখ্য রচনার কাজ অপেক্ষাকৃত না হওয়ার মত।[৩৯] তবে কতিপয় ইতিহাসে সাধারণ পদ্ধতিতে মৃত্যুর তারিখ ও জীবনালেখ্যই সংযোজিত হয়েছে। কিম্বা এ ধরণের গ্রন্থাবলীতে ভিন্নতর এক অধ্যায়ে প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ, বিশেষ করে মন্ত্রি, কবি ও গ্রন্থাকারদের সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। এদের পর আসে ওলীগণ ও তাসাউফ সাধকগণের জীবন চরিত্র রচনার পর্যায়। এই জীবন চরিত্রগুলো দু'ভাগে বিভক্ত।

৩৯। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৫৭

Dhaka University Institutional Repository

১. ব্যক্তিগণের জীবন বৃত্তান্ত। এই পর্যায়ে শেখ সফীউদ্দিনের জীবন চরিত্র অধিক উল্লেখ্য। তাওয়াককুল ইব্ন বাজ্জার (মৃঃ ৭৫০ হিঃ/১৩৪৯ খৃঃ) এ গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

২. সাধারণ না বিশেষ গোষ্ঠি বা ধারার লোকদের জীবন কাহিনী "দেবস্তানে হিরাত"-এর দু'জন গ্রন্থকার মন্ত্রীগণের জীবন বৃত্তান্ত এর উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন।[৪০]

ইতিহাসের দর্শন ও বৈজ্ঞানিক ইতিহাস

ইতহাসের সংজ্ঞা তিন ভাগে দেওয়া যেতে পারে। বস্তুত ইতিহাসের সহিত তিনটি ঘনিষ্ঠ সন্নিবিষ্ট ব্যবস্থার সম্পর্ক রয়েছে।

১. ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান। অতীত কালে জীবিত থাকা লোকদের যে অবস্থা বা যে ঘটনার সহিত বর্তমান সময়ের অবস্থা বা ঘটনা কোন সাদৃশ্য বা সম্পর্ক রয়েছে। যে সব ঘটনা পরিস্থিতি বা অবস্থা বর্তমান সময়টিকে দখল করে বসতে পারে ; যে সময়ে তা সংগঠিত হয়েছিল, যে বিষয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, বর্ণনা করা হয়েছে এবং দিবসের ঘটনা হিসাবে দৈনিক পত্রাদিতে বর্ণিত তা ইতিহাস। যখনই সেই সময়টি অতিবাহিত হয়ে গেছে, তখনই তা অতীতের সহিত মিলেমিশে গেছে এবং ইতিহাসের অংশে পরিণত হয়েছে। এ হিসাবে ইতিহাস হচ্ছে অতীত ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান। অতীত কালের লোকদের অবস্থা পরিস্থিতি ও ঘটনা সম্পর্কিত জ্ঞান জীবন বৃত্তান্ত, যুদ্ধের কাহিনী, জয়- পরাজয় এবং এই পর্যায়ের ঘটনাপঞ্জি অতীত বিভিন্ন জাতির লোকদের কর্তৃক সংকলিত বা বর্তমানে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা সব এই পর্যায়ে গণ্য। এ দৃষ্টিতে ইতিহাসঃ

প্রথমত, কোন সুনির্দিষ্ট বিষেয়ে জ্ঞান। তা ব্যক্তিগত ও বিশেষ প্রসঙ্গের উপাখ্যান বা প্রাসঙ্গিক ঘটনা শ্রেণী সম্পর্কিত জ্ঞান। সাধারণ নিয়ম ও সম্বন্ধের ধারাবাহিকতার জ্ঞান নয়।

দ্বিতীয়, তা বর্ণনামূলক কাহিনী ও ঐতিহ্য সমূহের অধ্যয়ন। কোন বুদ্ধিভিত্তিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত জ্ঞান নয়।

তৃতীয়, এ একটা বাস্তব সত্তা being সম্পর্কিত জ্ঞান যা ভবিষ্যতে সংগঠিত হবে (be coming)সে সম্পর্কিত জ্ঞান নয়।

চতুর্থত, তা অতীতের সহিত সম্পর্কিত, বর্তমানের সহিত নয়।

২. যে সব নিয়ম-রীতি বা আইন বিধান অতীত কালের লোকদের জীবন, শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করেছে সেই সব সম্পর্কিত জ্ঞান ও ইতিহাস। অতীত ঘটনাবলীর অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমেই তার সন্ধান পাওয়া যায়। তবে প্রচলিত ইতিহাসের প্রধান উপাদান হচ্ছে অতীত ঘটনা দুর্ঘটনাসমূহ, তাই ইতিহাস অধ্যয়নের প্রাথমিক ও মৌলিক উপকরণ।

৪০। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৫০

Dhaka University Institutional Repository

একজন পদার্থ বিজ্ঞানী তার গবেষণালয়ে বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান এবং আরোহ পদ্ধতিতে তা থেকে সাধারণ নিয়ম আবিষ্কারের লক্ষ্যে যেসব উপদান উপকরণ সংগ্রহ করে ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস অধ্যয়নের জন্য অতীতের ঘটনা দূর্ঘটনাসমূহ অনুরুপ প্রাথমিক ও মৌলিক উপাদান হওয়ার কাজ করে। ইতিহাসবিদ তাঁর এ বিশ্লেষণ ধর্মী চেষ্টা ও প্রচেষ্টা দ্বারা ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রকৃতি, তার কারণগত সম্পর্ক আবিষ্কার এবং অতীত ও বর্তমানের অনুরুপ সব ঘটনার উপর প্রয়োগযোগ্য সব সাধারণ ও বিশ্বজনীন নিয়মও আইন জ্ঞানের স্বচ্ছ পরিসরে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন এ হিসেবে এই চেষ্টা-প্রচেষ্টকে ও উদ্ভাবিত নিয়ম-রীতিকে আমরা বলব বৈজ্ঞানিক ইতিহাস।

যদিও অতীতের ঘটনাবলী ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদিই বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের বিষয়বস্তু ও গবেষণার সামগ্রী কিন্তু তা যেসব নিয়মের সন্ধান পায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা বিশেষভ'বে অতীতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এমনও নয় যে, তা অতীতে সত্য হয়ে থাকলেও বর্তমানে তা সত্য নয়। বরং তা বর্তমানে ও ভবিষ্যতে প্রয়োগিক হওয়ার জন্য অবিশেষ ও সাধারণ হতে পারে। ইতিহাসের ব্যাপারটি (aspect) তাকে অত্যন্ত কল্যাণকর বানাতে পারে, পারে মানুষের নিজ সম্পর্কিত জ্ঞানের একটি সূত্র বানাতে এবং তা পারে নিজের ভবিষ্যত নিয়ন্ত্রণে তাকে সক্ষম করে তুলতে।

বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের তা গবেষকের কাজ এবং পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষকের কাজের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য রয়েছে এবং তা নিঃসন্দেহে লক্ষণীয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গবেষণার তত্ত্ব ও তথ্য প্রকৃত, বাস্তব ও যাঁচাই যোগ্য ব্যাপারাদির অবিচ্ছিন্নতা, ধারাবাহিকতা বর্তমান। তখন তার সমস্ত অনুসন্ধান, তদন্ত, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং ফলাফল সমূহ যেমন- অভিজ্ঞতালব্ধ তেমন যাচাইযোগ্য। কিন্তু একজন ঐতিহাসিক যে বিষয়বস্তু, তত্ত্ব ও তথ্য নিয়ে গবেষণার কাজ করেন, তা সব অতীতের সহিত সংশ্লিষ্ট বর্তমানে সেইগুলো অবস্থিত নয়। একজন ঐতিহাসিকের জন্য বর্তমানে যা সুগম ও সুলভ তা হচ্ছে অতীত সম্পর্কে তথ্যের একটি বস্তু মাত্র। একজন ঐতিহাসিক নিয়ম-রীতির বিচারালয়ে যেন একজন বিচারপতি বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত স্বাক্ষ্য প্রমাণাদি এবং নথি পত্রে সেসব ইশারা ইঙ্গিত (Indication) রয়েছে তারই উপর ভিত্তি করে তাকে রায় দিতে হয়। কোন প্রত্যক্ষদর্শীর ব্যক্তিগত সনদের উপর (Testimony) উপর ভিত্তি করে নয়। এই হিসাবে একজন ঐতিহাসিকের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যুক্তি-বিজ্ঞান সম্মত, বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক এবং মানুসিক যাঁচাইযোগ্য বাহ্যিক সাক্ষ্য প্রমাণ ভিত্তিক নয়। একজন ঐতিহাসিক তার মনের ও বুদ্ধিমত্তা বা মেধার গবেষণালয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ চালায় যুক্তি ও অনুধাবনের হাতিয়ার দ্বারা, বাইরের প্রাকৃতিক গবেষণালয়ে পর্যবেক্ষণ ও পরিবেক্ষণ ও পরিমাপ যন্ত্রের দ্বারা নয়। এই কারণে একজন ঐতিহাসিকের কাজ এবং একজন বিজ্ঞানীর অপেক্ষা একজন দার্শনিকের কাজের মত অনেকটা। বৈজ্ঞানিক ইতিহাস প্রচলিত ইতিহাসের মতই অতীতের সহিত সংশ্লিষ্ট, বর্তমানের সহিত নয়। যা ঘটেছে, ইতিহাস হচ্ছে

Dhaka University Institutional Repository

সেই সম্পর্কিত জ্ঞান, যা ভবিষ্যতে ঘটবে সে সম্পর্ক নয়। তবে প্রচলিত ইতিহাসের মতই তা সাধারণ অবিশেষ, অনির্দিষ্ট। তা বুদ্ধি ভিত্তিক, ঐতিহ্যের উপর ভিত্তিশীল নয়।

৩। ইতিহাসের দর্শন ক্রমিক পরিবর্তন ও রুপান্তর সম্পর্কিত জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। এই পরিবর্তন ও রুপান্তরই সমাজকে এক স্তর থেকে স্তরান্তরে পরিচালিত করেও নিয়ে যায়। সেই সব নিয়ম নিয়ে তার কারবার যা এই পরিবর্তন ও রূপান্তরকে শাসন ও নিয়ন্ত্রন করে। অন্য কথায় ইতিহাস হচ্ছে সমাজ সমূহের গড়ে উঠার বিজ্ঞান। তবে শুধু সমাজসমূহের অবস্থিতিই ইতিহাস নয়।

সমাজসমূহের পক্ষে এক মানে অবস্থিত হওয়া এবং গড়ে উঠা সম্ভব কিনা, এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে এবং সেই অবস্থিত হওয়াটা একটা ব্যবস্থায় বা নিয়মানুবর্তিতার বিষয় হওয়া উচিত। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ইতিহাস আর সমাজসমূহের গড়ে উঠার ব্যাপারটি ভিন্নতর নিয়মানুবর্তিতা বিষয় হওয়া উচিত। এটাই ইতিহাসের দর্শন। এ দুই অসম্ভবের মধ্যে কোন সমন্বয় হওয়া কি সম্ভব নয়। এভাবে যে, অবস্থিতি অবশিষ্টের ইঙ্গিত করে এবং গড়ে উঠা ইঙ্গিত করে গতীশীলতার ? এ দু'টির মধ্য থেকে মাত্র একটিই কি নির্বাচিত ও বাছাই হওয়া উচিত ? আমাদের অংকিত অতীতের সমাজসমূহের ছবি হয় অবস্থিতের হওয়া উচিত, না হয় হওয়া উচিত গড়ে উঠার বিষয়টিকে আরো সাধারণ ও আরও ব্যাপক পরিভাষায় তোলা যেতে পারে, বলা যেতে পারে, সামাগ্রিকভাবে বিশ্বলোক সম্পর্কে আমাদের মানস্পটে অঙ্কিত ছবি তার একটি অংশ হিসেবে একটি সমাজের ছবি হয় স্থিতিশীল হবে, না হয় হবে গতিশীল প্রাণবন্ত (Dynamic)।

বিশ্বলোক কিম্বা সমাজ যদি স্থিতিশীল হয়, তাহলে বুঝা যাবে তা সত্তা সম্পন্ন (being) গঠনমূখী নয়। আর তা যদি গতিশীল ও পরিবর্তনশীল হয়, তাহলে তা গঠনমূখী (Becoming) স্থিতিশীল (being) নয়। এই দৃষ্টিকোণে অধিকাংশ দর্শন চিন্তার বিভক্তি হয়ে থাকে। তাই বলা হয়েছে, দর্শন ব্যবস্থা দু'টি প্রধান অংশে বিভক্ত। একটি (being) সত্তার এর দর্শন, আর অপরটি (Becoming) সত্তার না হওয়া বা গঠনমূখী দর্শন। স্থিতিশীল বা সত্তাবানের দর্শন হচ্ছে এই মত পোষণ যে, সত্তা আর অসত্তা পরস্পর অসংগতি সম্পন্ন বা সামঞ্জস্যহীন। তা সম্ভব ও অসম্ভবের ন্যায় পরস্পর বিরোধী। এটা ধরে নেয়া যে, যদি সত্তা হয় তাহলে অসত্তা হতে পারে না। আর তা যদি অসত্তা (nonbeing) হয়, তাহলে সেখানে সত্তা বলতে কিছু নেই। এই কারণে এই দু'টির বিকল্পের মধ্য থেকে একটিকে বেছে নিতে হবে। সত্তা যেমন অপরিহার্য এবং পৃথিবী সমাজে সত্তা আর কিছু নেই। পৃথিবী নিশ্চলতা ও নিষ্ক্রিয়তা দ্বারা শাসিত। পক্ষান্তরে গঠনমুখী (becoming) এর দর্শন হচ্ছে এ কথা মনে করা যে, সত্তা ও অসত্তা প্রত্যেকটিই একক স্বতন্ত্র মুহূর্তে সহ অবস্থানরত। আর এই জিনিসকেই আমরা গতি

Dhaka University Institutional Repository

বা বলি। 'গতি' বলতে শুধু এই বুঝায় যে, একটি জিনিস আছে এবং ঠিক সেই মুহূর্তে তা নেইও।

এ কারণে অস্তিত্বের দর্শন এবং যা ঘটতে যাচ্ছে অস্তিত্ব সম্পর্কে তার দর্শন এ দু'টি পরস্পর বিপরীত, তাই এ দু'টির মধ্যে থেকে একটিকে বাছাই করে নেওয়ার প্রশ্ন।

আমরা যদি প্রথম মতটির সহিত একাত্ম হই, তাহলে এই ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমুল করে নিতে হবে যে, সমাজের একটা সত্তা বা অস্তিত্ব আছে, তা গঠনমুখী নয়, এখন পূর্ণ পরিণত। পক্ষান্তরে আমরা যদি দ্বিতীয় মতটি গ্রহণ করি, তাহলে ধরে নিতে হবে যে, সমাজ গঠনমুখী, এখনও সত্তা বা অস্তিত্ববান নয়।

পূর্ববর্তী আলোচনার আলোকে ইতিহাসের কোন দর্শন না পেলেও হয় আমরা বৈজ্ঞানিক ইতিহাস পেয়ে যাব কিংবা বৈজ্ঞানিক ইতিহাস ছাড়াই আমরা ইতিহাস পেয়ে যাব। বস্তুতঃ অস্তি ত্ব ও অনস্তিত্ব, গতি ও স্থিতি-গতিহীনতা বিপরীত সমূহের অসংগতি পর্যায়ে পশ্চিমা চিন্তার এটা একটা বিশেষ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অংশ। অস্তিত্ব সম্পর্কিত সমস্যা বিশেষ করে অস্তিত্বের মৌলিকত্ব সংক্রান্ত রহস্যাচ্ছন্ন সমস্যা এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য দার্শনিক বিষয়াদি পাশ্চাত্যের অজ্ঞতা থেকে উৎসারিত।

প্রথমত, ধরা যাক অস্তিত্ব (being) স্থিরতা তূল্যার্থবোধক। অন্য কথায় স্থিরতাই অস্তিত্ব এবং গতি হচ্ছে অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের মধ্যে একটা সমন্বয়। দুই বিপরীতের মধ্যে ঐক্য বিধানের উপায় বা মাধ্যম। মূলত এরুপ ধারণা পাশ্চাত্য দর্শনের কতিপয় চিন্তা কেন্দ্রের (School of thought) বড় বড় ভুলের ফলশ্রুতি।

দ্বিতীয়ত, এখানে যুক্তির ভিত্তিতে যা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তার উপর আলোচিত দার্শনিক সমস্যাদি নিয়ে কিছুই করার নেই। এখানে যে মনোভাব গ্রহণ করা হয়েছে তা এই অনুমান বা প্রকল্পের উপর ভিত্তিশীল যে, সমাজ অপরাপর জীবন্ত জিনিসের মতই দু'টি ভিন্ন ভিন্ন আইনের দ্বারা অনুসরণ করে চলে। একটি আইনরে দ্বারা একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির মদ্যে সীমাবদ্ধ এবং আইনের ধারাটি প্রজাতিসমূহের পরিবর্তন, বিবর্তন এবং সে সবের একটির অপরটিতে রূপান্ত রিত হওয়ার ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত। প্রথম ধরণের আইনকে আমরা বলব অস্তিত্ব সংক্রান্ত আইন (The laws of being) এবং অপরটি (The laws of becoming)[৪১]

৪১। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯-৬২

Dhaka University Institutional Repository

বৈজ্ঞানিক ইতিহাস

পূর্বে আলোচিত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই বৈজ্ঞানিক ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সমাজের একটা বাস্তবতা অবশ্যই আছে, আছে একটা ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তি থেকে স্বতন্ত্র। কেননা সমাজের যদি কোন বাস্তবতা না থাকে যা তার সদস্যদের থেকে স্বতন্ত্র, তা হলে সে জন্য কোন আইন বা বিধান হতে পারে না, হতে পারে শুধু সেই আইন যা ব্যক্তিগণকে নিয়ন্ত্রন করে। ফলে বৈজ্ঞানিক ইতিহাস যা আইন সমূহের বিজ্ঞান এবং সমাজ নিয়ন্ত্রনকারী মৌলনীতিসমূহ তাৎপর্যহীন হয়ে পড়বে। ইতিহাস আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত শাসিত, তা অনিবার্যভাবে ধারণাবদ্ধ অনুসিদ্ধান্ত যে, ইতিহাসের একটা নিজস্ব প্রকৃতি রয়েছে, আর তারই অনুরুপ ধারণা হচ্ছে, একটা নিজস্ব প্রকৃতি ও বাস্তবতা রয়েছে। বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের প্রসঙ্গেই নিম্নোক্ত সমস্যাসমূহ অধ্যয়ন করতে হবে।

১। পূর্বে যেমন বলা হয়েছে, বৈজ্ঞানিক ইতিহাস ঐতিহ্যগত ইতিহাসের উপর ভিত্তিশীল। ঐতিহ্যগত ইতিহাস বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করে। এই কারণেই প্রথমত ঐতিহ্যগত ইতিহাসের বিষয়াবলী বিশ্বাসযোগ্য ও প্রামাণিক কিনা তা ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করার দাবী রাখে। ইতিহাসের বিষয়াবলী নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য না হলে অতীতের সমাজ সমূহ নিয়ন্ত্রনকারী আইন সমূহ সম্পর্কে সমস্ত গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক উৎপত্তি (Inference) নিরর্থক হয়ে যাবে।

২। আমরা এ কথা ধরে নিয়ে অগ্রসর হই যে, ঐতিহ্যগত ইতিহাস বিশ্বাসযোগ্য এবং সমাজের একটা সারবস্তু এবং ব্যক্তিগণ থেকে স্বতন্ত্র একটা ব্যক্তিত্বও রয়েছে, তা হলে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী থেকে অবরোহনমূলক পদ্ধতিতে সাধারণ আইন বের করা এই প্রকল্পের উপর নির্ভরশীল হবে যে, কার্যকরণ বিধি বা কারণগত অদৃষ্টবাদ মানবীয় তৎপরতার জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করে। সে সমস্যাগুলো মানবীয় স্বাধীনতা ও নিজস্ব ইচ্ছার মৌলিকত্বের সহিত জড়িত যা ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মাধ্যমে অভিব্যক্তি হয়েছে। এই কথা মেনে না নিয়ে ইতিহাসের আইনকে না সাধারণ পর্যায়ে নিয়ে আসা যায়, না তথায় সে ধরনের কোন আইনে শৃঙ্খলাবদ্ধ পদ্ধতি থাকতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে কার্যকারণ বিধি কি ইতিহাসের ধারা নিয়ন্ত্রণ করে ? যদি করে তা হলে মানবীয় স্বাধীনতা ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে আমরা কি চিন্তা করব।

৩। ইতিহাস কি প্রকৃতির দিক দিয়ে বস্তুবাদী এবং বস্তুগত শক্তিগুলো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ? মানবীয় ইতিহাসকে যে প্রধান শক্তিটি নিয়ন্ত্রন করে তা কি বস্তুগত শক্তি ? বুদ্ধিভিত্তিক এ আধ্যাত্মিক শক্তিগুলো কি গৌণ? অধীন এবং যে বস্তুগত শক্তিগুলো ইতিহাস গড়ে তারই উপর নির্ভরশীল। বিপরীত দিক দিয়ে ও প্রশ্ন হচ্ছে একথা কি সত্য যে, ইতিহাস আসলেই আধ্যাত্মিক এবং ইতিহাস নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি হচ্ছে আধ্যাত্মিক শক্তি ? বস্তুগত শক্তি সমূহ গৌণ গুরুত্বহীন সহকারী ও অধীন? অন্য কথায় ইতিহাস কি নিজস্ব ভাবে আদর্শবাদী। কিম্বা

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের কোন তৃতীয় কোন বিকল্প মেনে নিতে হবে ? যেমনঃ ইতিহাস অনিবার্যভাবে কোন সংযুক্ত চরিত্রের অধিকার, যা দুই বা ততোধিক শক্তি দ্বারা শাসিত হয়। এটা কি সত্য যে, কতক সংখ্যক বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক শক্তি যা কমবেশী সুসামঞ্জস্য এবং কখনো কখনো দ্বন্দ্ব লিপ্ত, যা একটা পদ্ধতির নির্ভরশীল ইতিহাসকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করে।[৪২]

৪২। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৫-৬৬

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

আল-কুরআনে ইতিহাস বর্ণনার কারণ, গুরুত্ব ও তাৎপর্য

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

আল-কুরআনে ইতিহাস বর্ণনার কারণ, গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আল্লাহ তা'আলার কিতাব। এটি মানুষের হিদায়াতের জন্য নাযিল হয়েছে। মানব জাতির সঠিক পথের দিশা হিসেবে হলেও এতে রয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস-দর্শন, শিল্প-সাহিত্য সবকিছুরই সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা। একজন বিজ্ঞানী যেমন এ থেকে পেতে পারেন বিজ্ঞানের সূত্র ও দিক নির্দেশনা, সাহিত্যিক পেতে পারেন সাহিত্যের উপকরণ, সমাজতত্ত্ববিদ পেতে পারেন সমাজ চিন্তার দিকদর্শন, দার্শনিক পেতে পারেন চিন্তার খোরাক, তেমনি একজন ইতিহাসবেত্তা পেতে পারেন ইতিহাসের উপকরণ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন কোন দিক নেই যা আল-কুরআনে বিবৃত হয়নি। তবে সবকিছুই বর্ণিত হয়েছে দৃষ্টান্ত হিসেবে ইঙ্গিতময় ভাষায়। গভীর অভিনিবেশের সাথে কুরআন অধ্যয়ন করে সমস্ত বক্তব্য একত্রে সন্নিবেশিত করা হলে এ থেকে যেমন বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও মানব সমাজের উত্থান-পতন ও সৃষ্টিজগত সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। তেমনি কুরআনে বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে একত্রিত করলে অতীত মানব জাতীর ইতিহাসেরও একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়।[১]

সন্দেহ নেই কুরআনের সহিত ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণের গভীর সু-সম্পর্ক রয়েছে। যে সূরাই পাঠ কর, দৃষ্টি নিবদ্ধ কর যে পৃষ্ঠারই উপর, সেখানেই এইসব বিষয়ের প্রতি সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত বর্ণনা ও ইশারা-ইঙ্গিত দৃষ্টি গোচর হবে। যা সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক নীতি স্পষ্ট করে তোলে । কুরআন মাজীদে বর্ণিত অতীত জাতি গোষ্টীর কিস্‌সা-কাহিনী ও পর্যবেক্ষণসমূহ শুধুমাত্র মানসিক আনন্দ-ফুর্তি লাভ; কিম্বা কিস্‌সা-কাহিনী, অবস্থা চিত্র ও পর্যবেক্ষণাদির প্রতি ঈমানদার লোকদের যে একটা প্রয়োজনবোধ রয়েছে, তা চরিতার্থতার জন্যই উদ্ধৃত হয়নি। উচ্চতর পর্যায়ের নিছক চিন্তা-গবেষণার চর্চা তাঁদের উদ্বুদ্ধ করাও এসবের লক্ষ্য নয়। কেননা সেসবের গভীরে যে, তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। তা উদ্ধার করা না হলে, কিম্বা সে দিকে ভ্রুক্ষেপ না করলে, সে সবের সত্যিই কোন মূল্য থাকে না। কুরআন যে সব ঐতিহাসিক ঘটনা ও কাহিনীর উল্লেখ করেছে কেবল মাত্র এ উদ্দেশ্যে যে, মানুষ ইসলাম নির্ধারিত লক্ষ্যের দিকে গতিশীল হবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে নিজের সত্ত্বাকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে

১। ড. মাযহার উদ্দিন সিদ্দিকী, সিরাজ মান্নান অনুদিত, *কুআনের ইতিহাস দর্শন,*ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

অতীতের শত শত জনগোষ্ঠী-সমাজ ও জাতি কর্তৃক অবলম্বিত বিপর্যয় ও খারাপ পথ অনুসরণের পরিণতি থেকে নিজেদেরকে পুরামাত্রায় রক্ষা করবে। এসব কাহিনী যেন মানুষকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলে, "হে মানুষ দুনিয়ার জীবন-যাপন ও যাবতীয় কর্মসাধনের জন্য দু'টি মাত্র পথ তোমার সামনে রয়েছে। এ ছাড়া তৃতীয় কোন পথ নেই। এ দু'টির মধ্য থেকে যে কোন একটি তুমি বাছাই করে গ্রহণ করতে পার। তবে বাছাই করে যে পথটি-ই তুমি গ্রহণ করবে, সেই পথের অনিবার্য পরিণতি ভোগ করার জন্য তোমাকে সর্বোতভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। [২]

বস্তুত কুরআনের উদ্ধৃত ঐতিহাসিক জাতি গোষ্ঠী সমূহের কাহিনী বর্ণনার লক্ষ্য হচ্ছে মানব সমাজে গতিশীল আন্দোলনের সৃষ্টি করা। যেখানেই এবং যখনই কুরআন অধ্যয়ন ও অনুসরণ করা হবে,কুরআনে উল্লেখিত যেসব কাহিনী মানুষকে যথার্থ লক্ষ্যপানে অগ্রসর হওয়ার জন্য তৎপর বানাবে। সমকালীন আদর্শসমূহ এবং সে সবের কার্যসূচী ও পরিকল্পনাসমূহ কোন না কোনভাবে মানবীয় ইতিহাসের সুদীর্ঘ পরিক্রমায় নিঃসৃত শিক্ষার সহিত সঙ্গতি সম্পন্ন।[৩]

কুরআনে তাই বলা হয়েছে ঃ

"তোমাদের পূর্বে অনেক বছর, অনেক কাল যুগ ও জাতিসমূহ অতীতের গর্ভে চলে গেছে। অতএব, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং আল্লাহ্‌র দ্বীন অমান্যকারীদের পরিণতি প্রত্যক্ষ কর। এতে লোকদের জন্য সুস্পষ্ট বর্ণনা হেদায়াতের উৎস এবং আল্লাহ্‌ভীরু লোকদের জন্য মহামূল্যবান নসীহত আছে। আর তোমরা সাহসহীন হয়ে পড়ো না, দুশ্চিন্তাক্লিষ্ট হবে না, তোমরা বিজয়ী সর্বোচ্চ স্থানে আসীন হবে, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো।" [৪]

তাইতো কুরআনের বহুসংখ্যক আয়াতেই তাকীদ সহকারে বলা হয়েছে যে, মানবীয় ইতিহাস নিয়ে চিন্তা-বিবেচনা, আলোচনা-পর্যালোচনা করা ও উল্টিয়ে পাল্টিয়ে তার নানাদিক দেখা ও বুঝতে চেষ্টা করা বস্তুতই একটি ইতিবাচক চেষ্টা। এতে তারা ইতিহাসের সারনির্যাস ও গভীরতার তাৎপর্য লাভ করতে সক্ষম হবে, চলতে পারবে তার প্রদর্শিত পথে। [৫]

২। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২-২২৩

৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩-২২৪

৪। قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ . هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ
আল-কুরআন, ৩ : ১৩৮-১৩৯

৫। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫১

Dhaka University Institutional Repository

" এই হচ্ছে ওদের বসবাসের ঘর বাড়ী সব বিধ্বস্ত হয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তাদের নিজেদেরই যুলুমমূলক কার্যকলাপের পরিণতিতে। নিঃসন্দেহে এতে জ্ঞানবান জনগণের জন্য বহু মূল্যবান নিদর্শন রয়েছে।"[৬]

"তারা সেসব জনপদে এসে উপস্থিত হয়েছে যার উপর অত্যন্ত খারাপ ও নিকৃষ্ট ধরনের বৃষ্টি হয়েছিল। তারা কি সেখানকার অবস্থা দেখতে পায়নি ? আসলে তারা মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানের কোন আশাই পোষণ করে না।"[৭]

"আমরা সুস্পষ্ট ভাষায় হেদায়াত সম্পন্ন আয়াত তোমাদের প্রতি নাযিল করেছি, আর সেই জাতিগুলোর শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্তসমূহও আমরা তোমাদের সম্মুখে পেশ করেছি, যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়ে গিয়েছে। সেই নসীহতও করেছি, যা খোদাভীরু লোকদের জন্য কল্যাণ কর।"[৮]

"আমরা এ জনপদের উপর আসমান থেকে আযাব নাযিল করব, সেই ফাসেকী সীমালংঘনমূলক কার্য কলাপের দরুণ, যা এরা করে। আর আমরা এ জনদপটির একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন রেখে দিয়েছি। সেই লোকদের জন্য যারা বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়"।[৯]

"এই লোকদের সামনে অতীত জাতিসমূহের সেই অবস্থা সক্রান্ত খবর এসেছে, যাতে আল্লাহ্ দ্রোহিতা থেকে বিরত রাখার জন্য বহু শিক্ষাপ্রদ উপকরণই নিহিত রয়েছে এবং এমন বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিও রয়েছে যা উপদেশ দানের উদ্দেশ্যকে পূর্ণমাত্রায় পূরণ করে দেয়। কিন্তু সাবধান সতর্কবাণী তাদের উপর কার্যকর হয় না।"[১০]

৬। فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

আল-কুরআন, ২৭ : ৫২

৭। وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا

আল-কুরআন, ২৫ : ৪০

৮। وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ

আল-কুরআন, ২৪ : ৩৪

৯। إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ . وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

আল-কুরআন, ২৯ : ৩৪-৩৫

১০। وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ . حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ

আল-কুরআন, ৫৪ : ৪-৫

Dhaka University Institutional Repository

" পানির উচ্ছসিত স্রোত যখন সীমালংঘন করে গেল,তখন আমরা তোমাদেরকে নৌকার আরোহী বানিয়ে একটি শিক্ষাপ্রদ স্মারক বানিয়ে দিতে পারি এবং স্মরণবাহক কান যেন এই স্মৃতিকে সংরক্ষিত করে রাখে।"[১১]

" শেষকালে আল্লাহ্ তাকে পরকাল ও দুনিয়ার আযাবে পাকড়াও করলেন। বস্তুতঃ এমন প্রত্যেক লোকের জন্য তাতে বড় শিক্ষণীয় উপদেশ রয়েছে। যারা বাস্তবিকই ভয় পায়"। [১২]

" কত অপরাধী জনপদই এমন যাদের আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি, আর আজ তারা নিজেদের ছাদের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। কত কূপ অকেজো এবং কত গ্রামই ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়ে আছে। এই লোকেরা কি যমিনে চলাফেরা করে না ? তাহলে তাদের হৃদয় বুঝতে পারত এবং তাদের কান শুনতে পেত। আসল কথা হচ্ছে, চক্ষু কখনো অন্ধ হয় না, অন্ধহয় সেই হৃদয় যা বুকের মধ্যে অবস্থিত।" [১৩]

" এই লোকেরা কি কখনো লক্ষ্য করে দেখেনি, আল্লাহ্ কিভাবে সৃষ্টি কর্ম শুরু করেন। পরে আবার সেই জিনিসেরই পুনরাবৃত্তি করেন ? নিঃসন্দেহে এই পুনরাবৃত্তি আল্লাহ্র পক্ষে সহজ সাধ্য কাজ। ওদের বল তোমরা পৃথিবীতে চলাফেরা কর, আর অভিনিশ সহকারে দেখ, তিনি কিভাবে সৃষ্টির সূচনা করেন,পরে সেই আল্লাহ্-ই দ্বিতীয় বার তাকে জীবন দান করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু করতে সক্ষম।"[১৪]

১১। إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ

আল-কুরআন, ৬৯ : ১১-১২

১২। فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى .

আল-কুরআন, ৭৯ : ২৫-২৬

১৩. فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ . أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ .

আল-কুরআন, ২২ : ৪৫-৪৬

১৪। أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ . قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ.

আল-কুরআন, ২৯ : ১৯-২০

Dhaka University Institutional Repository

এরুপ আরো বহু সংখ্যক আয়াতে তাকীদ করে বলা হয়েছে যে, ইতিহাস আল্লাহর "সুন্নাত"নিয়ম-রীতি চিরন্তন ও শাশ্বত। বহু সংখ্যক বিভ্রান্ত ও আদর্শচূত মানব সমাজের উপরই তা কার্যকর হয়ে এসেছে। এ মর্মে আল্লাহর বাণীগুলোঃ

"এ লোকেরা কি যমীনে কখনো চলা ফিরা করেনি ? তাহলে তারা অবশ্যই দেখতে পেত তাদের পূর্বে অবস্থানকারী লোকদের পরিণতি কি হয়েছে। তারা তো এদের তুলনায় অনেক বেশী বিরাট নিদর্শন যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছে। কিন্তু তাদের গুনাহের পাকড়া থেকে তাদের রক্ষা করার কেউ ছিল না। তাদের এ মর্মান্তিক পরিণতি হলো এজন্য যে, তাদের জন্য তাদের প্রেরিত রাসূলগণ তাদের নিকট সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমানাদি নিয়ে এসেছিল। কিন্তু তারা তো মেনে নিতে অস্বীকার করল। তখন আল্লাহ্ তাদের পাকড়াও করেছিলেন বস্তুত তিনি তো বড় শক্তিমান, কঠোর ও কঠিন শাস্তিদাতা"।[১৫]

"এখন কি আমরা তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তোমাদের নিকট সেই যিকর, উপদেশ, নসীহত পাঠানো বন্ধ করে দিব শুধু এই কারণে যে, তোমরা সীমালংঘনকারী লোক ? আগের কালের জাতিগুলোর নিকটও আমরা বারে বারে নবী পাঠিয়েছি। এমন কখনো হয়নি যে, কোন নবী তাদের নিকট আসল, আর তারা তাদের ঠাট্টা ও বিদ্রুপ করেনি। পরে তাদের যারা অনেক গুণ বেশী শক্তিশালী ছিল, তাদেরকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। অতীত জাতিসমূহের অবস্থা এমনি চলে গেছে।"[১৬]

" হে নবী ! কত জনপদই এমন বিলীন হয়ে গেছে যেগুলো তোমার সে জনপদ থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল। যারা তোমাকে বহিঃস্কৃত করেছে। আমরা তাদেরকে এমনভাবে ধ্বংস করেছি যে, তাদের এ ধ্বংস থেকে রক্ষা করার জন্য কোন সাহায্যকারীই ছিল না।"[১৭]

১৫। أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ

আল-কুরআন, ৪০ : ২১-২২

১৬। وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ . وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ .. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ

আল-কুরআন, ৪৩ : ৫-৭

১৭। وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ

আল-কুরআন, ৪৭ : ১৩

Dhaka University Institutional Repository

"এদের পূর্বে বহুসংখ্যক জাতিগোষ্ঠীকে আমরা ধ্বংস করেছি। তারা এদের অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল। আর দুনিয়ার দেশ সমূহকে তারা ছেঁকে লুটে পুটে নিয়েছিল। চিন্তা কর, তারা কি শেষে কোন আশ্রয়স্থল পেয়েছিল ? এ ইতিহাসে অত্যন্ত শিক্ষামূলক স্মারক রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যার হৃদয় আছে, কিম্বা যে খুব মনযোগ সহকারে কথা শুনে।"[১৮]

"এ লোকেরা কি কখনো যমীনে চলে ফিরে বেড়ায়নি ? তাহলে তারা সেই লোকদের পরিণাম দেখতে পেত যারা তাদের পূর্বে চলে গিয়েছে। তারা এদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল। তারা যমীনকে খুব ভালভাবে কর্ষণ করেছিল এবং যমীনকে তারা এতখানি আবাদ করেছিল, যতটা এরা করতে পারেনি, তাদের নিকট তাদের প্রতি প্রেরিত রাসূল উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তো তাদের প্রতি যুলুমকারী ছিলেন না, তারা নিজেরা-ই নিজেদের উপর যুলুম করেছিল।"[১৯]

"অথচ তাদের পূর্বে আমরা এমন কত জাতিকেই না ধ্বংস করেছি, যারা এদের অপেক্ষা অধিক সাজ-সরঞ্জামের অধিকারী ছিল এবং বাহ্যিক সৌন্দর্য ও চাকচিক্য এদের তুলনায় অগ্রসর ছিল।"[২০]

"অতঃপর আদ জাতি পৃথিবীতে অহংকারী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের কোন অধিকার না থাকা সত্ত্বেও। ওরা বলেছিল, আমাদের চেয়ে অধিক কঠিন শক্তির অধিকারী কে আছে ? ওরা কি দেখেনি, যে আল্লাহ্-ই ওদের সৃষ্টি করেছেন, শক্তির দিক দিয়ে তিনিই তো অনেক বেশী, অথচ ওরা আমাদের আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল।"[২১]

১৮। وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ .

আল-কুরআন, ৫০ : ৩৬-৩৭

১৯। أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ .

আল-কুরআন, ৩০ : ৯

২০। وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا

আল-কুরআন, ১৯ : ৭৪

২১। فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ

আল-কুরআন, ৪১ : ১৫

Dhaka University Institutional Repository

" ওরা উত্তম, না তুববা জাতি ও তাদের পূর্বগামী লোকেরা ? আমরা তো তাদেরকে এই কারণে ধ্বংস করেছি যে, তারা ছিল অপরাধী জনগোষ্ঠি।"[২২]

"ওদের পূর্বে চলে যাওয়া লোকেরা অবিশ্বাস করেছে। আমরা যা কিছু ওদেরকে দিয়ে ছিলাম তার দশ ভাগের এক ভাগও তারা পৌছতে পারেনি। কিন্তু তারা যখন আমার রাসূলগণকে অগ্রাহ্য করেছিল, তখন দেখ আমার আযাব কতনা কঠোর ও কঠিন ছিল।"[২৩]

" এরা পৃথিবীতে চলা ফিরা করে দেখেনি কি ? তাহলে এদের পূর্বের যেসব লোক অতীত হয়ে গেছে এবং যারা এদের চাইতে অধিক শক্তিশালী ছিল তাদের যে, পরিণতি হয়েছে, তা তারা প্রত্যক্ষ দেখতে পেত। কোন জিনিসই আল্লাহ্ তা'আলাকে অক্ষমকরে দিতে পারে না, না আকাশ মন্ডলে না পৃথিবীতে। তিনি সব কিছুই জানেন ও সব জিনিসের উপরই তিনি ক্ষমতাশালী।"[২৪]

উদ্ধৃত আয়াতসমূহে দু'টি শব্দ বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। একটি قوة শক্তি (strength, power, ability) আর দ্বিতীয়টি بطس (prowers) পরাক্রম, পৌরুষ, কৃতকার্যতা, দক্ষতা। কিন্তু এ শক্তি মহান আল্লাহ্র শক্তির মুকাবিলায় খুবই তুচ্ছ, নগণ্য। যা অতীতের বিপুল সংখ্যক সমাজ ও জনগোষ্ঠীর উত্থান, পতন, উন্নতি, অগ্রগতি ও শেষ পরিণতির মাধ্যমে অনুধাবন করা যায়। সুতরাং উদ্ধৃত আয়াতগুলো যা অতীত জাতিসমূহের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে তা এমন এক বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছে যা থেকে শিক্ষা নিয়ে মহান আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে হিদায়াতের অনুগামী হতে আহবান যানাচ্ছে। [২৫]

এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, ইতিহাস বা কিস্সা কাহিনী বর্ণনা করা আল-কুরআনের মূল উদ্দেশ্য নয়। আল-কুরআন দ্বীনি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আনুসাঙ্গিক যেসব উপকরণ গ্রহণ করেছে ঘটনাবলী সেসব উপকরণের অন্যতম একটি উপকরণ।[২৬]

২২। أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

আল-কুরআন, ৪৪ : ৩৭

২৩। وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ

আল-কুরআন, ৩৪ : ৪৫

২৪। أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا.

আল-কুরআন, ৩৫ : ৪৪

২৫। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭

২৬। সাইয়্যেদ কুতব, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

কুরআনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে দাওয়াতে দ্বীন এবং কাহিনী চিত্র হচ্ছে ঐ দাওয়াতকে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় মানুষের নিকট পৌছানোর একটি মাধ্যম মাত্র। কুরআন যে, উদ্দেশ্যে কিয়ামত ও আখিরাতে সাওয়াবের চিত্র তুলে ধরেছে, যে উদ্দেশ্যে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের তথ্য পেশ করেছে, যে উদ্দেশ্যে শরী'আতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য উদাহরণ উপমা বর্ণনা করেছে ঠিক সেই একই উদ্দেশ্যে কাহিনীচিত্রও উপস্থাপন করেছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বীনি দাওয়াতকে মানুষের নিকট হৃদয়গ্রাহী করে পৌঁছে দেয়া।

কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলী ও তার বিষয়বস্তু নিজস্ব পদ্ধতিতে এবং নিখুঁতভাবে উদ্দেশ্যকে পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। তাই বলে দ্বীনি উদ্দেশ্যের অধীন হওয়ার অর্থ এই নয় যে, ঘটনাবলী উপস্থাপনের সময় শৈল্পিক দিকটির প্রতি লক্ষ্যই রাখা হবে না; বরং ঘটনাবলী দ্বীনি উদ্দেশ্যকে পুরো করার সাথে সাথে শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যসমূহও ধারণ করেছে। প্রকৃত পক্ষে আল-কুরআনের বর্ণনা ও উপস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ উপকরণই হচ্ছে চিত্রায়ন। যা বর্ণনার অপরিহার্য অঙ্গ বিশেষ।[২৭]

আল-কুরআনে বর্ণিত ইতিহাসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একমাত্র দ্বীনি উদ্দেশ্যকে পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন জাতির ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। সেই দ্বীনি উদ্দেশ্যের গন্ডি বড় বেশী প্রশস্ত। তাই আল-কুরআন সমস্ত দ্বীনি উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার জন্যই ঘটনাসমূহ বর্ণনা করেছে। যেমন ওহী ও রিসালতের স্বীকৃতি, তাওহীদ, বিভিন্ন নবীদের দ্বীন এক,সমস্ত নবীদের সাথে আচরণের পদ্ধতি এক ও অভিন্ন, কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ভাল ও মন্দের অনেক উদ্দেশ্যকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কুরআন কাহিনী চিত্রের সাহায্য নিয়েছে।[২৮]

২৭। সাইয়েদ কুতুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

২৮। সাইয়েদ কুতুব, *আল কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলী,* ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ. ১৮৬

Dhaka University Institutional Repository

ওহী ও রিসালাতের স্বীকৃতি

আমরা আল-কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করবো। আল-কুরআনে ঘটনাসমূহ বর্ণনা করার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে ওহী ও রিসালাতের স্বীকৃতি এবং তার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের যুক্তি উপস্থাপন করা।

উল্লেখ্য, নবী করিম (সঃ) প্রচলিত অর্থে কোনো লেখাপড়া জানতেন না। এমন কি ইয়াহুদী কিংবা খৃষ্টান কোন 'আলিমের সাথেও তার কোন সম্পর্ক ছিলো না। যাতে তিনি কুরআনের মাধ্যমে এমন কিছু বর্ণনা করতে পারেন। অনেক ঘটনাতো তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন, কোনো কোনোটি আংশিক যেমন ঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত ইউসুফ (আঃ), হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনা। কুরআনে এসব ঘটনার আলোচনা এ কথাই প্রমাণ করে যে, এগুলো তাকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে। কুরআন তো এ ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে।[২৯]

যেমন ঃ সূরা ইউসূফের শুরুতেই বলা হয়েছে ঃ "আমি এ কুরআনকে আরবীতে অবতীর্ণ করেছি যেন তোমরা বুঝতে পারো।"[৩০]

" আমি তোমার নিকট একটি উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি। যেভাবে আমি এ কুরআনকে তোমার নিকট অবতীর্ণ করেছি। অবশ্য তুমি পূর্বে অনবহিতদের অন্তর্ভূক্ত ছিলে।"[৩১]

সূরা কাছাছে হযরত মুসা (আঃ) এর ঘটনা বর্ণনার পূর্বে বলা হয়েছে ঃ

" আমি তোমার কাছে মূসা ও ফির'আউনের ঘটনাবলী যথাযথভাবে বর্ণনা করেছি ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য।"[৩২]

২৯। সাইয়্যেদ কুতুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

৩০। انا انزلنه قرءنا عربيا لعلكم تعقلون .
আল-কুরআন, ১২ : ২

৩১। نحن نقص عليك احسن القصص .... لمن الغافلين .
আল-কুরআন, ১২ : ৩

৩২। نتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون .
আল-কুরআন, ২৮ : ২

Dhaka University Institutional Repository

যেখানে এ ঘটনা শেষ করা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে ঃ " মূসাকে যখন আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম,তখন তুমি পশ্চিম প্রান্তে ছিলে না এবং তা তুমি প্রত্যক্ষও করোনি। কিন্তু আমি অনেক জাতি সৃষ্টি করেছিলাম এবং তাদের অনেক যুগ অতিবাহিত হয়েছে। আর তুমি মাদাইয়ানবাসীদের মধ্যেও ছিলেনা, যখন তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হতো। কিন্তু আমিই ছিলাম রাসূল প্রেরণকারী। আমি যখন মূসাকে আওয়াজ দিয়েছিলাম,তখন তুমি তুর পর্বতের পাশে ছিলে না। কিন্তু এটি তোমার পালনকর্তার রহমত স্বরুপ। যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে ভীতি প্রদর্শন করতে পারো, যাদের কাছে ইতোপূর্বে আর কোন ভীতি প্রদর্শনকারী আসেনি। যেন তারা স্মরণ রাখে।"[৩৩]

হযরত মারইয়াম(আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে সূরা আল-ইমরানে বলা হয়েছে ঃ "এ হলো গায়েবী সংবাদ যা আমি তোমাকে প্রদান করে থাকি। আর তুমিতো সেসময় ছিলে না যখন তারা প্রতিযোগিতা করেছিল, কে মারইয়ামের অভিভাবকত্ব লাভ করবে। আর তখনও তুমিছিলে না, যখন তারা ঝগড়া-বিবাদ করছিল।"[৩৪]

হযরত আদম (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনার পূর্বে সূরা সা'দ এ বলা হয়েছে ঃ " বলো এটি মহাসংবাদ, যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ, উর্ধ্বজগত সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞানছিল না, যখন ফেরেশতারা কথাবার্তা বলছিল, আমার কাছে এ ওহী-ই আসে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।"[৩৫]

সূরা হুদে নূহ (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে ঃ " এটি গায়েবের খবর, আমি তোমাকে ওহীর মাধ্যমে জানাচ্ছি। ইতোপূর্বে এটি তোমার জাতির জানা ছিলো না।" [৩৬]

৩৩। وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ . وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ . وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ .
আল-কুরআন, ৪১ : ৪৪-৪৬

৩৪। ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ
আল-কুরআন, ৩ : ৪৪

৩৫। قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ . أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ . مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ . إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ . إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ
আল-কুরআন, ৩৮ : ৬৭-৭১

৩৬। تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ
আল-কুরআন, ১১ : ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

এক ও অভিন্ন দ্বীন

আল-কুরআনে একথা সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, সকল দ্বীনই আল্লাহ্ থেকে প্রাপ্ত। ঈমানদারগণ এক উম্মত বা দল। আর আল্লাহ্ সবার প্রতিপালক। আল-কুরআনের অনেক জায়গায় বিভিন্ন নবীদের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। সমস্ত নবীদের দীনও যে, এক এবং অভিন্ন একথা বলাও ইসলামের দাওয়াতের উদ্দেশ্য। এজন্য সামান্য রদবদল করে নবীদের কাহিনী আল-কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বারবার বলা হয়েছে। যেন মানুষ বুঝতে পারে, সমস্ত নবী ও রাসূলগণ একই দায়িত্ব নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন।[৩৭] নিচে আমি কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। আল্লাহর বাণীঃ

" আমি মূসা ও হারুনকে দান করেছিলাম মীমাংসাকারী গ্রন্থ আলো ও উপদেশ, আল্লাহ-ভীরুদের জন্য। যারা না দেখেই তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে এবং কিয়ামতের ভয়ে শংকিত হয়।"[৩৮]

"এটি কল্যাণকর নসীহত, যা আমি অবতীর্ণ করেছি, তবু কি তোমরা তা অস্বীকার করবে ? আর আমি ইতোপূর্বে ইব্রাহীমকে সত্যাশ্রয়ী করেছিলাম এবং আমি তাঁর সম্পর্কে অবহিত ছিলাম। যখন তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ এ মূর্তিগুলো কি ? তোমরা যাদের পূঁজারী হয়ে বসে আছো ?"[৩৯]

" আমি তাঁকে (ইব্রাহীম) ও লূতকে উদ্ধার করে সেই দেশে পৌঁছে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্বের জন্য কল্যাণ রেখেছি। আমি দান করলাম ইসহাক এবং পুরস্কার স্বরূপ দিলাম ইয়াকুবকে এবং প্রত্যেককেই সৎকর্মশীল বানালাম। আমি তাদেরকে নেতা করলাম। তারা আমার নির্দেশ অনুযায়ী পথ প্রদর্শন করতো। আমি তাদের প্রতি ওহী নাযিল করতাম, সৎ কাজ করার, নামায কায়েম করার ও যাকাত আদায়ের জন্য। তারা আমার ইবাদাতে মশগুল ছিল।"[৪০]

৩৭। সাইয়্যেদ কুতুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

৩৮। الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ

আল-কুরআন, ২১ : ৪৮-৪৯

৩৯। وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ . إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ .

আল-কুরআন, ২১ : ৫০-৫২

৪০। وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ . وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ .
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ .

আল-কুরআন, ২১ : ৭১-৭৩

Dhaka University Institutional Repository

" আর ইসমাঈল, ইদ্‌রীস ও যুলকিফলের কথা স্মরণ কর, তাঁরা প্রত্যেকেই ছিল সবরকারী। আমি তাদেরকে আমার রহমত প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত করেছিলাম। তাঁরা সবাই ছিল সৎকর্মশীল।" [৪১]

"এবং মাছ ওয়ালার কথা স্মরণ কর, সে ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিল আর মনে করেছিল যে, আমি তাঁকে পাকড়াও করতে পারবো না। অতঃপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করলো; তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তুমি নির্দোষ আমি গুণাগার তারপর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাঁকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। এমনভাবে বিশ্বাসীদের মুক্তি দিয়ে থাকি।"[৪২]

"আর যাকারিয়ার কথা স্মরণ কর, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা রেখো না, তুমি তো উত্তম ওয়ারিশ, অতঃপর আমি তাঁর দো'আ কবুল করেছিলাম এবং আমি তাঁকে ও তাঁর পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্য নিদর্শন বানিয়ে ছিলাম।" [৪৩]

"আর সেই নারীর কথা স্মরণ কর, যে, তাঁর কাম প্রবৃত্তিকে বশে রেখেছিল। অতঃপর আমি তাঁর মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাঁকে ও তাঁর পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্য নিদর্শন বানিয়েছিলাম।[৪৪]

৪১। وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ . وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ .
আল-কুরআন, ২১ : ৮৫-৮৬

৪২। وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ . فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
আল-কুরআন, ২১ : ৮৭-৮৮

৪৩। وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ . فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ .
আল-কুরআন, ২১ : ৮৯-৯০

৪৪। وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ .
আল-কুরআন, ২১ : ৯১

Dhaka University Institutional Repository

দ্বীন, নবী-রাসূল এবং তাঁদের দাওয়াতের অভিন্নতা

আল-কুরআনে বিভিন্ন জাতি ও জনপদের ইতিহাস বর্ণনার অন্যতম কারণ দ্বীন, নবী-রাসূল এবং তাদের দাওয়াতের অভিন্নতা এবং প্রতিটি নবী-রাসূলের সাথে কাফির মুশরিকদের এক ও অভিন্ন আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা। আল-কুরআনের ঘটনাবলীতে যে বক্তব্যটি স্পষ্ট হয়ে উঠে, তা হচ্ছে প্রত্যেক নবী ও রাসূলের দ্বীন ছিল এক এবং তাঁরা প্রত্যেকে একই দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। আবার প্রত্যেক নবীর জাতি যারা একমাত্র দ্বীনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে মনে হয় তা একই সুতোয় গাঁথা। নবীগণ যখনই এসেছেন তখনই সেই গোষ্ঠীর মোকাবেলা করতে হয়েছে। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে মনে হয় এরা ভিন্ন ভিন্ন জাতি নয় বরং একই জাতি। তদ্রুপ মিথ্যে প্রতিপন্নকারীরাও দীর্ঘ সময় ও অবস্থার ব্যবধানেও মনে হয় সকলে একই মানসিকতার অধিকারী। প্রত্যেক নবী এসেছেন এবং কালিমার দাওয়াত দিয়ে পৃথিবী থেকে চলে গিয়েছেন। আর গুমরাহ মানুষগুলো সব সময়ই তাদেরকে মিথ্যেবাদী বলেছে এবং তাঁদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে।[৪৫]

নিচের আয়াতগুলো লক্ষণীয়:

"আমি নূহ কে তাঁর জাতির নিকট পাঠিয়েছি তিনি বললেন! হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি তোমাদের জন্য এক মহাদিবসের শাস্তির ভয় করি। তার জাতির সর্দাররা বললোঃ হে আমার জাতি! আমি কখনোই গোমরাহ নই, আমিতো রাব্বুল আলামিনের রাসূল। তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছিয়ে দেই এবং তোমদেরকে সদুপদেশ দেই। আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব জিনিস জানি যা তোমরা জান না। তোমরা কি আশ্চার্য হয়ে যাচ্ছ যে, তোমদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদেরই এক ব্যক্তি উপদেশ নিয়ে এসেছে যা সে তোমদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে যেন, তোমরা সংযত হও এবং অনুগৃহীত হও। অতঃপর তারা তাকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করল। আমি তাকে এবং জাহাজের আরোহীদেরকে রক্ষা করলাম আর যারা মিথ্যে প্রতিপন্ন করেছিলো তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। নিশ্চয় তারা ছিল অন্ধ।"[৪৬]

৪৫। সাইয়্যেদ কুতুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

৪৬। لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ . قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ . قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ . أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ . أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ . فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ .

আল-কুরআন, ৭ : ৫৯-৬৪

Dhaka University Institutional Repository

"আদ জাতির কাছে তাদের ভাই হুদকে পাঠিয়েছি। সে বললোঃ হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই। তার জাতির নেতৃস্থানীয় লোকেরা বললোঃ আমরা দেখছি তুমি একজন নির্বোধ, আর আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায় আমি মোটেই নির্বোধ নই বরং আমি রাব্বুল আলামিনের পয়গাম্বর। তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছে দেই এবং আমি তোমদের হিতাকাংখী বিশ্বস্ত। তোমরা আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছ এ কারণে যে তোমদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এবং তোমাদেরই এক ব্যক্তি উপদেশ নিয়ে এসেছে যেন সে তোমদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে। তোমরা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে নূহের জাতির উপর নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং দেহাকৃতিও বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। তোমরা আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ কর যাতে তোমাদের মঙ্গল হয়।" [৪৭]

৪৭। وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ .
قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ .
قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

আল-কুরআন, ৭ : ৬৫-৬৭

Dhaka University Institutional Repository

"সামুদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছি। তিনি বললেনঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তোমদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ এসে গেছে। এটি আল্লাহর উটনী। অতএব, একে ছেড়ে দাও, আল্লাহর জমিনে চড়ে বেড়াবে। অসৎ উদ্দেশ্যে একে স্পর্শও করবে না। নইলে তোমদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে। স্মরণ করো, তোমাদেরকে আদ জাতির পরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তোমদেরকে পৃথিবীতে ঠিকানা দিয়েছেন। তোমরা নরম মাটিতে অট্টালিকা নির্মাণ কর এবং পর্বত-গা খোদাই করে প্রকোষ্ট নির্মাণ কর। অতএব, তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্বীকার কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক নেতৃবৃন্দ দরিদ্র ঈমানদারকে জিজ্ঞেস করলোঃ তোমরা কি বিশ্বাস করো সালেহ কে তার পালনকর্তা প্রেরণ করেছেন ? তারা বললোঃ আমরা তো তাঁর আনীত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসী। অহংকারীরা বললঃ তোমরা যে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছো আমরা তা বিশ্বাস করি না। তারপর তারা উটনীকে হত্যা করে ফেললো এবং স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করল। তারা আরো বললঃ হে সালেহ ! নিয়ে এসো তোমার সেই শাস্তি যার ভয় আমাদেরকে দেখাচ্ছো। যদি তুমি রাসূল হয়ে থাক। অতঃপর তাদেরকে পাকড়াও করলো ভূমিকম্প। ফলে সকাল বেলায় নিজ নিজ গৃহে তারা মুখ থুবড়ে পড়ে রইল।[৪৮]

৪৮। وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ . قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ . قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ . فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ . فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ .

আল-কুরআন, ৭ : ৭৩-৭৮

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনের যেখানেই এ ধরনের দৃশ্যের পুনারাবৃত্তি ঘটছে সেখানে সকল নবী-রাসূলের সাথে মিলে যায়। এ অবস্থা প্রত্যেক নবীর সময়ই চলেছে। চলতে চলতে অবশেষে মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত এসে পৌছেছে। কল্পনার চোখে আমাদের সামনে ভেসে সেই দৃশ্য। কাফিরদের সামনে তিনি কালিমার দাওয়াত পেশ করেছেন ঠিক সেইভাবে যেভাবে অতীতের নবী রাসূলগণ পেশ করেছেন। এদিকে কাফিররা তার সাথে ঠিক সেই আচরণই করেছে যে আচরণ পূর্ব থেকে চলে আসছিল। নবী-রাসূলদের এ সমস্ত ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করলে এর মধ্যে অবারিত সৌন্দর্য ও সুষমা দৃষ্টিগোচর হয়।[৪৯]

আল্লাহর উপর ঈমান

আল-কুরআনে কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্য শুধু এই না যে, সমস্ত দ্বীন লা-শরীক এক আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে একথা প্রমাণ করা, বরং একথাও প্রমাণ করা যে, এসবগুলো দ্বীনের ভিত্তিও এক। সব নবীদের কাহিনী একত্রিত করলে বুঝা যায়, তাদের সর্ব প্রকার দাওয়াত ছিল ঈমান বিল্লাহ বা আল্লাহর উপর ঈমানের।[৫০] যেমনঃ- সূরা আল-আ'রাফে বলা হয়েছেঃ-

"নিশ্চয় আমি নূহকে তাঁর জাতির কাছে পাঠিয়েছি। তিনি বললেন হে আমার জাতি ! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। তোমরা কি তার ভয় করবে না।"[৫১]

"আদ জাতির কাছে তাদের ভাইকে হুদকে পাঠিয়েছি। সে বললঃ হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই। তোমরা কি তাঁকে ভয় করবে না?"[৫২]

"সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই সালেহকে। তিনি বললেন হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন উপাস্য নেই। তোমদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে।" [৫৩]

৪৯। সাইয়্যেদ কুতুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

৫০। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

৫১। لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ.
আল-কুরআন, ৭ : ৫৯

৫২। وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ
আল-কুরআন, ৬৫ : ৬৫

৫৩। وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .
আল-কুরআন, ৭ : ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

"আমি মাদাইয়ানবাসীর জন্য তাদের ভাই শু'আইবকে পাঠিয়েছি, তিনি বললেনঃ হে আমার জাতির লোকেরা! আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই।"[৫৪]

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলামী আকীদাসমূহের মধ্যে তাওহীদ হচ্ছে মূল ভিত্তি। আর সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামই তাওহীদের মুবাল্লিগ ছিলেন। যেহেতু তাদের সকলের উদ্দেশ্যে ছিল এক তাই তাদের ঘটনাবলীর মধ্যে সমাঞ্জস্য দেখা যায়। [৫৫]

সমস্ত নবী-রাসূল একই পদ্ধতিতে দাওয়াত দিয়েছেন

উল্লেখিত আলোচনা থেকে একথা বুঝা যায় যে, প্রত্যেক নবীর দাওয়াতের পদ্ধতিও ছিল এক ও অভিন্ন। আর প্রত্যেক নবীর জাতি তাদের সাথে যে আচরণ করেছে তাও প্রায় একই রকম। কারণ সকল নবীর দ্বীন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এবং সকল দ্বীনের ভিত্তিও এক। এ কারণেই নবীদের কাহিনীগুলো অধিকাংশ জায়গায় একত্রে এসেছে এবং তাদের একই ধরনের কার্যকলাপের বিবরণ বারবার পেশ করা হয়েছে।[৫৬]

যেমন সূরা হুদে বলা হয়েছেঃ "অবশ্যই আমি নূহকে তাঁর জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম। সে জাতিকে বললো, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী। তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না। কেননা, আমি তোমাদের ব্যাপারে এক যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির ভয় করছি। তখন তার সম্প্রদায়ের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বললো, আমরা তো তোমাকে আমাদের মত একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই মনে করি না। আর তোমাদের মধ্যে যারা নিঃস্ব আর নির্বোধ তারা ছাড়া আর কাউকে তোমার অনুগত্যও করতে দেখি না, তাছাড়া আমাদের উপর তোমার কোন প্রাধান্য নেই, বরং তোমাকে আমরা মিথ্যেবাদী মনে করি।" [৫৭]

৫৪। إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

আল-কুরআন, ৭ : ৮৫

৫৫। সাইয়্যেদ কুতুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

৫৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

৫৭। وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ . أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ . فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ . قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ . وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ

আল-কুরআন, ১১ : ২৫-২৯

Dhaka University Institutional Repository

" হে আমার জাতির লোকেরা! তোমাদের কাছে আমি কোন ধন-সম্পদ চাই না। আমি একমাত্র আল্লাহর নিকটই আমার পারিশ্রমিক চাই।" [৫৮]

নূহ (আঃ)-এর জাতি বললোঃ "হে নূহ! আমাদের সাথে তুমি তর্ক করছ এবং অনেক ঝগড়া-বিবাদ করছো। এখন তুমি তোমার সেই আযাব নিয়ে এসো, যে সম্পর্কে আমাদেরকে সর্তক করছো। যদি তুমি সত্যবদী হয়ে থাকো।" [৫৯]

" আর আদ জাতির প্রতি তাদের ভাই হুদকে পাঠিয়েছি। তিনি বললেন ঃ হে আমার জাতি ! আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না, আমার পারিশ্রমিক তো তাঁর কাছেই, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তবুও তোমরা কেন বুঝ না ? হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থণা কর এবং তার প্রতি মনোনিবেশ করো। তিনি আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের শক্তি উত্তর উত্তর বৃদ্ধি করবেন। তোমরা কিন্তু অপরাধীদের মতো হয়ো না। তারা বললঃ হে হুদ, তুমি আমাদের নিকট কোন প্রমাণ নিয়ে আসোনি, কাজেই আমরা তোমার কথায় আমাদের দেবদেবীদের বর্জন করতে পারি না। আর আমরা তোমাকে বিশ্বাস করতেও পারি না ; বরং আমরা বলি তোমার ওপর আমাদের দেবদেবীদের মার পড়েছে। হুদ (আঃ) বললেন ঃ আমি আল্লাহকে স্বাক্ষী করছি তোমরাও স্বাক্ষী থাকো। আমার কোন সম্পর্ক নেই তাদের সাথে যাদেরকে তোমরা শরীক করছো। তাঁকে ছাড়া তোমরা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট করার প্রয়াস চালাও, অতঃপর আমাকে কোন অবকাশ দিয়োনা।" [৬০]

৫৮। وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ .
আল-কুরআন, ১১ : ২৯

৫৯। قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
আল-কুরআন, ১১ : ৩২

৬০। وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ . يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ . وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ . قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ . إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ . مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ.

আল-কুরআন, ১১ : ৫০-৫৫

Dhaka University Institutional Repository

"আর সামুদ জাতির প্রতি তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বললেনঃ হে আমার জাতি! আল্লাহ্‌র ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তিনি জমিন থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার মধ্যেই তোমাদেরকে বসবাস করাচ্ছেন। অতএব, তাঁর কাছে মা'ফ চাও এবং তার দিকেই ফিরে চলো। আমার পালনকর্তা নিকটেই আছেন, কবুল করে থাকেন সন্দেহ নেই। তারা বললো হে সালেহ ! ইতোপূর্বে তোমার নিকট আমাদের বড় আশা ছিলো। আমাদের বাপ, দাদা যাদের পূঁজা করেছেন তুমি কি তা থেকে আমাদেরকে বারণ করছো ? কিন্তু যার প্রতি তুমি আমাদেরকে আহবান করছো, তাতে আমাদের এমন সন্দেহ রয়েছে যে, মন মোটেই সায় দিচ্ছে না।"[৬১]

প্রত্যেক নবী রাসূলের দ্বীনের যোগসূত্র

আল- কুরআনে কাহিনী বর্ণনার আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে নবী করীম (সঃ)-এর দ্বীন এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সহ অতীতের সকল নবীর দ্বীন যে একই সূত্রে বাধা,বিশেষ করে বনী ইসরাঈল ও উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে দ্বীনের যোগসূত্র অন্যান্য নবীর দ্বীনের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী তা প্রমাণ করা। এজন্য আল-কুরআনের যেখানে হযরত ইব্রাহীম (আঃ),হযরত মুসা (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ) এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমনঃ " এটি লিখিত আছে পরবর্তী কিতাব সমূহে বিশেষ করে ইব্রাহীম (আঃ) ও মূসা (আঃ) এর কিতাবে।"[৬২]

" তাকে কি জানানো হয়নি, যা আছে মূসার কিতাবে এবং ইব্রাহীমের কিতাবে, সে তার দায়িত্ব পালন করেছিল ? কিতাবে এই আছে যে, কোনো ব্যক্তি কারো গুনাহ নিজে বহন করবে না।"[৬৩]

৬১। وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ . قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ .

আল-কুরআন, ১১ : ৬১-৬২

৬২। إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى . صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى .

আল-কুরআন, ৮৭ : ১৮-১৯

৬৩। أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى . وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى . أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى .

আল-কুরআন, ৫৩ : ৩৬-৩৮

Dhaka University Institutional Repository

"মানুষের মধ্যে যারা ইব্রাহীমের অনুসরণ করেছিল তারা আর এই নবী এবং যারা এ নবীর প্রতি ঈমান এনেছে তারা ইব্রাহীমের ঘনিষ্ঠতম। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন মু'মিনের বন্ধু।"[৬৪]

"তোমাদের জাতির পিতা ইব্রাহীম। তিনি তোমাদের মুসলিম রেখেছেন।"[৬৫]

"আমি তাদের পিছনে মারইয়াম তনয় ঈসাকে পরিয়েছি। সে পূর্ববর্তী তাওরাত গ্রন্থের সত্যায়নকারী ছিলো। আমি তাকে ইঞ্জিল প্রদান করেছি। এতে হিদায়াত ও আলো রয়েছে। এটি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তাওরাতকে সত্যায়ন করে, পথ প্রদর্শন করে এবং এটি আল্লাহ্ ভীরুদের প্রতি হিদায়াত ও উপদেশ বাণী। ইঞ্জিলের অধিকারীদের উচিত আল্লাহ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী ফায়সালা করা। যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারা পাপাচারী। আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ যা পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।"[৬৬]

৬৪। إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ .

আল-কুরআন, ৩ : ৬৮

৬৫। حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ

আল-কুরআন, ২২ : ৭৮

৬৭। وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ . وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ .

আল-কুরআন, ৫ : ৪৬-৪৮

Dhaka University Institutional Repository

নবী-রাসূলদের সফলতা ও মিথ্যাবাদীদের ধ্বংস

আল-কুরআনে কাহিনী বর্ণনার আরেক উদ্দেশ্য হচ্ছে আম্বিয়ায়ে কিরামের সফলতা ও মিথ্যাবাদীদের ধ্বংসের কথা তুলে ধরা। যেন তা নবী করীম (সঃ)-এর জন্য সান্তনার কারণ হয় এবং তাদের জন্যও সান্তনা এবং আদর্শ হয় যারা ঈমানের পথে লোকদেরকে আহবান করে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

"আমি নবী রাসূলদের সব বৃত্তান্তই তোমাকে বলেছি, যা দিয়ে তোমার অন্তরকে মযবুত করেছি। আর এভাবে তোমার নিকট মহাসত্য এবং ঈমানদারদের জন্য নসীহত ও স্মারক এসেছে।"[৬৭]

কুরআন মজীদে যেখানেই নবীদের কথা ও তাঁদের সফলতার কথা বলা হয়েছে, তার পরপরই ঐ সমস্ত কাফির মুশরিকদের পরিণতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। যারা নবীদেরকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করতো। যেমন ঃ " আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। সে সাড়ে নয়শত বৎসর তাদের সাথে ছিল। তারপর তাদেরকে মহাপ্লাবন এসে ধ্বংস করে দিলো, কেননা তারা ছিল পাপী। অতঃপর আমি নূহকে ও নৌকার আরোহীদেরকে বাঁচিয়ে দিলাম এবং নৌকাটিকে বিশ্ববাসীর জন্য নিদর্শন বানিয়ে রাখলাম।"[৬৮]

"স্মরণ কর ইব্রাহীমকে। যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো এবং তাঁকে ভয় করো। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ।" [৬৯]

৬৭। وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ

আল-কুরআন, ১১ : ১২০

৬৮। وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ . فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ

আল-কুরআন, ২৯ : ১৪-১৫

৬৯। وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

আল-কুরআন, ২৯ : ১৬

Dhaka University Institutional Repository

" আমি লূতকে পাঠিয়েছিলাম। যখন তিনি তাঁর জাতিকে বললেনঃ তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছো। যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি। তোমরা কি সমকামে লিপ্ত হচ্ছো, রাহাজানি করছো এবং নিজেদের মজলিসে গর্হিত কর্ম করছো ? জবাবে তাঁর জাতি শুধু এ কথা বললো ঃ আমাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব আনো যদি তুমি সত্যবাদী হও। যখন প্রেরিত ফেরেস্ত াগণ লূতের নিকট পৌঁছলো তখন তাদের কারণে তিনি বিষন্ন হয়ে পড়লেন এবং তাঁর মন সংকীর্ণ হয়ে গেল। তারা বললো ভয় করবেন না এবং দুঃখ করবেন না, আমরা আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে রক্ষা করবোই, শুধু আপনার স্ত্রী ছাড়া। সে ধ্বংস প্রাপ্তদের দলভূক্ত থাকবে। আমরা এ জনপদের অধিবাসীদের উপর আকাশ থেকে আযাব নাযিল করবো তাদের পাপাচারের কারণে। আমি বুদ্ধিমান লোকদের জন্য এতে একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন রেখে দিয়েছি।"[৭০]

"আমি মাদাইয়ানবাসীর প্রতি তাঁদের ভাই শু'আইবকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বললেন হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, শেষ দিবসের আশা রাখো এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। কিন্তু তারা তাকে মিথ্যেবাদী বললো। অত:পর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হলো এবং নিজেদের গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইলো।"[৭১]

৭০। وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ . أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ . قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ . وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ . قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ . وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ . إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ . وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ .

আল-কুরআন, ২৯ : ২৮-৩৫

৭১। وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ . فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ .

আল-কুরআন, ২৯ : ৩৬-৩৭

Dhaka University Institutional Repository

"আমি আদ ও ছামুদ জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের বাড়ী ঘর দেখেই তাদের অবস্থা তোমাদের জানা হয়ে গেছে। শয়তান তাদের কর্মকে তাদের নিকট আকর্ষণীয় করে তুলেছিলো এবং তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিলো, তারা ছিল হুশিয়ার। আমি কারুন, ফির'আউন ও হামানকে ধ্বংস করে দিয়েছি। মূসা তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন দিয়ে আগমন করেছিলো কিন্তু তারা দম্ভ অহংকারে লিপ্ত ছিলো, তাই বলে তারা জিতে যায়নি। আমি প্রত্যেককেই তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কারো কাছে পাঠিয়েছি প্রস্তরসহ প্রচন্ড বাতাস, কাউকে পেয়েছে বজ্রপাত, কাউকে আমি বিলিন করেছি ভূ-গর্ভে এবং কাউকে করেছি নিমজ্জিত। আল্লাহ্ তাদের প্রতি যুলুমকারী ছিলেন না। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলম করেছিলো।"[৭২]

সুসংবাদ ও সতর্কীকরণের সত্যতা

আল-কুরআনে ঘটনাবলী বর্ণনার আরেকটি কারণ হচ্ছে- ঈমানদারদেরকে জান্নাত ও তার নিয়ামত সমূহের সুসংবাদ ও তার সত্যতার প্রমাণ করা এবং অবিশ্বাসীদের জন্য জাহান্নাম ও তার দুঃখ কষ্ট সম্পর্কে সর্তক করা এবং তার সত্যতা প্রমাণ করা।[৭৩] যেমন ঃ বলা হয়েছে-

" হে নবী তুমি আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল-দয়ালু। আমার শাস্তি অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক।"[৭৪]

৭২। وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ . وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ . فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

আল-কুরআন, ২৯ : ৩৮-৪০

৭৩। সাইয়্যেদ কুতুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

৭৪। وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ .نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

আল-কুরআন, ১৫ : ৪৯-৫০

Dhaka University Institutional Repository

এ আয়াতের পরপরই ক্ষমা ও শাস্তির সত্যতা সংক্রান্ত এ ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে ঃ " তুমি তাদেরকে ইব্রাহীমের মেহমানদের অবস্থা শুনিয়ে দাও। যখন তারা তাঁর বাড়ীতে আগমন করল এবং বললঃ সালাম। তিনি বললেন ঃ আমরা তোমাদের ব্যাপারে ভীত। তারা বললো ভয় করবেন না। আমরা আপনাকে একজন জ্ঞানবান ছেলের সুসংবাদ দিচ্ছি"। [৭৫]

তারপর আল্লাহ্‌র রহমতের ফলগুধারা প্রকাশিত হচ্ছে ঃ " অত:পর যখন প্রেরিতরা লুতের গৃহে পৌছলো, তিনি বললেন তোমরা তো অপরিচিত লোক। তারা বললোঃ না বরং আমরা তাদের কাছে ঐ বস্তু নিয়ে এসেছি যে সম্পর্কে তারা বিবাদ করতো। আমরা আপনার নিকট সত্য বিষয় নিয়ে এসেছি এবং আমরা সত্যবাদী। অতএব, আপনি শেষ রাতে পরিবারের সকলকে নিয়ে চলে যাবেন। আমি লুতকে এ বিষয়ে জানিয়ে দেই যে, সকাল হলেই তাদেরকে সমূলে বিনাশ করে দেয়া হবে।"[৭৬]

উল্লেখিত আয়াতে হযরত লূত (আঃ)-এর ওপর রহমত এবং তাঁর জাতিকে ধ্বংস করে দেয়ার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। সূরা আল হিজর এর অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

" নিশ্চয় হিজরের বাসিন্দারা পরগাম্বরের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। আমি তাদেরকে নিজের নিদর্শনাবলী দিয়েছি কিন্তু তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো। তারা পাহাড়ে নিশ্চিন্তে ঘর খোদাই করতো। অতঃপর একদিন সকাল বেলা তাদেরকে একটি শব্দ এসে আঘাত করলো তখন কোনো উপকারেই এলো না, যা তারা উপার্জন করেছিলো।" [৭৭]

৭৫। إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ.وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ

আল-কুরআন, ১৫ : ৫১-৫২

৭৬। فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ . قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ . قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ . وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ . فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ . وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ .

আল-কুরআন, ১৫ : ৬১-৬৬

৭৭। وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ . وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ . وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ . فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ . فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

আল-কুরআন, ১৫ : ৮০-৮৪

Dhaka University Institutional Repository

এসব আয়াতে মিথ্যাবাদীদেরকে যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কথা বলা হয়েছে তা প্রকাশ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র ওয়াদা সঠিক ও কার্যকরী তাও প্রমাণ করে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। আর এ ঘটনাগুলো সেভাবেই উপস্থাপন করা হয়েছে যেভাবে তা সংঘটিত হয়েছে।

নবী রাসূলদের প্রতি নিয়ামত সমূহের বর্ণনা

নবী রাসূলদের উপর যে সব অনুগ্রহ ও নিয়ামত প্রদান করা হয়েছে তা বর্ণনার জন্য ও আল-কুরআনে কাহিনীর অবতরণা করা হয়েছে। যেমন- হযরত দাউদ (আঃ), হযরত সুলাইমান (আঃ), হযরত আয়ুব (আঃ), হযরত ইব্রাহীম (আঃ), মারইয়াম ও হযরত ঈসা (আঃ) এর ঘটনাবলী। এ সমস্ত কাহিনী আল-কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় ও সূরায় আলোচিত হয়েছে। প্রথম লক্ষ্য নিয়ামত ও অনুগ্রহের বর্ণনা দেয়া, সেই সাথে অবশ্য তাদের কিছু কার্যাবলীর বর্ণনাও প্রাসঙ্গিকভাবে চলে এসেছে।[৭৮]

আদম সন্তানকে শয়তানের শত্রুতা থেকে সতর্ক করা করা

কুরআন মজীদে যে সব কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে তার আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে- হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত যত লোক পৃথিবীতে আসবে শয়তান তাদের প্রত্যেকের শত্রু, একথাটি বুঝিয়ে দেয়া। প্রতিটি মুহূর্তে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত। কস্মিনকালেও সে মানুষের মঙ্গল চায় না। তারই জ্বলন্ত প্রমাণ হিসেবে হযরত আদম (আঃ) এর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় শয়তানের অপতৎপরতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৭৯]

অন্যান্য আরো কতিপয় কারণ

আল-কুরআনে উপরোক্ত কারণ ছাড়াও নিম্নোক্ত কতিপয় কারণে বিভিন্ন জাতির ইতিহাস ও কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। যথা ঃ

আল্লাহ্‌র কুদরতের প্রকাশ ঃ যেমন হযরত আদম ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও পাখীর বর্ননা, হযরত উযাইর (আঃ) মরার একশত বছর পর জীবিত হওয়ার ঘটনা। এরকম আরো কিছু ঘটনাবলী।

৭৮। সাইয়্যেদ কুতুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

৭৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

Dhaka University Institutional Repository

ভালো ও কল্যাণকর কাজ এবং খারাপ ও অকল্যাণকর কাজের পরিণতি বর্ণনা, যেমনঃ আদম (আঃ) এর দুই ছেলের ঘটনা, দুই বাগান মালিকের ঘটনা, বনি ইসরাঈলের নাফরমানির বর্ণনা, আসহাবে উখদুদের ঘটনা ইত্যাদি।

মানুষের স্বভাব তাড়াহুড়া করা এবং তাড়াতাড়ি পাবার প্রচেষ্টা। এজন্য যা নগদ পায় অথবা যার যার বাস্তবতা আছে তার জন্য প্রচেষ্টা করে। অথচ আল্লাহ্ তাদেরকে প্রকৃত কল্যাণের জন্য অপেক্ষা ও ধৈর্য্যের গুরুত্ব ধীরস্থিরতার পরিণতি সম্পর্কেও কুরআনে বিভিন্ন কাহিনী ও ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন- হযরত মুসা (আঃ) ও আল্লাহর এক বান্দার (খাজা খিজিরের) ঘটনা। এ ধরনের বিষয়বস্তুর উপর আল-কুরআন অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছে। যা তার উদ্দেশ্যকে পূর্ণতায় পৌছে দিয়েছে।[৮০]

৮০। সাইয়্যেদ কুতুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২-২০৩

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

আল-কুরআনে আলোচিত বিভিন্ন জাতির ইতিহাস

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

আল-কুরআনে আলোচিত বিভিন্ন জাতির ইতিহাস

নূহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জাতি

হযরত ইদ্রিস (আ.)-এর জান্নাতে চলে যাওয়ার পর চারশত বছর অতিক্রান্ত হল। এ সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে যে জাতি বা সম্প্রদায় দুনিয়ায় অবস্থান করেছেন সে জাতি বা কাওম নূহ (আ.)-এর জাতি নামে পরিচিত। এ সময়ের মধ্যে দুনিয়াতে আল্লাহর পক্ষ থেকে আর কোন নবী-রাসূলের আগমন ঘটেনি। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোন নবী-রাসূলের আগমন না ঘটাতে শয়তানের প্ররোচনায় সকলেই অধর্ম ও ধর্মের নামে মূর্তি পুজায় লিপ্ত হল। এমনি অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা উক্ত জনপদের অধিবাসীদের পথ প্রদর্শনের জন্য হযরত নূহ (আ.) কে প্রেরণ করেন। হযরত আদম (আ.)-এর পরে ইনি প্রথম নবী যাঁকে প্রথম রাসূলের পদ দান করা হয়েছে।[১] সহীহ মুসলিম শরীফে শাফা'য়াতের অধ্যায় হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে ঃ يا نوح انت الرسل الى الارض "হে নূহ ! তোমাকে জমিনের উপর সর্বপ্রথম রাসূল বানানো হয়েছে।"[২]

নূহ (আ.)-এর বংশ পরিচয়

হযরত নূহ (আ.) হযরত আদম (আ.)-এর দশম স্তর বংশধর। তাঁর বংশধারা নূহ (আ.) তাঁর পিতা লামেক তাঁর পিতা মোতাশাওয়ালেহ তার পিতা আখনূখ (ইদ্রিস) তাঁর পিতা ইযদ তাঁর পিতা মাহলাইন তার পিতা কিনান তার পিতা আনুশ তার পিতা শীষ তার পিতা হযরত আদম (আ.)।[৩]

হযরত আদম, নূহ, ইবরাহীম ও ইমরান একই বংশ ধারার। আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন ঃ "আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীম ও ইমরানের বংশকে দুনিয়ায় মনোনীত করেছেন। তারা পরস্পর একই বংশের।[৪]

১। তাহের সুরাটী, *কাসাসুল আম্বিয়া,* অনুবাদ, মোস্তাফিজুর রহমান, ঢাকা: খান বুক হাউজ, পৃ. ৫৯

২। হাজ্জাজ ইব্ন মুসলিম, *সহীহ মুসলিম,* শাফায়েত অধ্যায়, খ.২, পৃ. ২০৯

৩। প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ৫৯

إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين . ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم . إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم . فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم . فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب . هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء .

আল-কুরআন, ৩ : ৩৩-৩৮

Dhaka University Institutional Repository

তাওরাতে হযরত আদম এর সৃষ্টি নূহ (আ.)-এর জন্ম এবং আদম (আ.)-এর ওফাত ও নূহ (আ.)-এর জন্মের মধ্যস্থিত সময় সম্বন্ধে যে নসবনামা নকশা সংকলিত হয়েছে তা নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

১ম নকশা

(পুত্রের জন্মকালে পিতার বয়স)

পুত্রের নাম	পিতার নাম	পুত্রের জন্মকালে পিতার বয়স
শীষ (আ.)	আদম (আ.)	১৩০ বৎসর
আনুশ	শীষ (আ.)	১৫০ বৎসর
ক্বীনান	আনুশ	৯০ বৎসর
মাহলাঈল	ক্বীনান	৭০ বৎসর
ইয়ারুদ	মাহলাঈল	৬৫ বৎসর
আখনুখ	ইয়ারুদ	১৬২ বৎসর
মুতাওশালেহ	আখনুখ	৬৫ বৎসর
লামাক	মুতাওশালেহ	১৮৭ বৎসর
নূহ (আ.)	লামাক	১৩২ বৎসর

২য় নকশা

আদম-এর সৃষ্টি ও নূহ-এর জন্মের মধ্যবর্তী মুদ্দত ১০৫৬।

আদম-এর আয়ুষ্কাল ঃ ৯৩০।

আদম-এর ওফাত ও নূহ (আ.)-এর জন্মের মধ্যবর্তী মুদ্দত ১০২৬।[৫]

সমকালীন পরিবেশ ঃ

নূহ (আ.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে মানুষ আল্লাহর একত্ব ও ইবাদতের সঠিক রূপরেখা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হয়ে পড়েছিল। তারা আল্লাহ তা'আলার স্থলে স্বহস্তে নির্মিত মূর্তি সমুহের পুঁজা করত।[৬]

তারা ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক এবং নাসর নামক পাঁচটি দেব মুর্তির পূঁজা করত এবং ঘোরতর কুফর ও শির্‌কে নিমজ্জিত ছিল। তারা একে অপরকে এই বলে সম্বোধন করত তারা যেন নূহ (আ.)-এর প্রচারে প্রভাবিত হয়ে প্রতিমা পরিত্যাগ না করে। পবিত্র কুরআনে এসেছে ঃ

"তোমরা তোমাদের দেবদেবীকে পরিত্যাগ করো না এবং ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক, ও নাসরকে পরিত্যাগ করবে না"।[৭]

৫। হিফজুর রহমান সিওয়ারবী, *কাছাছুল কুরআন*, অনুবাদ, মাও. নুরুর রহমান, ঢাকা: ইমদাদীয়া লাইব্রেরী, খ. ৪, পৃ. ৫২-৫৩

৬। প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৪

৭। وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا

আল-কুরআন, ৭১ : ২৩

Dhaka University Institutional Repository

"ওয়াদ" ছিল কালব গোত্রের দেবমূর্তি "দাওমাতুল জান্দাল" নামক স্থানে এর মন্দির ছিল। "সুওয়া" ছিল মক্কা নিকটবর্তী হুযাইল গোত্রের দেবমূর্তি। "ইয়াগুছ" প্রথমে মুরাদ গোত্রের এবং পরে বণী গাতিফের দেবতা, এর আস্তানা ছিল সবার নিকটবর্তী "জাওক" নামক স্থানে। "ইয়াউক" হামদান গোত্রের দেবমূর্তি। আর "নাসর" ছিল "মুলকালা" গোত্রের হিমইয়ার শাখার বেদমূর্তি! এগুলো নূহের সম্প্রদায়ের কতিপয় সৎলোকের নাম ছিল। এদের মৃত্যুর পর তারা যেখানে বসে মজলিস করত শয়তান সেখানে কিছু মূর্তি তৈরী করে স্থাপন করতে তাদের কাওমের লোকদের মনে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। তাই তারা সেখানে কিছু মূর্তি তৈরী করে এবং তাদের নামে নামকরণ করে। কিন্তু তখনও এসব মূর্তির পুজা করা হত না। পরবর্তীতে তাদের মৃত্যুর পর এবং মূর্তিগুলো সম্পর্কে সত্যিকার জ্ঞান বিলুপ্ত হলে লোকজন তাদের পুঁজা করতে শুরু করে।[৮]

তারা এসব প্রতিমা তাদের "ইলাহ" এর নৈকট্য লাভের উপায় হিসেবে পুঁজা করত।[৯] সর্বপ্রথম তারা "ওয়াদ" নামক প্রতিমার পুঁজা করে, আর এটি ছিল সবচেয়ে বড়।[১০] এসব মূর্তি পরবর্তীতে আরবদের মাঝেও প্রচলন হয় এছাড়া তাদের মাঝে নানা প্রকার পাপাচার সংঘটিত হত এবং ধর্মীয় সামাজিক নানা অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। কাওমের মধ্যে শ্রেণী বৈষম্য রোগও বিস্তার লাভ করেছিল।[১১] এছাড়া কুরআন মাজীদ তাদেরকে ফাসিক, জালিম বলে অভিহিত করেছে।

আল্লাহ বলেন, "এবং নূহের সম্প্রদায়কে (ধ্বংস করা হয়েছে) আদ ও সামুদ জাতির পূর্বে, আর তারা ছিল অত্যধিক জালিম ও অবাধ্য"।[১২]

অত্যধিক অহংকার প্রদর্শন করত এবং তাদের মাঝে আল্লাহভীতি ছিল না, ফলে তারা আল্লাহর একত্ববাদ, নবুওয়ত, রিসালাতসহ পরকাল দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত। পবিত্র কুরআন তাদের কে قوم سوء বা মন্দ সম্প্রদায় হিসেবে আখ্যা দিয়েছে।[১৩]

অতএব, ধর্মীয় নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের দিক দিয়ে নূহের সম্প্রদায় গোমরাহীর চরম সীমায় পৌছে গিয়েছিল।

৮। মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, দিল্লিঃ মাকতাবা রশীদিয়া, তা. বি. কিতাবুত তাফসীর, খ. ২ পৃ. ৭৩২

৯। আফীফ আবদুল ফাত্তাহ, *মায়াল আম্বিয়া ফিল কুরআন*,কায়রোঃ দারুল ইলম, ১৯৮৪, ৩য় সংস্করণ পৃ. ৬১

১০। তাহের সুরাটী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

১১। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

১২। وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى.

আল-কুরআন, ৫৩ : ৫২

১৩। তাহের সুরাটী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

নূহ (আ.)-এর দাওয়াত ও তাবলীগ এবং তাঁর কাওমের দাওয়াতের প্রতিক্রিয়া

আল্লাহ তায়ালা হযরত নূহ (আ.)-এর জাতির জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে আল্লাহ পাকের সত্য রাসুল নূহ (আ.) কে পাঠালেন । এ মর্মে কুরআনে আল্লাহর বাণী "নিশ্চয় আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছি। তুমি স্বীয় সম্প্রদায়কে তাদের নিকট যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি উপনীত হওয়ার পূর্বেই ভয় প্রদর্শন কর।[১৪]

নূহ (আ.)-এর কাওম বা জাতি তাঁর আহবানে সাড়া দিল না। বরং ঘৃণা ও অবজ্ঞার সহিত অস্বীকার করল এবং বিধর্মচারণের উপর হটকারিতা করতে থাকল, জাতির সর্দার ও লোকেরা তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্থ করা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করার কোন পন্থাই ত্যাগ করলনা। আর তাদের অনুসারীগণ তাদেরই অনুকরণ ও অনুসরণের প্রমাণ দেওয়ার জন্য অপমান ও হীনপন্ন করার যাবতীয় পন্থাই হযরত নূহ (আ.)-এর উপর প্রয়োগ করল। তারা এ কথার উপর বিস্ময় প্রকাশ করল যে, যে ব্যক্তি ধন-সম্পদে এবং স্বচ্ছলতায় আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠও নহে, মানবতার মর্যাদার চেয়ে উচ্চ ফেরেশতারুপী নহে, আমাদের নেতা ও পরিচালক হওয়ার কি অধিকার তার আছে, যে, আমরা আর আদেশ মান্য করব ? [১৫]

তারা জাতির দুর্বল ও গরীব লেকাদেরকে যখন হযরত নূহ (আ.)-এর অনুগত ও অনুসারী দেখত, অহংকারের ভংগিতে তাচ্ছিলের সহিত বলত আমরা তাদের মত নই যে, তোমার আদেশানুগত হয়ে যাব এবং তোমাকে নিজেদের অনুসরণীয় নেতা মেনে নেব। তারা মনে করত এই দুর্বল ও নীচ শ্রেণীর লোকেরা নূহ (আ.)-এর অন্ধ অনুসারী ।[১৬]

আল্লাহর বাণী

"ইহাতে কাওমের ঐ সমস্ত সর্দারগণ যারা কুফরীর পথ অবলম্বণ করেছিল, তারা বলল, আমরা তোমার ইহা ছাড়া আর কিছুই দেখি না যে, তুমি আমাদেরই মত মানুষ, আর যারা তোমার অনুসরণ করেছে তাদের মধ্যে ঐ সমস্ত লোক ছাড়া কাহাকেও দেখা যায় না, যারা আমাদের মধ্যে হীন ও তুচ্ছ, না বুঝে, না শুনে তোমার অনুসরণ করছে। আমরাতো তোমাদের মধ্যে আমাদের চেয়ে কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পাচ্ছি না এবং আমরা মনে করি যে, তুমি মিথ্যাবাদী। [১৭]

১৪। إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم

আল-কুরআন, ৭১ : ১

১৫। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৫

১৬। প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৫

১৭। فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين

আল-কুরআন, ১১ : ২৭

Dhaka University Institutional Repository

হযরত নূহ (আ.) তাঁর জাতিকে বার বার সতর্ক করে দিয়ে বলতেন যে, আমি আমার এই দাওয়াত ও হেদায়েত পৌছানোর বিনিময়ে তোমাদের নিকট কোন ধন-সম্পদ চাই না এবং মান মর্যাদার প্রত্যাশীও না । আমি পরিশ্রমিকের দাবীও করি না। আমার এ খেদমতের প্রকৃত বিনিময় এবং সাওয়াব একমাত্র আল্লাহর হাতেই রয়েছে।[১৮]

এই মর্মে সূরা হুদে আল্লাহর বাণী

" হে আমার জাতি! আমি যা করছি তার বিনিময়ে তোমাদের নিকট কোন ধন-সম্পদ চাই না, আমার এ খেদমতের পারিশ্রমিক যা কিছু হয়, তা শুধু আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে।[১৯]

হযরত নূহ (আ.)-এর জাতির সর্দার ও প্রধান শ্রেণীর লোকেরা সাধারণ লোকদের সর্তক করে দিয়ে বলত। তোমরা কিছুতেই ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসর মূর্তিগুলোর পূঁজা ত্যাগ করবে না। কুরআনে এরশাদ হচ্ছে ঃ

"তারা বলল ! কখনো নিজেদের মাবুদসমূহকে ত্যাগ করিও না। আর ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক এবং নাসরকে ছাড়িও না।" [২০]

কখনো কখনো নূহ (আ.) কাফেরদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকলে তাদের কেউ কেউ নূহ (আ.)-এর সাথে অসৌজন্য আচরণ করত, এমনকি দৈহিক নির্যাতন করত। আঘাত করতে করতে অজ্ঞান করে ফেলত। জ্ঞান ফিরলে তিনি পুনরায় উচ্চ স্বরে বলতেন। হে লোকেরা তোমরা বল আল্লাহ এক, একক, তাঁর কোন শরীক নেই, আর নূহ (আ.) তাঁর সত্য রাসুল।[২১]

একদিনের ঘটনা । কাফেররা হযরত নূহ (আ.)-এর গলায় রশি দিয়ে টানতে থাকে। ফলে তিনদিন পর্যন্ত তিনি চৈতন্যহীন অবস্থায় থাকেন। এতদসত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দুঃখ কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করেও তিনি লোকদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান জানাতেন। এ অবস্থায় তারা যখন তাঁর আহবান বরাবর প্রত্যাখান করতে লাগল।[২২] তখন হযরত নূহ (আ.) আল্লাহর দরবারে নিবেদন করেন, আল্লাহর বাণী ঃ

"বলল হে রব! আমি আমার সম্প্রদায়কে রাত দিন আহবান করেছি। কিন্তু আমার আহবানে তারা আরো বেশী করে পালাতে থাকে।[২৩]

১৮। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত , খ. ১, পৃ. ৫৬

১৯। يقوم لا اسئلكم عليه مالا ان اجرى الا علىالله .

আল-কুরআন, ১১ : ২৯

২০। وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا

আল-কুরআন, ৭১ : ২৩

২১। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

২২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

২৩। قال رب انى دعوت قومى ليلا ونهارا فلم يزدهم دعا الا فرارا -

আল-কুরআন, ৭১ : ৫-৬

Dhaka University Institutional Repository

একদিন হযরত নূহ (আ.) নিজ সম্প্রদায়ের লোকদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকেন। তাঁর আহবান শুনে কাফিররা ক্ষিপ্ত হয়ে এমন নির্মমভাবে আঘাত করে যে, তাঁর পরিধেয় কাপড় রক্তাক্ত হয়ে যায়। এ অবস্থায় তাঁর কাফির স্ত্রী এসে কাফিদের লক্ষ্য করে বলে হে লোকেরা তাকে এতটা মের না। কেননা সে পাগল আর পাগলামির কারণেই সে এরকম বলে।

সে না কিছু জানে আর না কিছু বুঝে। স্ত্রীর এহেন বেআদবীপূর্ণ উক্তি শুনে নূহ (আ.) আকাশের দিকে মুখ তুলে আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ জানান।[২৪] তাঁর ফরিয়াদ আল্লাহ তা'আলার কালাম পাকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে - فدعا ربه انى مغلوب فانتصر -

"অর্থাৎ নূহ (আ.) ডেকে বলল হে রব! আমি পরাজিত হয়েছি তুমি প্রতিশোধ গ্রহণ কর"।

এভাবে হযরত নূহ (আ.) পঞ্চাশ কম হাজার বৎসর যাবত দুনিয়াতে অবস্থান করেছিলেন। তাঁর এ দীর্ঘ জীবনে তিনি নিজ সম্প্রদায়কে সৎপথে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু মাত্র ৪০ জন পুরুষ ও ৪০ জন মহিলা তার প্রচারিত সত্যধর্ম গ্রহণ করেছিল। অন্যান্য সকলেই তাঁকে পাগল ও নির্বোধ বলে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে প্রত্যাখান করল। এমতাবস্থায় হযরত নূহ (আ.) তাঁর জাতির প্রতি হেদায়াত প্রাপ্তি হতে নিরাশ হয়ে পড়েন। এমনকি তিনি নিতান্ত ভগ্ন হৃদয় ও পেরেশান হয়ে পড়েন।[২৫]

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে সন্তনা স্বরূপ বলেন ঃ

"আর নূহের প্রতি ওহী প্রেরিত হইল" যারা ঈমান আনার আনয়ন করেছে। ইহাদের ব্যতীত আর যারা আছে তারা কেউ ঈমান আনবে না। অতএত, তাদের কার্যকলাপের জন্য দুঃখ করিও না।"[২৬]

আর হযরত নূহ (আ.) যখন জানতে পারলেন, তাঁর সত্য প্রচারে কোন ত্রুটি হয় নি, বরং তা স্বয়ং অমান্যকারীদের যোগ্যতার ত্রুটি এবং নিজেদের অবাধ্যতার ফল, তখন তিনি তাদের কার্যকলাপ ও হীন গতিবিধিতে ব্যথিত হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে এরুপ দো'আ করেন ঃ [২৭]

رب لاتذر على الارض من الكفرين ديارا - انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولايلدوا الا فاجرا كفارا -

"হে আমার প্রতিপালনক! আপনি কাফিরকুল হইতে কাউকে জমিনের উপর রাখবেন না । যদি আপনি তাদেরকে এভাবেই ছেড়ে রাখেন তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে গোমরা করে ফেলবে। আর তাদের বংশধরও তাদের মত পাপিষ্ঠ ও নাফরমান পয়দা হবে"।[২৮]

২৪। তাহের সুরাটী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

২৫। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

২৬। وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون

আল-কুরআন, ১১: ৩৬

২৭। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

২৮। إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا.وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا

আল-কুরআন, ৭১ : ২৬-২৭

Dhaka University Institutional Repository

নূহ (আ.)-এর নৌকা নির্মাণ

আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আ.)-এর দো'আ কবুল করলেন এবং আমলের প্রতিফলের নিয়ম অনুযায়ী অবাধ্যদের অবাধ্যতার শাস্তির ঘোষণা দিলেন। আর মুমিনদের রক্ষার জন্য প্রথমে নূহ (আ.)-এর প্রতি নির্দেশ যে, একটি নৌকা নির্মাণ কর। যাতে মুমিনগণ সেই শাস্তি হতে সুরক্ষিত থাকেন। হযরত নূহ (আ.) আল্লাহ পাকের আদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ করতে আরম্ভ করলে তারা হাস্য বিদ্রুপ করতে থাকে। যখনই তারা নির্মিয়মান নৌকার নিকট যাতায়াত করত তখনই বলত, চমৎকার! আমরা যখন নিমজ্জিত হতে আরম্ভ করব তখন তুমি ও তোমার অনুসারীরা এই নৌকায় আরোহন করে সুরক্ষিত থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। কেমন নির্বোধসূলভ কল্পনা ।[২৯]
অথচ নৌকা নির্মাণে আল্লাহর নির্দেশবাণী ঃ

হে নূহ ! তুমি আমারই রক্ষণাবেক্ষণে আমার ওহী অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ করতে থাক। আর তখন আমাকে সম্বোধন করে যালিমদের জন্য কোন সুপারিশ করিও না। নিংসন্দেহে তারা নিমজ্জিত হবে।"[৩০]

অবশেষে হযরত নূহের (আ.)-এর নৌকা প্রস্তুত হয়ে গেল এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুত আযাব নাযিল হওয়ার সময় নিকটবর্তী হল।

নূহ (আ.) সেই প্রথম আলামত (নিদর্শন) দেখতে পেলেন। যা তাকে বলে দেয়া হয়েছিল অর্থাৎ ভূগর্ভ হতে পানি উৎলাইয়া উঠতে আরম্ভ করল। আল্লাহ পাকের ওহী তাঁকে আদেশ শুনালো, নিজের বংশধরকে নৌকায় আরোহনের আদেশ দাও। আর সমস্ত প্রাণীকুল হতে প্রত্যেক প্রকারের এক এক জোড়াও উঠিয়ে নাও। (প্রায় ৪০ জনের) এই ক্ষুদ্র দলটিকেও যারা তোমার উপর ঈমান এনেছে তাদেরকেও নৌকায় আরোহন করতে আদেশ দাও।

যখন আল্লাহর ওহী সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী হল, তখন আসমানের প্রতি আদেশ হল, পানি বর্ষণ করতে আরম্ভ কর, আর যমিনের ফোয়ারাসমূহের প্রতি আদেশ হল, পূর্ণ মাত্রায় উৎলাইতে থাক। আল্লাহ পাকের আদেশে যখন এ সবকিছু হতে থাকল, তখন নৌকা তার হেফাযতে পানির উপর ভাসতে থাকল সে পর্যন্ত যে, সমস্ত অবিশ্বাসী ও অবাধ্য লোকেরা পানিতে ডুবে গেল এবং আল্লাহ তা'আলার বিধিব্যবস্থা কর্মফল অনুযায়ী নিজেদের কতৃকর্মের ফল ভোগ করল। [৩১]

২৯। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

৩০। وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ

আল-কুরআন, ১১ : ৩৭

৩১। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

হযরত নূহ (আ.) দোসরা রজব থেকে মহরমের দশ তারিখ পর্যন্ত মোট ছয় মাস আট দিন নৌকাতে আবস্থান করেন।[৩২] অতঃপর আল্লাহ নির্দেশ করেন ঃ

"আর নির্দেশ হলো, হে যমীন তোমর সব পানি চুষে নাও এবং আকাশকে নির্দেশ করা হল হে আকাশ থাম, তখন পানি যমীনে বসে যায, যা ঘটার তা ঘটে গেল। নৌকা জুদী পর্বতে এসে ভিড়ল। আর বলে দেয়া হল, জালেম সম্প্রদায় দূর হয়ে গেল"।[৩৩]

জুদী পাহাড়

যখন আল্লাহ পাকের আদেশে আযাব সমাপ্ত হলো তখন নূহ (আ.)-এর নৌকা জুদী পাহাড়ে যেয়ে ঠেকলো।[৩৪] আল্লাহ বলেন ঃ

"আর আল্লাহ পাকের আদেশ পূর্ণ হলো এবং নৌকা জুদী পাহাড়ে যেয়ে থামলো, আর ঘোষণা করে দেয়া হলো যালিম কাওমের ধ্বংস"।[৩৫]

তাওরাত কিতাবে বলা হয়েছে "জুদী" আরারাত পর্বত শ্রেণীর মধ্যে অন্যতম একটি পর্বত। আরারাত আসলে দ্বীপের নাম। অর্থাৎ ইহা সেই অঞ্চলটির নাম যা দজলা, ফোরাত নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী "দিয়ারে বিকর" হতে বাগদাদ পর্যন্ত বিস্তৃত।[৩৬]

প্লাবনের পানি ক্রমেই শুকাতে আরম্ভ হলো এবং নৌকার আরোহীরা পুনারায় শান্তি ও নিরাপত্তার সহিত আল্লাহর যমীনের উপর পা রাখলো। এ ভিত্তিতেই নূহ (আ.)কে দ্বিতীয় আদম অর্থাৎ মানব জাতির দ্বিতীয় পিতা বলা হয়। এ হিসেবেই তাঁকে হাদীস শরীফে প্রথম রাসূল বলা হয়েছে।[৩৭]

৩২। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

৩৩। وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

আল-কুরআন, ১১ : ৪৪

৩৪। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

৩৫। . وقضى الامر واستوت على الجودى وقيل بعدا للقوم الظلمين

আল-কুরআন, ১১ : ৪৪

৩৬। ড. মাজহার উদ্দিন ছিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

৩৭। হিফযুর রহমান ঃ প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

নূহ (আ.)-এর প্লাবনের এলাকা

নূহ (আ.)-এর প্লাবন কি সমগ্র পৃথিবীর উপর এসেছিল, না পৃথিবীর কোন বিশেষ অংশের উপর এসেছিল ? এসম্বন্ধে প্রাচীন কালের ও আধুনিক যুগের 'আলিমদের মধ্যে দ্বিবিধ মত রয়েছে।

ওলামায়ে ইসলামের একটি জামাত, ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায় 'আলিমগণ এবং জ্যোতির্বিদ ও ভূ-তত্ত্ববিদ জড়জগতের ঐতিহাসিকদের বিশেষজ্ঞগণের এই অভিমত যে, এই প্লাবন সমগ্র পৃথিবীর উপর আসে নাই ; বরং পৃথিবীর সেই অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যেখানে নূহ (আ.)-এর কাওম বসবাস করত । আর সেই অঞ্চলটির আয়তন ছিল এক লক্ষ চল্লিশ হাজার বর্গকিলোমিটার।

তাদের যুক্তি নূহ (আ.)-এর প্লাবন নির্দিষ্ট অঞ্চলে হওয়ার কারণ এই যে, যদি এর প্লাবন ব্যাপক হতো, তবে উহার চিহ্ন সমূহ ভু-গোলকের বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন পর্বত চূড়ায় পরিলক্ষিত হওয়া উচিত ছিল। অথচ এরুপ হয় নাই। এতদ্ভিন্ন তৎকালে মানুষের বসতি খুব সীমাবদ্ধ ছিল এবং তা সে অঞ্চলেই ছিল। যেখানে নূহ (আ.) ও তাঁর কাওম বসতি করত। তখনও আদম (আ.)-এর সন্তানদের সংখ্যা সে অঞ্চলে বসবাসকারীর চেয়ে অধিক ছিলনা। তথাকার অধিবাসীরাই ছিল আদম (আ.)-এর সমস্ত সন্তান। এর বাইরে কোথাও কোন মানুষের বসতি ছিল না। সুতরাং সেই অঞ্চলটিই আযাবের উপযোগী ছিল, এবং তাদেরই উপর এই আযাব প্রেরিত হয়েছিল। পৃথিবীর অন্যান্য অংশের সহিত এই প্লাবনের বা আযাবের কোন সম্পর্ক ছিল না। [৩৮]

কোন কোন ওলামায়ে ইসলামের বিচক্ষণ ভূ-তত্ত্ববিদগণ এবং কোন কোন জড়বাদী ঐতিহাসিকগণের মতে এই প্লাবন সমগ্র ভূ-পৃষ্টের উপর ব্যাপক ছিল। আর ব্যাপক প্লাবন শুধু এই একটিই নহে বরং তাঁদের মতে এই ভূ-পৃষ্ঠের উপর এই শ্রেণীর বহু প্লাবন এসেছিল তন্মধ্যে ইহাও একটি। তাদের যুক্তি উপরোক্ত প্রথম মতবলম্বীদের 'চিহ্নসমূহ' সংক্রান্ত প্রশ্নের এই উত্তর দিতেছেন যে জাযিরা কিম্বা এরাকে আরবের অংশটুকু ছাড়াও উচ্চ পর্বতসমুহের উপরেও এমন প্রাণীসমুহের দেহ পিঞ্জির পাওয়া গিয়েছে যাদের সম্বন্ধে ভূ-তত্ত্ববিদগনের এই অভিমত যে, এই গুলো জলজ প্রাণী শুধু পানিতেই জীবিত থাকতে পারে। পানির বাইরে এক মুহূর্তেও তাদের জীবিত থাকা খুবই কঠিন। সুতরাং উক্ত চিহ্নসমূহ একথা প্রমাণ করে যে, কোন কালে পানির এক ভীষণ প্লাবণ এসেছিল যা সে সমস্ত পর্বত শিখরকে নিমজ্জিত না করে ছাড়ে নাই। [৩৯]

এতদুভয় অভিমতের উপরোক্ত বিবরণের পর ইহার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ উক্ত প্লাবন নিদিষ্ট অঞ্চলে হয়েছিল কিন্ত ব্যাপক ছিল না। তবে তখন সমগ্র মানবমন্ডলী শুধুমাত্র এ অঞ্চলেই বসবাস করত। এ অঞ্চল ছাড়া অন্যত্র মানববাসের অস্তিত্ব ছিল না এবং পরবর্তী সমগ্র মানব জগৎ নূহ (আ.)-এর বংশধর হতে বিস্তৃতি লাভ করেছে। ان تذرهم يضلوا عبادك আয়াতটিও কিছুটা এদিকে ইঙ্গিত করেছে।

৩৮। ড. মাযহাব্ উদ্দীন ছিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮১

৩৯। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন শুধু এতটুকু বলতে চায় যে, ইতিহাসের এই ঘটনা জ্ঞানী ও বিবেকসম্পন্ন লোকদের ভুলা উচিত নহে বরং স্মরণ রাখা উচিত, যে, আজ হতে হাজার হাজার বৎসর পূর্বে একটি সম্প্রদায় আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীর উপর হটকারীতা করে তাঁর প্রেরিত রাসুল নূহ (আ.)-এর হেদায়াত ও নছীহতের পয়গামকে অবিশ্বাস করেছে,সত্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। ফলে আল্লাহ পাক স্বীয় অসীম কুদরতের নমুনা প্রকাশ করতঃ সেই নাফরমান ও অবাধ্যদেরকে তুফান জলোচ্ছাস দ্বারা ডুবায়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এর ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে নূহ (আ.) ও তার কতিপয় ঈমানদারগণের দলকে সুরক্ষিত করে নাজাত দিয়েছেন।

ان فى ذلك لعبرة لاولى الالباب -

"নিশ্চয় ইহার মধ্যে খাঁটি জ্ঞানবানদের জন্য নছীহত রয়েছে"। [৪০]

নূহ (আ.)-এর ইন্তিকাল ও পরবর্তী বংশধর

নূহ (আ.) তাঁর তিন পুত্র সাম, হাম, ও ইয়াফেসকে দুনিয়াতে রেখে ইহধাম ত্যাগ করেন। সামের বংশধর কুফায়, ইয়ামনে, হেজাযে, শাম ও পাশ্চাত্যে গিয়ে বসবাস শুরু করে। হামের বংশধররা ভারতে এসে বসবাস করে। এখানে তারা নগর বন্দর গড়ে তোলে। আর তুর্কিস্থানে গিয়ে বসবাস শুরু করে ইয়াফেসের বংশধররা। হামের বাংশধর দিয়েই সারা দুনিয়া আবাদ হয়। পাপিষ্ঠ ইবলীস সর্বত্র যেয়ে যেয়ে মূর্তি পূঁজা শিক্ষা দেয়, একদিন এক জাহেল সম্প্রদায়কে জিজ্ঞেস করে তোমরা কার পুঁজা কর। তারা বলে আমরা কার পূঁজা করছি তা জানি না।

পাপাত্তা ইবলিস বলে, তোমাদের বাপ-দাদা কিভাবে কার পুঁজা করত তা আমি তোমাদেরকে বলে দেব। তদানুসারে সে মূর্খ সম্প্রদায়ের কয়েকজনকে সাথে নিয়ে ভারতে আসে এবং তাদেরকে ভারতে প্রচলিত মূর্তি পুঁজা শেখায়। তারা এখান থেকে পাঁচটি প্রতিমা সঙ্গে নিয়ে নিজেদের দেশে ফিরে আসে। [৪১] কুরআন পাকে ইরশাদ হচ্ছে,

"আর তারা বলেছিল তোমরা তোমাদের উপাস্য দেবতাদেরকে পরিত্যাগ কর না এবং ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসর ঠাকুর ত্যাগ কর না। [৪২]

পাপিষ্ট ইবলীসের প্ররোচণার জালে আবদ্ধ হয়ে তাদের সকলেই উল্লেখিত প্রতিমাসমুহের পুঁজা করতে শুরু করে, এভাবেই সারা দুনিয়ায় মূর্তি পুজায় ছেয়ে যায়।

৪০। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৬-৬৭

৪১। তাহের সুরাটী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮

৪২। وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا

আল-কুরআন, ৭১ : ২৩

Dhaka University Institutional Repository

"আদ" এর ইতিহাস

আদ জাতির পরিচিতি

"আদ" প্রকৃতপক্ষে নূহ (আ.)-এর পঞ্চম পুরুষের মধ্যে এবং তাঁর পুত্র সামের বংশধরেরই এক ব্যক্তির নাম। অতঃপর তার বংশধর ও গোটা সম্প্রদায় "আদ" নামে খ্যাত হয়ে গেছে। কুরআন মাজীদ ও আরবের ইতিহাসে "আদ" কে "আদ-উলা" (প্রথম আদ) বলা হয়েছে।[১] সূরা আন্ নজমে বলা হয়েছে ঃ " আর তিনি প্রাচীন "আদ" জাতিকে ধ্বংস করেছেন।"[২]

আবার কোথাও ارام ذات العماد শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বুঝা যায় "আদ" সম্প্রদায়কে "ইরাম"ও বলা হয়। এ সম্পর্কে তাফসীরবিদ ও ইতিহাসবিদদের উক্তি ভিন্নরূপ। অধিক প্রসিদ্ধি উক্তি এই যে, আদের দাদার নাম "ইরাম"। তাঁর এক পুত্র আওসের বংশধররাই "আদ"। তাদেরকে 'প্রথম আদ' বলা হয়।[৩]

আদের জন্য " যাতুল ইমাদ" (সু-উচ্চ স্তম্বের অধিকারী) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ তারা বড় বড় উঁচু উঁচু ইমরাত তৈরি করতো। দুনিয়ায় তারাই সর্বপ্রথম উঁচু উঁচু স্তম্বের উপর ইমারত নির্মাণ করার কাজ শুরু করে।[৪] কুরআন মজিদে তাদের এ বৈশিষ্ট্যকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ।

"হযরত হুদ (আ.) তাদেরকে বলেন ঃ "তোমাদের এ কেমন অবস্থা, প্রত্যেক উঁচু জায়গায় অনর্থক একটি স্মৃতিস্তম্ব গৃহ তৈরি করছো এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছো, যেন তোমরা চিরকাল এখানে থাকবে"।[৫]

দৈহিক আকার আকৃতিতে ও শরীরিক শক্তি সামর্থ্যের দিক দিয়ে "আদ" জাতিকে মানব ইতিহাসে অনন্য বলে চিহ্নত করা হয়। তারা সমকালীন জাতিদের মধ্যে ছিল একটি তুলনাবিহীন জাতি। শক্তি, শৌর্য-বীর্য, গৌরব ও আড়ম্বরের দিক দিয়ে সে যুগে সারা দুনিয়ায় কোন জাতি তাদের সমকক্ষ ছিল না।[৬] কুরআনের সূরা আ'রাফে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

"দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে তোমাদের অবয়বকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ করেছেন"।[৭]

১। মুফতী মুহাম্মদ শফী (রঃ), *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, অনুবাদ, মাওঃ মহিউদ্দিন খান,মদীনাঃ খাদেমুল হারারামাইন, বাদশাহ ফাহাদ, কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, তা.বি. সূরা হুদ এর ব্যাখ্যাংশ

২। وانه اهلك عادا ن الاولى
আল-কুরআন, ৫০ : ৫৩

৩। মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৪

৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৫

৫। اتبنون بكل رايع اية تعبثون - وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون.
আল-কুরআন, ২৬ : ১২৮-১২৯

৬। মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫০

৭। و زاد كم فى الخلق بصطة
আল-কুরআন, ৭ : ৬৯

Dhaka University Institutional Repository

তারা নিজেরাই অহংকার করে বলতো ঃ

" আর আদ এর ব্যাপারে বলতে গেলে বলতে হয়, তারা কোন অধিকার ছাড়াই পৃথিবীর বুকে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করত। তারা বলতঃ কে আছে আমাদের চাইতে বেশী শক্তিশালী ?"[৮]

তাদের সভ্যতা ছিল বড়ই উন্নত ও গৌরবোজ্জ্বল, সু-উচ্চ ইমারত নির্মাণ করা ছিল তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং এ জন্য তদানীন্তন বিশ্বে তারা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল ঃ "তুমি কি দেখনি তোমাদের রব কি করেছেন সু-উচ্চ স্তম্বের অধিকারী ইরমের আদদের সাথে?"[৯]

তাদের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল কয়েকজন বড় বড় জালেম এক নায়কের হাতে। তাদের সামনে কেউ টু-শব্দটিও করতে পারতো না।[১০]

"আর তারা প্রত্যেক সত্যের দুশমন জালেম একনায়কের হুকুম পালন করে"।[১১]

ধর্মীয় দিক থেকে তারা শুধু আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করত না ; বরং শির্‌কে লিপ্ত ছিল। বন্দেগী একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত হওয়া উচিত, এ কথা তারা অস্বীকার করত।

"তারা বলত (হুদ (আ.) কে) তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছ, যে, আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র বন্দেগী করবো এবং আমাদের বাপ দাদারা যাদের ইবাদত করতো তাদেরকে বাদ দেবো"?[১২]

আ'দ জাতির যমানা

আ'দ সম্প্রদায়ের যুগ হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে অনুমান করা হয়। আর কুরআন মজীদে আ'দ সম্প্রদায়কে من بعد قوم نوح (নূহের সম্প্রদায়ের পরে) বলে নূহ (আ.) এর পরবর্তী সম্প্রদায়গুলোর অন্যতম গণ্য করা হয়েছে। ইহা হতে একথাও প্রমাণিত হয় যে, সিরিয়া অঞ্চলে দ্বিতীয়বার আবাদ হওয়ার পরে উমামে সামিয়ার তথা সামের বংশধরদের উন্নতি আ'দ সম্প্রদায় হতেই আরম্ভ হয়।[১৩]

৮। فاما عاد فاستكبروا فى الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة
আল-কুরআন, ৪১ : ১৫

৯। الم تركيف فعل ربك بعاد ـ ارم ذات العماد ـ الفجر
আল-কুরআন, ৮৯ : ৬-৭

১০। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত খ. ১, পৃ. ২১৩

১১। واتبعوا امر كل جبار عنيد ـ هود
আল-কুরআন, ১১ : ৫৯

১২। قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصدقين ـ الاعراف
আল-কুরআন ৭ : ৭০

১৩। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯১-৯২

১৪। প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯২

Dhaka University Institutional Repository

আ'দ জাতির তেরটি পরিবার ছিল। আম্মান থেকে শুরু করে হাযরা মাউত ও ইয়ামান পর্যন্ত তাদের বসতি ছিল। তাদের ক্ষেত খামার গুলো অত্যন্ত সজীব ও শস্য শ্যামল ছিল। সব রকম বাগান ছিল। তারা ছিল সুঠামদেহী ও বিরাট বপুসম্পন্ন।[১৫]

আ'দ জাতির ধর্ম বিশ্বাস

আদ সম্প্রদায় মূর্তিপূজক ছিল। তারা পূর্ববর্তী নবী নূহ (আ.)-এর জাতির মত মূর্তিপুজা এবং মূর্তি নির্মাণ কাজে খুবই অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ছিল। প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলেন, এদের বাতিল 'মাবুদগুলো ও নূহ (আ.)-এর জাতির 'মাবুদগুলোর মত ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুছ, এবং নাসরই ছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে একটি রেওয়ায়ত আছে, তাতে বর্ণিত আছে যে, তাদের একটি মূর্তির নাম "সামুদ" এবং অন্য একটির নাম "হাতির" ছিল। "ছাদা" নামেও তাদের একটি মূর্তি ছিল।[১৬]

আ'দ জাতি সম্পর্কে কুরআনের মন্তব্যঃ পর্যালোচনা

আমি এখন আরবের প্রাচীনতম জাতি "আদ" এর বংশ পরিচয় আকার-আকৃতি ও ধ্বংস সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য উপস্থাপনের চেষ্টা করছি। কুরআনে তাদেরকে "আল এরাম" বলা হয়েছে।[১৭] "আচ্ছা, তুমি কি দেখনি যে, তোমার প্রভু আদ" জাতির সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিলেন? সেই এরাম জাতির প্রতি যারা স্তম্ভের মত হৃষ্ট-পুষ্ট ও দীর্ঘ আকৃতি বিশিষ্ট ছিল, এবং ধন-সম্পদের মধ্যে ছিল। যাদের মত অপর কোন শহরে তখন আর কেউ সৃষ্টি হয়নি।"[১৮]

কুরআনে এক জায়গায় তাদেরকে "প্রাচীন আদ" বলা হয়েছে "এবং তিনিই প্রাচীন আদ জাতিকে বিনাশ করেছেন"।[১৯]

১৫। মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৪

১৬। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯২ ও কাসাসুল আম্বিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

১৭। ডঃ মাযহারউদ্দী সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

১৮। التي لم يخلق مثلها في البلاد. إرم ذات العماد .ألم تر كيف فعل ربك بعاد
আল-কুরআন, ৮৯ : ৬-৮

১৯। وأنه أهلك عادا الأولى .
আল-কুরআন, ৫৩ : ৫০

Dhaka University Institutional Repository

এ আদ জাতির লোকেরা কারা? যাবতীয় লক্ষণ থেকে বুঝা যায় যে, তারা ছিল নূহের পুত্র সামের বংশধর এবং তারা উপদ্বীপে তাদের রাজ্য স্থাপন করেছিল এবং পাশ্ববর্তী অঞ্চলেও তাদের কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিল। এই মত হচ্ছে ইবনে কাসীরের এবং তিনি বলেন যে তাদের আবাস্থল ছিল ইয়ামানে এবং তাদের নিকট প্রেরিত নবী হুদ ইয়ামনে সমাহিত আছেন।[২০]

মৌলানা সুলায়মান নদভী বলেন, আ'দ জাতি শুধু ইয়ামনই শাসন করেনি ; বরং তারা ব্যবিলন, সিরিয়া ও কিছু কালের জন্য মিশরও শাসন করেছিল। তিনি মনে করেন যে, ওল্ড টেষ্টমেন্ট উল্লেখিত অ্যামালেকাত জাতিও মিশরের। হিকস্‌স শাসকরা ছিল আদ জাতিভূক্ত।[২১]

কুরআনের বর্ণনানুসারে আদরা ছিল একটি শক্তিশালী জাতি। এরূপে আদ জাতিও দুনিয়াতে অযথা অহংকার করত এবং বলত, "আমাদের চেয়ে শক্তিতে অধীক শ্রেষ্ঠ আর কে আছে?"[২২]

তারা একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল।

আ'দ জাতি সম্পর্কে কুরআনের আর একটি মন্তব্য হচ্ছে, তারা হিসেব নিকেশের দিনকে একেবারে ভুলে গিয়ে জীবন কাটাত।

"তোমরা কি প্রত্যেক উঁচুস্থানে তামাশার স্তম্ভ নির্মাণ করছো? এবং বড় ঘর বানিয়ে তোমরা উহাতে চিরদিন থাকবে বলে মনে করছ? এবং যখন তোমরা জবরদস্তি কর তখন অত্যন্ত অত্যাচারী হয়ে যাও"।[২৩]

ইহার অর্থ এই যে, যদিও এ বর্তমান জীবন একদিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অনাগত ও অনন্ত জীবনকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে শুধু এ জীবনের জন্যই নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন করে দেওয়ার পরিণতি ও এ জীবনের উন্নতি ও শান্তির পক্ষে মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়।[২৪]

২০। ড. মাযহার উদ্দীন সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯ এবং ইব্‌ন খালদুন, *কিতাব আল ইবার,* কায়রো: দারুল কলম, ১৩৫৫ হি., পৃ. ৫২৫

২১। সুলাইমান নদভী, *আরদ আল-কুরআন,* (কুরআনের দেশ), আজমগর: ১৯৫০, পৃ. ১৩২

২২। من اشد منا قوة .
আল-কুরআন, ৪১ : ১৫

২৩। واذا بطشتم بطشتم جبارين . وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون .أتبنون بكل ريع آية تعبثون
আল-কুরআন, ২৬ : ১২৮-১৩০

২৪। ড. মাযহার উদ্দিন সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬০ এবং আস্‌-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাস সম্পর্কে কুরআনের ধারণা, যদি কোন জাতি বস্তুতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থা অবলম্বন করে এবং বস্তুতান্ত্রিক মূল্যবোধ দ্বারাই পরিচালিত হয় তবে উহা তাদের টিকে থাকার সম্ভবনাকেও নষ্ট করে দেয়। আদ জাতি এইজন্য ধ্বংস হয়েছিল যে, তারা শুধু জাগতিক উন্নতি নিয়েই পুরোপুরি ব্যতিব্যস্ত থাকত। কুরআন আগে বলে যে "আদ জাতি ইহার ক্ষমতার দরুণ খুববেশী অহংকারী হয়ে পড়েছিল।[২৫]

তারা বলে, "আমাদের চেয়ে শক্তিতে অধীক শ্রেষ্ঠ আর কে আছে? তারা কি দেখেনি সেই আল্লাহ যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন । তিনি তাদের চেয়ে শক্তিতে কত অধিক শ্রেষ্ঠ।"[২৬]

তাদের রাসূল হুদ (আ.) তাদেরকে স্মরণ করে দিয়েছেন।

"আল্লাহ তাদেরকে এতকিছু দান করেছেন তারজন্য গর্ব করার কিছু নেই বরং সে কারণে আল্লাহ্‌র নিকট কৃতজ্ঞ থাকাই বাঞ্চনীয়। তাঁর প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর যিনি তোমাদেরকে শিখিয়েছেন যা কিছু তোমরা জেনেছ। পশু ও সন্তান-সন্ততিকে দিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন। আর করেছেন বাগ-বাগিচা ও ঝারর্ণাসমূহ দিয়ে।"[২৭]

আল্লাহ 'আদ' জাতিকে যে সমস্ত বিষয় দান করেছিলেন, তা তাদেরকে আল্লাহ্‌র প্রতি অবনত ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করার পরিবর্তে তাদেরকে অপরের প্রতি অহংকারী ও অত্যাচারী করে তুলেছিল। ইহা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, ধন-সম্পদ, উন্নতি এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী জ্ঞানের ফলশ্রুতি সাময়িক ও অর্থনৈতিক শক্তি, যা সমাজের নৈতিক কাঠামো ও আধ্যাত্মিক শক্তিকে বিনষ্ট করে দেয়, যদি তার সাথে সাথে একটি গভীর অবচেতনা না জন্মে যে, এই সমস্ত কিছুর উৎস হলো মানুষ ও প্রকৃতির উর্ধ্বে অন্য কেউ অর্থাৎ ঐশ্বরিক সত্তা রয়েছে। যার আইনের প্রতি মানুষের অবশ্যই আত্মসমর্পন করা এবং যার ক্ষমতা ও কতৃত্বের ধারণা মানুষের মধ্যে এরূপ একটি সৃষ্টি ভাব এবং নমনীয় অনুভূতির জন্ম নেবে। যার ফলে তার মধ্যে সমাজের অন্যান্য সদস্যের প্রতি পারস্পরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধের উদয় হবে।[২৮]

২৫। ড. মাযহার উদ্দিন সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

২৬। من اشد منا قوة اولم يروا ان الله الذى خلقهم هواشد منهم قوة و كانوا بايتنا يجحدون.
আল-কুরআন, ৪১ : ১৫

২৭। واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون . أمدكم بأنعام وبنين . وجنات وعيون .
আল-কুরআন, ২৬ : ১৩১

২৮। ড. মাযহার উদ্দীন সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

হযরত হুদ (আ.)-এর পরিচয়

হযরত নূহ (আ.)-এর যুগ থেকে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর পূর্ব পর্যন্ত মোট দু' হাজার দু'শ বছরের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দুনিয়াতে মাত্র দু'জন নবীর আগমন ঘটেছিল একজন হযরত হুদ (আ.) ও অপর হযরত ছালেহ (আ.) ।

হযরত নূহ (আ.)-এর বংশধরের মধ্যে আ'দ নামক এক প্রবল ক্ষমতাশালী ও ক্ষমতাবান বাদশা সে যুগে দ্বিতীয় আর কেউ ছিল না। এ বাদশাহর সন্তান-সম্পতি ও বংশধররা সর্বদিক দিয়ে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী ছিল। এ বাদশা আদের নামানুসারে এ সম্প্রদায়ের লোকেরা কওমে আদ বা আ'দবংশীয় লোক নামে ইতিহাস খ্যাত। এদের মধ্যে অনেকের দেহের উচ্চতা ছিল চারশ গজ। এদের মধ্যম শ্রেণীর লোকদের উচ্চতা ছিল দু'শ গজ। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেটে ছিল যারা তাদের দেহের উচ্চতাও ছিল সত্তর গজ। এরা সকলে অত্যন্ত সাহসী ও শক্তিশালী ছিল। আর এ সাহস ও শক্তি মত্তার গৌরবে তারা আল্লাহ ও তার নবীকে ভুলে গিয়েছিল। তারা কোনরুপ সৎকর্মের তোয়াক্কা তো করতই না, বরং ইবলীসের কু-পরামর্শে দেবদেবী সমূহকে উপস্য মনে করে তাদের প্রতিমা তৈরী করে তার উপাসনা করত।[২৯]

আদ জাতির মধ্যে যখন এ অবস্থা প্রবল আকার ধারণ করল, তখন তাদেরকে হিদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলা কওমে আদ সম্প্রদায়ের মধ্য হতেই হুদ (আ.) কে নবী রূপে প্রেরণ করলেন।[৩০] হযরত হুদ (আ.) আ'দ জাতির সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত শাখা "খুলুদ" এর একজন ছিলেন। তিনি সাদা লাল বর্ণের এবং গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন।[৩১]

হুদ (আ.)-এর দাওয়াতী কার্যক্রম

হযরত হুদ (আ.) স্বীয় কওমকে আল্লাহ তা'আলার একত্ব এবং তাঁর 'ইবাদতের প্রতি দাওয়াত জানালেন। মানুষের প্রতি যুলুম করতে নিষেধ করলেন, কিন্তু আ'দ জাতি তাঁর কথার কর্ণপাত করল না। তাকে কঠোরভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং অহংকার ও গর্বের সহিত বলতে লাগল من اشد منا قوة (আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী আবার কে?) আজ সারা পৃথিবীতে আমাদের চেয়ে অধিক জাঁকজমক ও ক্ষমতার মালিক আর কে আছে? কিন্তু হযরত হুদ (আ.) অবিরাম ইসলামের দাওয়াত দিতেই লাগলেন। তিনি স্বীয় কওমকে আল্লাহর আযাবের ভয় প্রদর্শন করতেন। আর অহংকার ও অবাধ্যতার পরিণাম ফল বর্ণনা করে নূহ (আ.) এর কওমের ঘটণাবলী স্মরণ করে দিতেন।

২৯। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯২

৩০। তাহের সুরাটী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৩১। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

Dhaka University Institutional Repository

আবার কোন সময় বলতেন ঃ " হে আমার কওম! নিজেদের দৈহিক শক্তি এবং রাজকীয় ক্ষমতার জন্য অহংকার করিও না। বরং আল্লাহ পাকের শোকর আদায় কর যিনি তোমাদেরকে এ নিয়ামত দান করেছেন। নূহ (আ.)-এর কওম ধ্বংস হওয়ার পর তোমাদেরকে যমিনের মালিক ও অধিপতি বানিয়েছেন। উত্তম জীবিকা, প্রফুল্ল অন্তর এবং স্বচ্ছলতা দান করেছেন, সুতরাং তাঁর নেয়ামত সমূহ ভুলিও না এবং নিজেদের তৈরী মূর্তিসমূহের পূজা হতে বিরত থাক। যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং কোন ক্ষতিও করতে পারে না। মৃত্যু ও জীবন এবং উপকার ও অপকার এক আল্লাহ পাকেরই হাতে। হে আমার জাতি ! মানলাম তোমরা এক দীর্ঘকাল যাবৎ আল্লাহ পাকের অবাধ্যতাচরণে লিপ্ত রয়েছে কিন্তু আজও যদি তাওবা করে লও, তবে আল্লাহ পাকের রহমত খুবই প্রশস্ত এবং তাওবার দরজা এখনো বন্ধ হয়নি। তাঁর দরবারে প্রার্থনা কর, তিনি ক্ষমা করে দিবেন, তাঁর দিকে রুজু হয়ে যাও তিনি ক্ষমা করে দিবেন। পরহেজগারী ও পবিত্রতার জীবন অবলম্বন কর, তিনি তোমাদেরকে বহুগুণে উন্নতি দান করবেন। বেশী হতে বেশী মান মর্যাদা দান করবেন। ধনে ও মানে তোমাদেরকে খুব বাড়িয়ে দিবেন।[৩২]

আদ সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈমানদার লোক তো সামান্য কয়েকজনই ছিল, বাকী সকলেই ছিল উদ্ধত ও অবাধ্য লোকের দল। তাদের নিকট হযরত হুদের এই উপদেশ ও নছীহত নেহাত অস্বস্তি কর বোধ হয়। তারা বরদাশ্‌ত করতে পারত না যে, কেহ তাদের ধ্যান-ধারণায়, তাদের বিশ্বাসে ও আক্বীদায়, তাদের কার্যকলাপে, মোট কথা তাদের যেকোন প্রকারের অভিপ্রায়ে প্রতিবন্ধক হয়। তাদের জন্য দয়ালু উপদেষ্টা সাজে। অতঃএব, তারা এখন এই পথ অবলম্বন করল যে, হযরত হুদের সহিত বিদ্রুপ করতে লাগল, তাদেরকে নির্বোধ সাব্যস্ত করল, নিরংকুশ ধর্মতত্ত্ব ও সততার সমস্ত একাট্য দলিল ও প্রমাণগুলোকে মিথ্যা প্রতিপাদন করতে আরম্ভ করল এবং হযরত হুদ (আ.) কে বলতে লাগল। " হে হুদ! তুমি তো আমাদের নিকট একটি প্রমাণও আনয়ন কর নাই। শুধু তোমার মুখের কথায় আমরা আমাদের 'মাবুদদেরকে ত্যাগ করব না। তোমার উপর ঈমান আনয়ন করব না।"[৩৩]

আমরা তোমর ধোঁকায় পড়বো না যে, তোমাকে আল্লাহর রাসূল বলে মেনে নিব এবং আমাদের 'মাবুদসমূহের পূঁজা ছেড়ে একথা বিশ্বাস করে লইব না যে, আমাদের এ 'মাবুদগণ (প্রতিমা) শ্রেষ্ঠ খোদার সমীপে আমাদের জন্য সুপারিশকারী হবে না। [৩৪]

৩২। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯২-৯৩

৩৩। قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين

আল-কুরআন, ১১ : ৫৩

৩৪। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

হযরত হুদ (আ.) তাদেরকে বললেন, আমি নির্বোধ নহি এবং পাগলও নহি। নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহ পাকের প্রেরিত রাসূল ও পয়গাম্বর। আল্লাহ পাক স্বীয় বান্দাদের হেদায়েতের জন্য নির্বোধ ব্যক্তিকে মনোনিত করেন না। তাহলে তো ইহার লাভের চেয়ে লোকসানই অধিক হয়ে যাবে এবং হেদায়েতের স্থলে পথভ্রষ্টতা এসে যাবে। তিনি এই মহান খেদমতের জন্য স্বীয় বান্দাদের মধ্য হতে এমন ব্যক্তিকে নির্বাচন করেন, যে, সর্বপ্রকারে উক্ত কাজের যোগ্য হয় এবং এই হেদায়েতের কর্তব্য সুচারুরূপে পালন করতে পারে।[৩৫]

" আল্লাহ পাকই খুব ভালরূপে জানেন পয়গাম্বরী পদ কোথায় ন্যস্ত করবেন।"[৩৬]

হযরত হুদ (আ.) বার বার তাদের অন্তরে এই প্রত্যয় জন্মাতে চেষ্টা করলেন যে, আমি তোমাদের শত্রু নহি বন্ধু, তোমাদের নিকট স্বর্ণ-রৌপ্য ও নেতৃত্বের প্রত্যাশী নই বরং তোমাদের মঙ্গল ও সফলতা কামনা করি। আমি আল্লাহ তা'আলার পয়গাম্বরের দায়িত্ব পালন সম্মন্ধে বিশ্বাস ঘাতক নই। বরং বিশ্বস্ত, আমি তাই বলি যা আমাকে বলা হয়। আমি যা কিছু বলি কওমের সৌভাগ্য এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্যই বলি, তাদের চিরস্থায়ী নাজাতের জন্য বলতেছি।[৩৭]

তোমাদের কওমের একজন মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের পয়গাম নাযিল হওয়াতে তোমাদের বিস্মিত হওয়া উচিত নহে। কেননা আবহমান কাল হতে আল্লাহ পাকের নীতি প্রচলিত আছে, যে, মানুষের হেদায়েতের জন্য তিনি তোমাদের মধ্য হতে একজনকে বেছে লন এবং তাকে সম্বোধন করে নিজের পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় বিষয়সমূহ তাঁর মাধ্যমে স্বীয় বান্দাগনের জানাইয়া দিতে থাকেন। প্রকৃতির চাহিদা তো-ইহাই যে, কোন জাতির হেদায়াত ও নছীহত করার জন্য এমন ব্যক্তিকেই নির্বাচন করা হয়, যে ব্যক্তি কথা বার্তায় তাদের মত হয়। তাদের চরিত্র ও অভ্যাস সম্বন্ধে তিনি অবগত থাকেন এবং তাদের সঙ্গে সহজীবন-যাপন করতে থাকেন। এরূপ ব্যক্তির সাথেই জাতির মনের মিল হতে পারে। এরূপ ব্যক্তিই তাদের সত্যিকার পথপ্রদর্শক এবং স্নেহ পরায়ন হতে পারেন।

আ'দ জাতি ইহা শ্রবন করে বিস্ময় ও পেরেশাণীতে পতিত হলো। তারা বুঝতে পারল না যে, এক খোদার এবাদতের অর্থ কি? তারা চিন্তান্বিত ও ক্রোধান্বিত হয়ে ভাবল, কেমন করে পূর্ব পুরুষের প্রথা ও মূর্তি পূজা ত্যাগ করি? ইহা তো আমাদের ও আমাদের পূর্ব পুরুষদের ভীষণ অপমান।[৩৮]

৩৫। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৫

৩৬। الله أعلم حيث يجعل رسالته

আল-কুরআন, ৬ : ১২৪

৩৭। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

৩৮। প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৬

Dhaka University Institutional Repository

অবশেষে তারা অগ্নিশিখার ন্যায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠিল এবং হযরত হুদ (আ.)-এর প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ে বলতে লাগল, তুমি আমাদেরকে খোদার আযাবের ধমক প্রদর্শন করছ এবং এই বলে আমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছ।

"আমি তোমাদের প্রতি এক ভীষণ দিনের আযাব আগমনের আশংঙ্কা করছি। [৩৯]

অতএব, হে হুদ! এখন আর আমরা তোমার ঐ প্রাত্যহিক উপদেশ ও নছীহত শুনতে পারি না। আমরা এমন স্নেহ পরায়ন উপদেষ্টার উপদেশ হতে বিরত রইলাম। যদি প্রকৃতই তুমি তোমার উক্তিতে সত্যবাদী হয়ে থাক তবে সেই আযাব সত্বর আনয়ন কর। যাতে তোমার ও আমাদের মধ্যেকার সংঘাতের অবসান ঘটে। [৪০]

অতএব, সেই বস্তু আনয়ন কর, আমাদের সঙ্গে যে বস্তুর ওয়াদা করছ, যদি তুমি সত্য বাদীদের অন্তভুক্ত হও।" [৪১]

হযরত হুদ (আ.) উত্তর করলেন, যদি আমার অকপট ও সততা পূর্ণ নছীহতের উত্তর ইহাই হয়, তবে "বিসমিল্লাহ"। আর আযাবের যদি তোমাদের এতই সখ হয়, তবে ইহাও দূরে নহে। [৪২]

" নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হতে গযব ও তোমাদের উপর এসেই পড়েছে।" [৪৩]

তোমাদের লজ্জা হয় না যে, তোমরা স্বহস্তে নির্মিত কতকগুলো মূর্তিকে মনগড়া নামে ডাকছো এবং তোমরা ও তোমাদের পূর্ব পুরুষগণ আল্লাহর দেয়া কোন প্রমাণ ব্যতীত মনগড়া নিয়মে ইহাদেরকে নিজেদের সুপারিশকারী বলে বিশ্বাস করছে? আর আমার উজ্বল ও স্পষ্ট প্রমাণসমূহ হতে মুখ ফিরিয়ে অবাধ্য হয়ে আযাবের দাবী করতেছ? যদি তোমাদের আযাবের এতই সখ হয় তবে এখন তোমরাও আযাবের অপেক্ষা করতে থাক। সময় নিকটবর্তী হয়ে আসছে। [৪৪]

৩৯। إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم

আল-কুরআন, ২৬ : ১৩৫

৪০। তাহের সুরাটী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

৪১। فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصدقين .

আল-কুরআন, ৭ : ৭০

৪২। তাহের সুরাটী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

43। قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين

আল-কুরআন, ৭ : ৭১

৪৪। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

Dhaka University Institutional Repository

এই মর্মে আল্লাহ্ পাক বলেন "তোমরা কি আমার সহিত ঐ সমস্ত মনগড়া নাম যদেরকে তোমরা ও তোমাদের পূর্ব পুরুষেরা নিজের হাতে নির্মাণ করে নিয়েছে। যাদের পূজনীয় হওয়ার পক্ষে তোমাদের নিকট আল্লাহ প্রদত্ত কোন প্রমাণ নাই। এখন তোমরা আল্লাহ্র আযাবের অপেক্ষা করতে থাক। আমিও অপেক্ষা করতে থাকব।" [৪৫]

আদ জাতির প্রতি আল্লাহ্র আযাব

আদ জাতির দুষ্টমি ও বিরোধিতা এবং নিজেদের পয়গাম্বরের শিক্ষার প্রতি সীমাহীম শত্রুতা ও বিরোধ যখন চরমে পৌঁছিল, তখন এ সমস্ত অপকর্মের প্রতিফল এবং কর্মফলের খোদায়ী কানুন কার্যকারী করার সময় এসে পৌঁছিল এবং আল্লাহ পাকের আত্ম মর্যাদায় আঘাত লাগল। সুতারাং আসমানী আযাব সর্বপ্রথম দুর্ভিক্ষের আকার ধারণ করল। আদ সম্প্রদায় ভীষণ ঘাবড়িয়ে গেল, অধীর হলো, খুবই দুর্বল মন ও অক্ষম দেখা যেতে লাগল। তখনও স্ব-জাতির সমবেদনার জোশ হযরত হুদ (আ.) কে উদ্বুদ্ধ করল। অতএব, নিরাশ হওয়ার পরেও আর একবার কাওমকে বুঝালেন, আল্লাহ্র পথ ধর, আমার উপদেশবলীর প্রতি ঈমান আন, হইকালেও এবং পরকালেরও। অন্যথায় পরিতাপ করবে, কিন্তু হতভাগ্য কাওম-এর উপর এই নছীহতের কোন ক্রিয়াই হইল না; বরং তাদের শত্রুতা ও বিরোধিতা আরো বহু গুনে বেড়ে গেল, তখন ভয়ংকর রুপে আযাব এসে তাদেরকে ঘিরে ফেলল। একাধারে আট দিন ও সাত রাত্রি পর্যন্ত প্রবল বেগে ঝড় হলো তাদেরকে ও তাদের বস্তুকে ওলটপালট করে দিল। শক্তিশালী ও সবল আকৃতির মানুষ যারা দৈহিক শক্তির গর্বে অবাধ্যতাচরণে মত্ত ছিল এমনভাবে অসাড় অনুভূতিহীন অবস্থায় দৃষ্ট হতে লাগল, যেমন প্রবল ঝড়ে বিরাট স্থূলকায় বৃক্ষগুলো নিষ্প্রান হয়ে পড়ে থাকে। মোটকথা তাদেরকে অস্তিত্বের জগৎ হতে মুছে ফেলা হল। [৪৬]

তখনকার যুগে প্রথা ছিল তারা কোন বিপদাপদে পতিত হলে কাবা ঘরে গিয়ে সমবেত ভাবে প্রার্থনা করত। প্রথা অনুসারে নিজেদের মধ্য হতে কিছু লোককে মক্কায় পাঠাল। যাতে তারা সেখানে গিয়ে আল্লাহ পাকের কাছে প্রার্থণা করে, যাতে বিপদ দূর হয়ে যায়। বৃষ্টি বর্ষিত হয়। তৎকালে মক্কায় আমালিফা বংশের কিছু লোক বাস করত। তখন আমালিকা সম্প্রদায়ের প্রধান ছিল মুয়াবিয়া ইবন আবু বকর। ভিনদেশী যেসব লোক আসত তাদের মেহমানদারী আমালিকা সম্প্রদায়ের লোকেরা করত।

৪৫। قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين

আল-কুরআন, ৭ : ৭১

৪৬। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৮ ও তাহের সুরাটী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭২

Dhaka University Institutional Repository

এ হিসাবে আদ জাতির প্রতিনিধি দলও মুয়াবিয়া বিন আবু বকরের মেহমান হল। দুর্ভিক্ষের কারণে তারা এক দীর্ঘ সময় ধরে ভুখা নাঙ্গা ছিল। মক্কায় পৌছে সম্প্রদায়ের কথা ভুলে গিয়েছিল। তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা যে উদ্দেশ্যে তাদেরকে পাঠিয়েছে তাও তারা ভুলে গিয়েছিল। মুয়াবিয়া ইব্ন আবু বকর লজ্জার কারণে নিজে কিছু বলতে পারলেন না। তাই তিনি গায়িকাদের কিছু কবিতা শিখিয়ে দিলেন। কবিতাগুলোর অর্থ ছিল। হে লোকেরা! তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য দো'আ কর। যাতে তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করেন। তোমরা তো ভোগ বিলাসে মত্ত কিন্তু তোমাদের জাতির অবস্থা খুবই খারাপ ও নাজুক। গায়িকাদের মুখে কবিতা শুনে তারা সতর্ক হয়ে গেল এবং দো'আ করার জন্য কাবা ঘরের সামনে উপস্থিত হয়ে দো'আ করল।

দো'আর পর সাদা, কাল ও লাল বর্ণের তিনটি খন্ড মেঘ আকারে দেখা গেল। আর তখন আসমান হতে এক আওয়াজ এলো যে, তোমরা মেঘ খন্ডত্রয় হতে যেকোন একটি স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য বেছে নাও। তারা মেঘখন্ডত্রয় থেকে কাল বর্ণের মেঘ খন্ডটি বেছে নিল। তাদের ধারণা ছিল কাল বর্ণের মেঘখন্ডে অধিক পানি থাকবে। অতঃপর কাল মেঘ খন্ড তাদের সাথে তাদের সম্প্রদায়ের দিকে উড়ে চলল। মেঘখন্ড নিটবর্তী হলে তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা তা দেখেতে পেয়ে খুবই আনন্দিত হল।[৪৭]

কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে ঃ

"অতঃপর এ মেঘখন্ডটি তাদের জনপদের দিকে আসতে দেখে তারা বলল, এদিকে আগত মেঘ খন্ডটি আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ করবে"।[৪৮]

কিন্তু আদ জাতির এক মহিলা মেঘটি দেখে বুঝতে পেরেছিল এ মেঘ রহমতের মেঘ নয়; বরং এটি আযাব হিসেবে জনপদের দিকে আসছে। আল্লামা আলুসী (রহঃ) এক বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, যার সার কথা হল, এ মেঘখন্ড যে আযাব নিয়ে এসেছিল এক মহিলা প্রথমে তা বুঝতে পেরেছিল যে, মেঘখন্ডটি পানির পরিবর্তে অগ্নি বহন করে জনপদের দিকে এগিয়ে আসছে। আযাব অবতীর্ণের পর অন্যেরা বুঝল প্রকৃতপক্ষে এটা বৃষ্টি বহনকারী মেঘ না। অগ্নি বহনকারী আযাব।[৪৯]

আল্লাহপাক ইরশাদ করেন-

" বরং এটা এমন জিনিস যার তড়িৎ আগমন তোমরা চেয়েছিলে এটা প্রবল তুফান যাতে মর্মন্তুদ আযাব রয়েছে"।[৫০]

৪৭। তাহের সুরাটী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২-৭৩

৪৮। فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارضا ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم . আল-কুরআন, ৪৬ : ২৪

৪৯। তাহরে সুরাটী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

৫০। فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارضا ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم . আল-কুরআন, ৪৬ : ২৪

Dhaka University Institutional Repository

মেঘখন্ড আদ জাতির জন্য শান্তিদায়ক বৃষ্টির বদলে আল্লাহর আযাব হয়ে আগমন করেছে ক্রমাগত সাত রাত আট দিন পর্যন্ত ঝড় বইতে থাকে। ঝড় এত প্রবল বেগে প্রবাহিত হচ্ছিল যে, আ'দ জাতির সুদৃঢ় অট্টালিকাসমূহ ভেঙ্গে চুর্ণবিচুর্ণ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল। বড় বড় বৃক্ষ সমূহ চর্বিত ঘাসের ন্যায় শিকড়সমূহ তুলে উপরে নিক্ষেপ করেছিল। শক্তির দাবিদার আদ সম্প্রদায়ের লোকদেরকে এক একজন করে উপরে তুলে সেখান থেকে মাথা নিচের দিকে করে নিক্ষেপ করে সকলকে ধ্বংস করে দিল। মাত্র চার হাজার লোক যারা হযরত হুদ (আ.)-এর অনুগত শুধুমাত্র তারাই বেঁচেছিল।[৫১]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তাদের ধ্বংসের কথা বর্ণনা করেছেন-

" আর আদ জাতির লোকদের ধ্বংস করা হয়েছিল এক ধরনের প্রবল বায়ুর সাহায্যে যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল। আর ক্রমাগত সাত রাত আট দিন এটা প্রবাহিত হয়েছিল। হে শ্রোতা! তুমি দৃশ্য দেখলে সেখানে ধরাশায়ী এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেতে যেন তারা পতিত কতগুলো খেজুর বৃক্ষের কান্ড। তুমি কি তাদের মধ্যে কাকেও অবশিষ্ট দেখতে পাচ্ছ?"[৫২]

" আর কাওমে আদের যখন আমি তাদের উপর এক অশুভ ঝঞ্ঝা বায়ু চালিত করলাম, উহা যেই বস্তুর উপর দিয়ে অতিক্রম করত উহাতে পুরাতন পচা হাড়ের ন্যায় চুর্ণ-বিচুর্ণ না করে ছাড়ত না।[৫৩]

" আদ সম্প্রদায় মিথ্যা প্রতিপাদন করল, অনন্তর কেমন হয়েছিল আমার আযাব এবং আমার সতর্কীকরণ, আমি তাদের উপর প্রবল ঝড় প্রেরণ করলাম এ অশুভ দিনে যা অটল ছিল। উপড়াইয়া ফেলিল লোকাদিগকে তারা যেন উপড়ান খেজুর গাছের শিকড়। অনন্তর কেমন হয়েছে আমার আযাব ও সতর্কীকরণ।"[৫৪]

৫১। তাহরে সুরাটী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

৫২। وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية . سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية . فهل ترى لهم من باقية .

আল-কুরআন, ৬৯ : ৬-৮

৫৩। وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم . ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم

আল-কুরআন, ৫১ : ৪১-৪২

৫৪। كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر . إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر . تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر . فكيف كان عذابي ونذر .

আল-কুরআন, ৫৪ : ১৮-২১

Dhaka University Institutional Repository

"তুমি কি দেখিয়াছ, তোমার রব আ'দে ইরামের সহিত কেমন আচরণ করেছেন? যাহা বড় বড় স্তম্ভ বিশিষ্ট ছিল। উহাদের ন্যায় সারা শহরগুলোতে নির্মিত হয় নাই।"[৫৫]

হযরত হুদের ওফাত

আরববাসীরা হযরত হুদ (আ.)-এর ওফাত এবং তাঁর পবিত্র কবর সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের দাবী করে থাকে। হাযরামাউতের অধিবাসীরা দাবী করে যে, আদ সম্প্রদায় বিধস্ত হওয়ার পর তিনি হাযরামাউতের দিকে হিজরত করে চলে আসনে এবং সেখানেই তার ইন্তিকাল হয় এবং ওয়া দিয়ে বারহুতের নিকট হাযরা মাউতের পূর্বাংশ 'তারীম' শহরের প্রায় দুই মান্‌জিলের মাথায় তাকে দাফন করা হয়।

ফিলিস্তিনবাসীরা বলেন, তিনি ফিলিস্তিনে সমাহিত হয়েছেন। তারা সেখানে তাঁর কবর পাকা করে রেখেছেন। তারা সেখানে বাৎসরিক ওরস করে থাকে।[৫৬]

কিন্তু এ রেওয়াতগুলোর মধ্যে হাযরা মাউতের রেওয়াতটি শুদ্ধ এবং জ্ঞানানুগ বলে বোধ হয়। কেননা আদ জাতির বস্তিগুলো হাযরা মাউতের সন্নিকটে ছিল। সুতরাং স্থানীয় সংকেতে ইহাই বুঝা যায় যে, তাদের ধ্বংসের পর হযরত হুদ (আ.) নিকটেই বস্তিগুলোতে অবস্থান করে থাকেবন, এবং সেখানেই ইন্তিকাল করে থাকবেন। আর তা এই হাযরামাউতেই বটে।[৫৭]

৫৫। الم تركيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التى لم يخلق مثلها فى البلاد .
আল-কুরআন, ৮৯ : ৬-৮

৫৬। তাহের সুরাটী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

৫৭। হিফযুর রহামন, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৮

Dhaka University Institutional Repository

'সামুদ' জাতির ইতিহাস

সামুদের বংশ পরিচয়

হযরত সালেহ (আ.) যে সম্প্রদায়ে জন্মলাভ করেন, উহার নাম 'সামুদ'। সামুদের উল্লেখ কুরআন মজীদের নয়টি সূরার মধ্যে করা হয়েছে। যথা ঃ আ'রাফ, হুদ, হিজর, ফুছছিলাত, আন্‌নাজম, আল্‌-কামার, আল-হাক্কাহ, আশ্‌শাম্‌স। বংশজ্ঞান সম্বন্ধীয় ওলামায়ে কেরামকে কাওমে সামুদের পয়গাম্বর হযরত সালেহ (আ.)-এর বংশ পরিচয়ের বর্ণনায় বিভিন্ন মতাবলম্বী দেখা যাচ্ছে। বিখ্যাত হাফেজে হাদীস ইমাম বাগাবী (রঃ) তাঁর বংশ পরিচয় দিয়েছেন এভাবে ইব্‌ন মাশেহ ইব্‌ন উবাইদ ইব্‌ন হাদের ইব্‌ন সামুদ। আর বিখ্যাত তাবেঈ ওহাব ইবনে মুনাবেবহ নিম্নরূপ উল্লেখ করেছেন। সালেহ ইব্‌ন উবাইদ ইব্‌ন জাবের ইব্‌ন সামুদ।[১]

হযরত সালেহ (আ.) হতে সামুদ পর্যন্ত ইমাম বাগাবী (রহঃ) যে সমস্ত যোগ শৃঙ্খলা লাগিয়েছেন, নসব সম্বন্ধীয় 'আলিমদের নিকট তাই ঐতিহাসিক দিক দিয়ে প্রবল ও সত্য সংলগ্ন।

এই নসবনামা হতে ইহাও পরিস্কার হয়ে যায় যে, সে কাওমটির মধ্যে হযরত সালেহ (আ.)ও একজন। 'সামুদ' এই জন্য বলা হয় যে, সেই বংশে আদি পুরুষের নাম 'সামুদ' এবং এ কাওম বা গোত্র তাঁরই সহিত সম্বন্ধযুক্ত।[২]

"সামুদ" হতে হযরত নূহ (আ.) পর্যন্ত নসবনামা সম্বন্ধে দুটি মত রয়েছে। (১) সামুদ ইবন আমের ইব্‌ন এরাম ইবন শাম ইবন নূহ (আ.)। (২) সামুদ ইবন আদ ইবন আওছ ইব্‌ন এরাম ইবন শাম ইবন নূহ (আ.)।

সাইয়্যেদ মাহমুদ আলসী (রঃ) তাফসীর রুহুল মা'আনীতে বলেন, ইমাম সালবী দ্বিতীয় মতটি প্রবল মনে করেন।[৩]

যাহোক উভয় রিওয়ায়তের ঐক্যমতে একথা প্রমাণিত হয় যে, সামুদ সম্প্রদায় সামের বংশধরগণের একটি শাখা এবং সম্ভবতঃ নিশ্চিতরূপেই বলা যায় ইহারাই সে সমস্ত লোক যারা ১ম আদ সম্প্রদায় বিধ্বস্ত হওয়ার কালে হযরত হুদ (আ.)-এর সহিত রক্ষা পেয়েছিল এবং এই বংশই দ্বিতীয় আদ নামে পরিচিত। আর নিঃসন্দেহে এই কাওমই "আরবে বায়েদাহ" বা (বিধ্বস্ত আরবী বংশ) এর অন্তর্গত।[৪]

১। তাহের সূরাটী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১১

২। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১১২

৩। সাইয়েদ মাহমুদ আলুসী (রহ.), *তাফসীরে রুহুল মা'আনী*, দিল্লীঃ মাকতাবা রশীদিয়া, তা.বি, খ. ৯, পৃ. ১৪২

৪। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১২

Dhaka University Institutional Repository

হযরত হুদ (আ.)-এর ইন্তিকালের পর হযরত হুদ (আ.)-এর দেখানো পথে ধর্ম পালন করতে থাকে। কিন্তু কিছুকাল এভাবে চলার পর তারা ইবলিসের প্ররোচণায় পথভ্রষ্ট হয়ে গেল ও মূর্তি পূঁজায় আত্মনিয়োগ করল। ঠিক এমন সময় শাম ও হিজাযের মধ্যবর্তী স্থানের অধিবাসী শাম নবীর বংশীয় "সামুদ"নামক এক প্রভাবশালী ব্যক্তি আ'দ বংশের ধ্বংসের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে তাদের রাজ্যে আগমন করে সিংহাসনে উপবেশন করল। তাঁর শক্তি সামর্থ তেজ-বীর্য এবং বিচক্ষণতার গুণে দেশ অচিরেই সুখ শান্তি এবং প্রাচুর্যে ভরে উঠল। দেশের লোকেরা সম্পদশালী হয়ে উঠল। ফলে ক্রমেই তারা আল্লাহ্‌র পথ ভুলে ইবলিসের দেখানো পথে চলে যেতে লাগল। বাদশাহ সামুদের বংশীয় লোকের সংখ্যাও অধিক স্বচ্ছলতার কারণে দিন দিন অহংকারী হয়ে উঠল। আর সাথে সাথে সত্য ধর্ম ও রীতিনীতি ত্যাগ করে হুদ (আ.)-এর অনুসারীদের ন্যায় মূর্তি পূঁজায় অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিল। এমনকি তাদের চেয়ে অধিক অসদাচারী হয়ে উঠল।[৫]

সামুদ সম্প্রদায়ের বসতি

সামুদ সম্প্রদায়ের বসতি ছিল হিজর নামক স্থানে। কুরআন মাজীদে তাদেরকে "আসহাফে হিজর" বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- "হিজরবাসী রাসূলদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে।"[৬]

হেজায ও সিরিয়ার মধ্যস্থলে "ওয়াদিউল ক্বোরা" পর্যন্ত সেই প্রান্তরটি দেখা যায়। এই সমুদয়ই তাদের বাসস্থান ছিল। অধুনা উহা "ফাজ্জুন্নাকাহ" নামে প্রসিদ্ধ। কাওমে সামুদে বস্তি সমূহের ধ্বংসাবশেষ ও উহার চিহ্নসমূহ আজও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এই কালেও কোন কোন মিশরী তত্ত্বজ্ঞানীরা উহা স্বচক্ষে দর্শন করেছেন। তাদের বর্ণনা এরুপ যে, তারা এমন একটি বাড়ীতে প্রবেশ করেছিলেন যাকে "শাহী হাবিলী" অর্থাৎ রাজকীয় প্রসাদ বলা হত। উহাতে বহু কামরা রয়েছে এবং সেই প্রাসাদের সহিত একটি অতি বৃহৎ হাউজ রয়েছে এবং গোটা বাড়ীটি পাহাড় কেটে নির্মাণ করা হয়েছে।[৭]

আরবের বিখ্যাত ঐতিহাসিক মাসউদী লিখেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি সিরিয়া হতে হেজাযে আগমন করে তার পথিপার্শ্বে কওমে সামুদের বিধ্বস্ত-বস্তি সমূহের ভগ্নাবশেষ এবং উহার পুরাতন চিহ্নসমূহ তাদের দৃষ্টিগোচর হয়।[৮]

হিজরের এই স্থানটি যা "হিজরে সামুদ" বলে পরিচিত, মদীনা শহর হতে দক্ষিণ পূর্বদিকে এমনভাবে অবস্থিত যে, আকাবা উপসাগর উহার সম্মুখে পড়ে।

৫। তাহের সুরাটী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

৬। ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين
আল-কুরআন, ১৫ : ৮০

৭। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১৪ ও তাহের সুরাটী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

৮। ورممهم باقية بادية فى طريق من ورد من الشام (ج ٣ ص ١٣٩)

Dhaka University Institutional Repository

আ'দ সম্প্রাদায়কে যেমন "আদে এরাম" বলা হয়েছে, তেমনি আদে এরামের ধ্বংসের পরবর্তী সম্প্রদায়কে "সামুদে এরাম" বা দ্বিতীয় আদ বলা হয়েছে।[৯]

"মসনদ" নামক হাদীস গ্রন্থে হযরত ইব্ন ওমর (রাঃ) হতে এক বর্ণনায় পাওয়া যায় সামুদ গোত্র "হিজর" নামক স্থানে বসবাস করত। হিজরী নবম সনে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন তাবুক অভিযানে বের হয়েছেন তখন হিজর নামক স্থানে বিশ্রাম করার জন্য তাবু স্থাপন করেন। লোজকজন যে সকল কূপ হতে পানি সংগ্রহ করে সামুদ গোত্রের লোকজন এসকল কূপ হতে পানি সংগ্রহ করত। তারা পানি সংগ্রহ করে রুটি প্রস্তুত করার আটা খামিরা বানাতে শুরু করল, আর গোস্ত রান্না করার জন্য উনুনের উপর হাঁড়ি চড়িয়ে দিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট এ সংবাদ পৌছার পর তিনি পানি ফেলে দিতে নির্দেশ দিলেন। তাঁরা পানি ফেলে দিল। আর পানিগুলা আটা উটকে খাওয়াল।

অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাদের সাথে নিয়ে এ স্থান ত্যাগ করে যে কূপ হতে হযরত সালেহ্ (আ.) এর উটনী পানি পান করত সে কুপের কাছে এসে তাবু স্থাপন করলেন। তিনি তাদের এ কূপ হতে পানি সংগ্রহ করতে অনুমতি দিলেন আর আযাব প্রাপ্ত এ গোত্রের বস্তিতে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন। তিনি বললেন, তাদের উপর যে আযাব নাযিল হয়েছে, এ ধরনের আযাব তোমাদের উপর নাযিল হয় কিনা এ সম্পর্কে আমি ভয় করছি। সুতরাং তাদের বস্তিতে প্রবেশ করো না।[১০]

সামুদ সম্প্রদায়ের বস্তি বা অট্টালিকাগুলো আ'দ সম্প্রদায়ের কারিগরি ও শিল্প বিদ্যার ফলশ্রুতি। অধিকন্ত সামুদ সম্প্রদায় অট্টালিকা নির্মাণ শিল্পে আরো বিশেষ দক্ষ ও পারদর্শী ছিল। পবিত্র কুরআনে হযরত সালেহ্ (আ.)-এর উক্তিও তার প্রমাণ বহন করে।[১১]

"আর তোমরা ঐ সময় টুকু স্মরণ কর, যখন আল্লাহ পাক তোমাদিগকে ভূ-পৃষ্ঠের উপর স্থান দিলেন। ফলে ভূ-পৃষ্ঠে উহার নরম অংশগুলোর উপর অট্টালিকা নির্মাণ করেছ। আর পাথর কেটে পাহাড়ের উপর বাড়ী ঘর নির্মাণ করেছ।[১২]

৯। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

১০। তাহের সুরাটী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

১১। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ১১৪

১২। واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

আল-কুরআন, ৭ : ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

সামুদ সম্প্রদায়ের ধর্ম বিশ্বাস

সামুদ সম্প্রদায় তাদের পূর্ব পুরুষদের ন্যায় মূর্তিপূজক ছিল, তারা আল্লাহ ছাড়া বহু মা'বুদের পূঁজা ও শির্কের মধ্যে লিপ্ত ছিল। সুতরাং তাদের সংশোধনের নিমিত্ত এবং সত্য প্রচারের জন্য তাদের গোত্র হতে হযরত সালেহ্ (আ.) কে উপদেষ্টা, পরগাম্বর ও রাসূল নিযুক্ত করে পাঠানো হলা, যেন তাদেরকে সৎপথে আনয়ন করতে পারেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত সমূহ স্মরণ করে দেন। যে সমস্ত নেয়ামত তারা সর্বদা ভোগ করছে। আর তাদেরকে স্পষ্টরূপে বলে দেন যে, সমগ্র বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু আল্লাহর একত্ব ও এককতার সাক্ষ্য বহন করে থাকে। বিশুদ্ধ দলীল ও নিরুত্তরকারী প্রমাণসমূহের সাহায্যে তাদেরকে পথভ্রষ্টতা তাদের চোখের সম্মুখে তুলে ধরেন এবং বলে দেন যে, এবাদত বন্দেগীর যোগ্য এক আল্লাহ পাক ছাড়া আর কেহই নহে।[১৩]

সালেহ (আঃ)-এর দাওয়াত ও তাবলীগ

হযরত সালেহ (আ.) স্বীয় গোত্রকে শির্ক ও প্রতিমা পূঁজা পরিত্যাগ করে আল্লাহ্র একত্বের স্বীকৃতি প্রদানের আহবান জানালেন। কুরআন পাকে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

"সামুদ গোত্র সকল রাসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করে। যখন তাদের স্বগোত্রীয় রাসূল সালেহ (আ.) তাদেরকে আহবান করলেন যে, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় কর না? আমি তোমাদের নিকট আমানতদার রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। সুতরাং ভয় কর আল্লাহকে এবং অনুগত হও আমার। তবে জেনে রেখ যে, আমি তোমাদের নিকট এ দাওয়াতের বিনিময়ে কিছুই চাই না।"[১৪]

হযরত সালেহ (আ.) তাদেরকে বিভিন্নভাবে উপদেশ দিয়ে সৎপথে আনার চেষ্টা করেন। তিনি তাদের প্রতি আল্লাহ্র দেয়া নেয়ামতের কথা স্মরণ করান এবং তাদের কৃত পাপের জন্য মহান রব আল্লাহ্ পাকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার আহবান জানান। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

"হে আমার জাতির লোকেরা! তেমরা কেবল আল্লাহরই ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। তিনি তোমাদেরকে যমীন থেকে সৃষ্টি করে যমীনের উপর বসবাস করতে দিয়েছেন। কাজেই এই মহান নিয়ামত দাতার কাছে স্বীয় কৃতকর্মের অপরাধের ক্ষমা চাও। অনন্তর তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন কর। নিঃসন্দেহে আমার বর ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের নিকটবর্তী এবং তাদের অপরাধ মার্জনাকারী।"[১৫]

১৩। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১৬

১৪। إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون

আল-কুরআন, ২৬ : ১৪২

১৫। وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب

আল-কুরআন, ১১ : ৬১

Dhaka University Institutional Repository

হযরত সালেহ (আ.)-এর গোত্রের লোকেরা তার নসিহত ও উপদেশ কবুল না করে তারা তাকে পথভ্রষ্ট বলে প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লাগল। তারা বলতে লাগল নবুয়তের দাবী করার পূর্বে হযরত সালেহ (আ.) এর উত্তম গুনাবলী ও তাঁর যোগ্যতা প্রত্যক্ষ করে তারা আশা করেছিল যে, তিনি তাদের গোত্রের নেতৃত্ব দিবেন। তারা তাকে সামনে রেখেই পূর্ব পুরুষদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে যাবেন।

কিন্তু হযরত সালেহ (আ.) নবুয়তের দাবী করে তাদের সমস্ত আশা ভরসা পানিতে ভাসিয়ে দিল। কারণ তিনি তাদের পূর্ব পুরুষদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহ্‌র 'ইবাদতের দিকে আহবান করছেন। অথচ তারা কোন অবস্থায়ই স্বীয় পূর্ব পুরুষের উপাস্যদের পরিত্যাগে সম্মত নয়।[১৬] তারা সালেহ (আ.) কে বলল ঃ

"তারা বলল, হে সালেহ! আগে তুমিই ছিলে আমাদের নিকট আশার স্থল তুমি আমাদের নিষেধ করছ আমাদের বাপ-দাদাদের উপাস্য গুলোর উপাসনা করতে। আর যে দিনের দিকে তুমি আহবান করছ সে সম্পর্কে আমরা খুব সন্দেহের মধ্যে রয়েছি।[১৭]

হযরত সালেহ (আ.) তাদের উত্তরে বললেন– "হে আমার জাতির লোকেরা! আমি যদি আমার রবের পক্ষ হতে আমার প্রতি অনুগ্রহ করার পর আমি তার অবাধ্য হয়ে গেলে আল্লাহ্‌র কঠিন শাস্তি হতে আমাকে কে রক্ষা করবে। সুতরাং তোমরা আমার ক্ষতিই করতে চাচ্ছ।"[১৮]

হযরত সালেহ (আ.)-এর উটের ইতিহাস

হযরত সালেহ (আ.) তাঁর গোত্রের লোকেদেরকে বার বার আল্লাহ্‌র দ্বীনের প্রতি আহবান করতে থাকেন। কিন্তু তারা তাঁর আহবানে সাড়া তো দেয়নি বরং উত্তর উত্তর তাদের বিরোধিতা আরো চরমে উঠলো এবং কিভাবে তাকে হেস্ত ন্যাস্ত করা যায় এবং সত্যের প্রচার ও প্রসারের পথে বাধা সৃষ্টি করা যায়। সে ব্যাপারেই তারা প্রয়াসী হয়। যদিও তখন পর্যন্ত মাত্র কয়েকজন দুর্বল ও অসহায় লোক ঈমান গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সম্প্রদায়ের লোকেরা বাতিল মতামত ত্যাগ করেনি। আল্লাহ্ প্রদত্ত সুখ-সম্পদ ও শক্তি-সামর্থের মধ্যে ডুবে থেকে নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করেনি। বরং গর্ব অহংকারে মত্ত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। অবশেষে তারা হযরত সালেহ (আ.)-এর নবুয়তের সত্যতার উপর দলীল আনার দাবী তুলেছে।[১৯]

১৬। তাহের সুরাটী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

১৭ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريبا

আল-কুরআন, ১১ : ৬২

১৮ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسيرا

আল-কুরআন, ১১ : ৬৩

১৯। তাহের সুরাটী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৩ ও হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২৩-১২৪

Dhaka University Institutional Repository

"তুমি তো আমাদেরই মত মানুষ। অতএব যদি তুমি সত্যবাদী হও, তাহলে তোমার নবুয়তের স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ কর।"[২০]

হযরত সালেহ (আ.) তাদের দাবীর জবাবে স্বীয় নবুয়তের সত্যতার উপর প্রমাণ পেশ করতে সম্মত হলেন, এবং প্রমাণের ধরন কি হবে তিনি তাদেরকে তা জিজ্ঞেস করলেন। হিজর শহরের উপকণ্ঠে একটি পাথর ছিল। সে পাথরটির নাম ছিল "কাতেবা"। তারা বলল, তিনি যেন তাঁর নবুয়তের সত্যতা হিসেবে উক্ত পাথর হতে দশ মাসের গর্ভবর্তী একটি উটনী বের করে আনেন। আর তা বের হওয়ার সাথে সাথে যেন সে বাচ্চা দেয়। হযরত সালেহ (আ.) তাদের থেকে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি নেন যে, যদি আল্লাহ পাক তাদের দাবী অনুযায়ী মু'জিযা প্রকাশ করেন তাহলে তারা ঈমান গ্রহণ করবে কি না? তারা সকলে ওয়াদা করল যে, যদি আল্লাহ পাক তাদের চাহিদা মোতাবেক মু'জিযা প্রকাশ করেন তাহলে তারা সকলেই ঈমান গ্রহণ করবে। তাদের ওয়াদা গ্রহণ করে হযরত সালেহ (আ.) নামায আদায় করে আল্লাহ্‌র দরবারে দো'আ করলেন। তিনি দো'আতে থাকা অবস্থায়ই পাথরটি নড়ে উঠল। পাথর থেকে দশ মাসের গর্ভবর্তী এক উটনী বের হয়ে আসল।

আর সাথে সাথে উটনীর একটি বাচ্চা জন্ম নিয়ে উটনীর আশে পাশে ঘুরা ফেরা করতে লাগল। হযরত সালেহ (আ.)-এর মু'জিযা দেখে সামুদ জাতির প্রধান আমর পুত্র জুনদা ও তার সঙ্গী সাথিরা ঈমান আনল। অন্যান্যরাও ঈমান আনতে চেয়েছিল কিন্তু যাওয়াব বিন আমর বিন লবীদ ও এ গোত্রের প্রতিমা প্রস্তুত কারক আল হাবাব এবং তাদের গনক ঠাকুর রিবার প্রভৃতিরা তাদের ঈমান গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখল।[২১] হযরত সালেহ (আ.) তাদের লোকদের উদ্দেশ্য করে বললেন– "নিশ্চয় তোমাদের রবের পক্ষ হতে তোমাদের নিকট একটি উজ্জ্বল প্রমাণ এসেছে। তা হল আল্লাহ্‌র উটনী যা তোমাদের জন্য নিদর্শন। সুতরাং তোমরা একে আল্লাহ্‌র যমীনে ছেড়ে দাও, সে ইচ্ছামত ঘাস খাবে। আর তোমরা কোন প্রকার খারাপ নিয়তে এর দেহ স্পর্শও করবেনা। যদি এরূপ কর তবে মর্মান্তিক শাস্তি তোমাদের জন্য অবধারিত।"[২২]

আল্লাহ তা'আলা হযরত সালেহ (আ.) কে লক্ষ্য করে বললেন ঃ যে, হে নবী ! আপনি ধৈর্য্যধারণ করুন। আমি এ উটনীকে প্রেরণ করেছি তাদের পরীক্ষা করার জন্য। সুতরাং পরীক্ষাকাল পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। আর এ পরীক্ষা হবে উটনীর সাথে কিছু নিয়ম পালনের মধ্য দিয়ে।[২৩]

২০। ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين
আল-কুরআন, ২৬ : ১৫৪

২১। তাহের সুরাটী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

২২। قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم
আল-কুরআন, ৭ : ৭৩

২৩। তাহের সুরাটী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে

"(হে সালেহ) আমি তাদেরকে পরীক্ষার জন্য উটনী পাঠিয়েছি। সুতরাং আপনি অপেক্ষা করুণ ও ধৈয্যধারণ করুন। আর তাদেরকে বলেদিন যে, পানি তাদের মধ্যে পালাক্রমে ভাগভাগি হবে। প্রত্যেকে আপন আপন পালা অনুযায়ী (কূপে) হাজির হবে"।[২৪]

কেননা, প্রথমে উটনী এবং তারা একই কূপ হতে পানি পান করত। উটনী পানি পান করার সময় কূপের সমস্ত পানি পান করে ফেলত। সম্প্রদায়ের লোকেরা তখন কূপে কোন পানিই পেত না। সুতরাং কাওমের লোকদের জন্য এটা খুবই মুশকিল হয়ে পড়েছিল। যদিও সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকেরা ঈমান গ্রহণ করেনি। কিন্তু ভয়ে উট সম্পর্কে কোন কথা বলত না। হযরত সালেহ (আ.) বুঝতে পারলেন উটনীর পানি পান করার দ্বারা কাওমের লোকদের কষ্ট হচ্ছে। তাই তিনি আল্লাহ পাকের অনুমতি সাপেক্ষে এ সম্বন্ধে মিমাংশা করলেন যে, একদিন উটনী পানি পান করবে অন্যদিন সম্প্রদায়ের লোকেরা পানি পান করবে।[২৫] আল্লাহ পাকের এ ফয়সালা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

"এই উটনীর পানি পান করার একদিন পালা আর একদিন তোমাদের পানি পান করার পালা।"[২৬]

এ নির্দেশানুসারে নির্ধারিত পালাক্রমে পানি পান করা শুরু হল। একদিন উটনী ও তার বাচ্চা পানি পান করত আর দ্বিতীয় দিন গোত্রের লোকজন ও পশু সমূহ পান করত। কিন্তু যেদিন উটনী পানি পান করত সেদিন গোত্রের লোকজন পানির পরিবর্তে উটনী হতে দুধ দোহন করত। তারা নিজেদের ইচ্ছামত যে পরিমান দুধ দোহন করতে চাইত সে পরিমাণ দুধ দোহন করতে পারত। এমনকি গোত্রের সকলের দুধের প্রয়োজন উটনীর দুধেই মিটে যেত।[২৭]

উটনী হত্যা

সামুদ সম্প্রদায়ের "ছাদুক" নাম্নী জনৈকা রূপসী ও ধনবতী রমনী নিজেকে "মাছদা" নাকম এক যুবকের সম্মুখে আর "ওনাইযা" নাম্মী জনৈকা ধনবতী রমনী নিজের এক "খুব ছুরত" কন্যাকে 'কেদার' নামক জনৈক যুবকের সম্মুখে পেশ করে বলল, যদি তোমরা উভয়ে উটনী হত্যা করে ফেলতে পার তবে এই দুইজন রমনীকে তোমাদের অধীনে দেওয়া হবে।

২৪। ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر
আল-কুরআন, ৫৪ : ২৮

২৫। তাহের সুরাটী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

২৬। قال هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم .
আল-কুরআন, ২৬ : ১৫৫

২৭। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

তোমরা তাদেরকে বিবাহ করে আনন্দ উপভোগ করবে। অবশেষে "কেদার" ও "মাছদা" কে এই কর্মের জন্য প্রস্তুত করে লওয়া হলো এবং স্থির হল তারা পথে ওত পেতে বসে থাকবে এবং উটনী চারণ ভূমির দিকে আগমন করলে উভয়ে উহাকে আক্রমন করবে। অন্যান্য কয়েকজন তাদের একাজে সাহায্য করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল। যখন উটনী মাছদারের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল তখন সে এর প্রতি তীর নিক্ষেপ করল। তীর উটনীর পায়ের গোছায় বিদ্ধ হল। আর কেদার তলোয়ার নিয়ে উটনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তলোয়ারের আঘাতে উটনীর পায়ের নিচের অংশ কেটে দিল। উটনী খুব জোরে আওয়াজ দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। উটনী জোড়ে আওয়াজ করার কারণ ছিল স্বীয় বাচ্চাকে বিপদ সম্পর্কে সর্তক করা। অতঃপর কেদার বর্শা দিয়ে উটনীর জীবন স্পন্দন সমাপ্ত করে দিল।[২৮]

উটনীর বাচ্চাটি মায়ের হত্যাকান্ড দেখে পলায়ন পূর্বক পাহাড়ে গিয়ে একটি পাথরের উপর উঠল। তিনবার খুব জোড়ে আওয়াজ দেওয়ার পর পাথর ফেটে গেল। উটনীর বাচ্চা পাথরের ভিতর ঢুকে পড়ল। এভাবে উটনীর বাচ্চা ও লোক চক্ষুর অন্তরালে চলে গেল।[২৯] কুরআন মজীদে সংক্ষিপ্তভাবে এ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

"অতঃপর উটনী তারা হত্যা করল এবং স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রদর্শণ করল।"[৩০]

সামুদ জাতির প্রতি আল্লাহ্‌র আযাব

হযরত সালেহ (আ.) উটনী হত্যার খবর পেয়ে খুব দুঃখ পেলেন এবং সেখানে উপস্থিত হয়ে সকলকে একজায়গায় সমবেত দেখতে পেলেন। তিনি উটনীর মৃত দেহ দেখে কেঁদে ফেললেন। আর হযরত সালেহ (আ.) সেখানেই আল্লাহ্‌র হুকুমে বলে দিলেন যে, তোমাদের জীবনের মাত্র আর তিনদিন বাকী আছে।[৩১] আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

"তোমরা তিনদিন আপন আপন ঘরে আরামে থাক। এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি, মিথ্যা নয়।"[৩২]

২৮। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২৬-১২৭ ও তাহরে সুরাটী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৬

২৯। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২৭

৩০। فعقرو الناقة وعتوا عن امر ربهم
আল-কুরআন, ৭ : ৭৭

৩১। তাহের সুরাটী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

৩২। فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب
আল-কুরআন, ১১ : ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ পাকের উপরোক্ত ঘোষণায় তাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন হলো না। বস্তুতঃ যে সম্প্রদায়ের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়, তাদের কোন নসিহত ও সর্তকবানী ফল দিতে পারে না। বরং তারা তাঁর বাণী উপহাস ও ঠাট্টা করতে লাগল এবং বলতে লাগল যে, আযাব কি রূপ? কোথা হতে আসবে? এর আলামতই বা কি? হযরত সালেহ (আ.) বললেন আযাবের আলামত শুনে রাখ। আগামীকাল বৃহস্পতিবার। আগামীকাল তোমাদের শরীর হলুদ বর্ণ ধারণ করবে। নারী পুরুষ বাচ্চা বুড়ো এথেকে কেউ রক্ষা পাবে না। আর শুক্রবার তোমাদের সকলের চেহারা লাল বর্ণ ধারণ করবে। আর শনিবার তোমাদের চেহারা ঘোর কাল বর্ণ ধারণ করবে। আর ঐ দিনই হবে তোমাদের জীবনের শেষ দিন।[৩৩]

সামুদ সম্প্রদায়ের আযাব আগমনের লক্ষণ পরদিন প্রাতঃকাল হতে আরম্ভ হয়ে গেল। প্রথম দিবসে তাদের সকলের চেহারা এমন ফেকাশে হয়ে গেল যেমন কোন ভীত ব্যক্তির প্রাথমিক অবস্থা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় দিন সকলের চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল যেন ইহা ভীত ব্যক্তির দ্বিতীয় অবস্থা, তৃতীয় দিবসে তাদের সকলের চেহারা কাল বর্ণের হয়ে গেল। ইহা ভীত ব্যক্তির তৃতীয় স্তর যার পরে মৃত্যুর স্তর বাকী থাকে।[৩৪]

সেই তিন দিনের পর প্রতিশ্রুত সময় এসে পৌঁছল এবং রাত্রিকালে এক ভয়াবহ বিকট ধ্বনি সেই অবস্থাই প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিধ্বংস করে দিল, যে অবস্থায় তারা ছিল। কুরআন মজীদ এই ধ্বংসাত্মক বিকট ধ্বনিটিকে কোন স্থানে "ছা'এক্কাহ" অর্থাৎ বজ্রধ্বনিওয়ালা বিদ্যুৎ, কোন ক্ষেত্রে "রাজফাহ" অর্থাৎ ভূ-কম্পণ সৃষ্টিকারী বস্তু, কোন স্থানে "তোয়াগিয়াহ" অর্থাৎ ভয়ংকর ধ্বনি এবং কোন জায়গায় "ছাইহাহ" অর্থাৎ চিৎকার নামে আখ্যায়িত করেছে। কেননা এই আখ্যাগুলো একই মূল বস্তুর বিভিন্ন প্রকার বিশেষনের প্রেক্ষিতে প্রদান করা হয়েছে। যেন লোকেরা বুঝতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার সেই আযাবটির ভয়ংকরতা তেমন বিভিন্ন প্রকারের ছিল।[৩৫]

আযাবের কথা শুনে এ হতভাগ্য গোত্র তো আল্লাহ তা'আলার কাছে গুণা মাফ চায়নি। বরং হযরত সালেহ (আ.) কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। তারা বলল, যদি হযরত সালেহ (আ.) সত্যবাদী হন তবে তো নিশ্চয় আমাদের উপর আযাব আসবে। কাজেই আমরা ধ্বংস হওয়ার পূর্বে তাকে ধ্বংস করব। আর যদি তিনি মিথ্যাবাদী হন। তাহলে মিথ্যার শাস্তি স্বরূপ তাকে উটনীর পথ ধরাব।[৩৬]

গোত্রের লোকেরা হযরত সালেহ (আ.) কে হত্যার উদ্দেশ্যে তার নামাযের কুঠুরী পাহাড়ের ভিতরে প্রবেশ করলো, আল্লাহ পাক তাদের প্রতি বৃষ্টির ন্যায় পাথর বর্ষণ করেন। এতে তারা দিকবিদিক পলায়ন করতে চাইলে পাথরের আঘাতে গুহার ভিতরেই চর্বিত ঘাসের ন্যায় পড়ে মরে থাকে।

৩৩। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১৯ ও তাহের সুরাটী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

৩৪। সাইয়্যেদ আলুসী,প্রাগুক্ত, খ. ৯ম, পৃ. ১৪২

৩৫। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ ১৩০

৩৬। তাহরে সুরাটী, প্রাগুক্ত পৃ. ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

গোত্রের বাকী সমস্ত লোক নির্দিষ্ট মেয়াদ পরে দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে থাকে। এমতাবস্থায় আকাশ হতে এক বিরাট আওয়াজ ধ্বনিত হল। ফলে সকলেই ঝড়ে পতিত খেজুর বৃক্ষের ন্যায় অধঃমুখ হয়ে মৃত্যুবরণ করল। কোলাহল এক নিমিষে থেমে গেল। জনাকীর্ণ কোলাহল পূর্ণ জনপদ নীরব, নিথর ও নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল।[৩৭]

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন

"অতঃপর তাদেরকে ভূ-কম্পন আক্রমন করলে তারা অধঃমুখ আপন গৃহে পড়ে রইল।[৩৮]

হযরত সালেহ (আ.)-এর শেষ অবস্থান

"সামুদ" সম্প্রদায় ধ্বংস প্রাপ্ত হলে হযরত সালেহ ও তাঁর অনুসারী অনুগামী ঈমানদার লোকেরা কোথায় অবস্থান গ্রহণ করেন এ নিয়ে মুফাস্সীর ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে কয়েকটি মত পরিলক্ষিত হয়।

১। তারা ফিলিস্তিনের "রামলা" নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন।[৩৯]

২। হাযরামউতে যেয়ে বসবাস করেন। কেননা ইহা তাদের আদি ও আসল আবাস্থল ছিল। কারণ ইহা আহকাফেরই একটি অংশ। এখানে একটি কবর রয়েছে যা হযরত সালেহ (আ.) এর কবর বলে প্রসিদ্ধ।

৩। সামুদ সম্প্রদায়ের ধ্বংস প্রাপ্তির পর তারা সেই বস্তিতেই বসবাস করতে থাকেন। ইহা সাধারণ ঐতিহাসিকদের মত।

৪। কাওমে "সামুদের" ধ্বংস প্রাপ্তির পর তারা মক্কা মুআয্যমায় এসে বসবাস করতে থাকেন। হযরত সালেহ (আ.) সহ তাঁর অনুসারীদের কবর কা'বা শরীফের পশ্চিম দিকে অবস্থিত।[৪০]

হযরত সালেহ (আ.)-এর অনুসারীদের সংখ্যা ছিল ১২০ জন। আর ধ্বংস প্রাপ্তদের সংখ্যা ছিল প্রায় দেড় হাজার।

৩৭। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

৩৮। فاخذتهم الرجفة فاصبحوا فى دارهم جثمين
আল-কুরআন, ৭ : ৭৮

৩৯। সাইয়্যেদ আলুসী, খ. ৯ম, পৃ. ১৪২

৪০। প্রাগুক্ত, খ. ৯ম, পৃ. ১৪৩

Dhaka University Institutional Repository

লূত জাতির ইতিহাস

লূত জাতি পাবিত্র কুরআনে اخوان لوط লূতের ভ্রাতাগণ নামে পরিচিত। হযরত লূত (আ.) হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁর পিতার নাম ছিল "হারূন"। হযরত লূত (আ.) শৈশবে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন।[১] হযরত লূত (আ.) ইব্রাহীমী ধর্মের মুসলমান। পবিত্র কুরআনে তাঁর উল্লেখ রয়েছে ঃ

فامن له لوط وقال انى مهاجر الى ربى .

"অতঃপর লূত (আ.) ঈমান আনলেন ইব্রাহীমের উপর এবং বললেন, আমি আমার রবের দিকে হিজরতকারী।"

হযরত লূত (আ.) সর্বদাই ইব্রাহীম (আ.)-এর সাথে অবস্থান করতেন। মিশরে থাকা অবস্থায় ও তিনি ইব্রাহীম (আ.)-এর সাথে ছিলেন। মিশরে অবস্থান কালে তারা উভয়েই গৃহপালিত পশু পালন করতেন এবং একই চারনভূমিতে উভয়ের রাখালরা পশু পালন করত। কাজেই তাদের রাখাল ও রক্ষীদের মধ্যে বিশেষ মনবাদ লেগেই থাকত। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর রাখালরা চাইত, আমাদের পশুপাল এই চরণভূমি হতে আগে স্বার্থলাভ করুক। আর লূত (আ.)-এর রাখালদের ইচ্ছা হত তাদের দাবী অগ্রগণ্য মনে করা হোক। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সহিত পরামর্শ করে উভয়ে সিদ্ধান্তে উপণীত হলেন, যে, পারস্পরিক সম্পর্ক, সম্ভাব ও সম্প্রীতির স্থায়িত্ব বহাল রাখার জন্য হযরত লূত (আ.) মিশর হতে হিযরত করে ওর্দুনের পূর্বাঞ্চলে সাদুম এবং আমুরায় চলে যান এবং সেখানেই তিনি হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর পরগাম্বরীর সত্যতা প্রচার করতে থাকেন। পরবর্তীতে এই ওর্দুনের সাদুম ও আমুরায় তাঁর নবুয়তের দায়িত্ব পালন করেন।[২]

সাদুম ও আমুরার পরিচিতি

"সাদুম ও আমুরা" অঞ্চল দু'টি ওর্দুনের প্রসিদ্ধ শহরের নাম। যা বর্তমানে বাহ্‌রে মাইয়্যেত বা বাহরে লূতে অবস্থিত। এই সম্পূর্ণ অঞ্চলটি বর্তমানে যা এখন সমুদ্র রূপে দৃষ্ট হচ্ছে। কিন্তু সেকালে এ দুটি ছিল শুষ্কভূমি এবং ইহার উপর ছিল শহর। সাদুম ও আমুরা সম্প্রদায়গুলোর বসতি এ স্থানেই ছিল। হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের উপর আযাবে সেই ভূখন্ডকে উলটিয়ে দেয়া হল এবং ভীষণ ভূমিকম্পে প্রকম্পিত হল। যার ফলে এ অঞ্চলটি চারশত মিটার সমুদ্রের নীচে চলে যায় এবং পানি উপরে উথলিয়ে উঠে। তখন থেকে এ অঞ্চলটি সমুদ্ররূপ ধারণ করে। বর্তমান আধুনিক যুগে ভূতত্ত্বানুসন্ধানে বাহরে মাইয়্যেতের তীরে লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের বস্তি সমূহের কিছু কিছু ধ্বংসাবশেস আবিস্কৃত হয়েছে।[৩]

১। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫২ ও তাহরে সুরাটী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

২। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫৩

৩। প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫৩

Dhaka University Institutional Repository

লূত জাতির অপরাধ

দুনিয়ায় এমন কোন মন্দ কাজ ছিল না যা তারা করত না। আর এমন কোন ভাল কাজ ছিল না, যা তাদের মধ্যে পাওয়া যেত। দুনিয়ার অবাধ্য নাফরমান, হীনস্বভাব ও মন্দ চরিত্র জাতিগুলোর অন্যান্য ও অশ্লীল কার্যগুলো ছাড়াও এ জাতি একটি কলুষিত কাজের আবিষ্কার করেছিল। অর্থাৎ নিজেদের কামরিপু চরিতার্থ করার জন্য তারা স্ত্রীলোকের পরিবর্তে শ্মশ্রুবিহীন বালকদের সহিত সহবাস করত। দুনিয়ার সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে তখন পর্যন্ত এ কর্মটির প্রচলন কোথাও ছিল না। তারাই সেই হতভাগ্য জাতি যারা এ অপবিত্র কর্মটির আবিষ্কার করেছে। এই কর্মটি আরবী পরিভাষায় "লেওয়াতাত" নামে কুখ্যাত। আর তারা এহেন দুষ্টামি, কলুষিতা এবং নির্লজ্জপূর্ণ অপকর্মকে দোষ মনে করত না এবং প্রকাশ্যভাবে গর্বের সহিত উহা করত।[৪]

আল-কুরআনের বাণী ঃ

" আর (স্মরণ করুন) লূত (আ.) ঘটনা যখন তিনি নিজের জাতিকে বললেন, তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজে লিপ্ত রয়েছে, যা পৃথিবীতে তোমাদের পূর্বে আর কেউ করে নাই ? তা এই যে, নিঃসন্দেহে স্ত্রীলোকদের পরিবর্তে নিজেদের কামরিপু পুরুষদের দ্বারা চরিতার্থ করছ। সুনিশ্চিত কথা যে, তোমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভূক্ত।"[৫]

বিশেষত "সাদুম" বাসীদের এই অভ্যাস ছিল যে, বহিরাগত ব্যবসায়ী ও বণিকদের পণ্যদ্রব্যকে এক নতুন ও অভিনব পদ্ধতিতে লুণ্ঠন করে নিত। তাদের পদ্ধতি ছিল, বিদেশ হতে কোন বণিক "সাদুমে" এসে অবতরণ করলে তার মাল দেখার বাহানা করে প্রত্যেক ব্যক্তি অল্প অল্প করে হাতে উঠিয়ে নিত এবং নিয়ে চলে যেত। নিরীহ বণিক বেচারা অস্থির ও পেরেশান হয়ে বসে থাকত। সে যদি তার পণ্যদ্রব্য বিনষ্ট হওয়ার অভিযোগ করত এবং কান্নাকাটি আরম্ভ করত, তবে সে লুণ্ঠনকারীদের মধ্যে দুই একজন এসে লুণ্ঠনকৃত দুই একটি বস্তু দেখিয়ে বলত ভাই আমি তো মাত্র এটি নিয়ে ছিলাম। নাও তোমার মাল নিয়ে যাও। এভাবে বিদেশী বণিকদের সম্পূর্ণ মালই লুণ্ঠিত হয়ে যেত। কোন কোন সময় তারা সওদাগরের কাছ থেকে পুরো মালই লুণ্ঠন করে নিয়ে যেত।[৬]

একবার হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর বাদীর পুত্র আল্ইয়ারায্ দেমাশ্কীকে সাদুমে পাঠালেন। ইনি যখন বস্তির নিকটে পৌছলেন, তখন তাঁকে জনৈক সাদুমী তাঁর মাথায় একটি পাথর ছুঁড়ে মারল, আলইয়ারাযের মস্তক হতে রক্ত বের হল। তখন সাদুমী ব্যক্তি অগ্রসর হয়ে বলল, আমার পাথরের আঘাতে তোমার মস্তক লাল বর্ণ ধারণ করেছে। এতএব, আমাকে বিনিময় বা পারিশ্রমিক দাও। তার এই দাবীর জন্য তাকে টেনে সাদুমের আদালতে নিয়ে গেল। আদালতের হাকিমও তাকে পারিশ্রমিক দেয়ার নির্দেশ দিল। ইহা শুনে আলইয়ারায রাগান্বিত হলেন এবং এক খন্ড পাথর নিয়ে সজোরে হাকিমের মাথায় ছুড়ে মারলেন।

৪। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫৪

৫। ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين . إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون ।
আল-কুরআন, ৭ : ৮০-৮১

৬। হিব্র ভাষায় লিখিত একটি সাহিত্য পুস্তক হতে নেয়া।

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর বললেন, এই পাথর মারার জন্য আমি তোমার নিকট পারিশ্রমিক পাওনা হলাম, তা তুমি এই সাদুমীকে দিয়ে দিও। এতটুকু বলেই তিনি তথা হতে পালিয়ে গেলেন।[৭]

উল্লেখিত অশ্লীল ও লূটতরাজমূলক কর্মকান্ড ছাড়াও তারা যুলুম, নির্লজ্জতা, অসৎচরিত্র এবং নানা প্রকার জঘন্য কাজে লিপ্ত ছিল।

হযরত লূত (আ.)-এর দাওয়াত ও তাবলীগ

হযরত লূত (আ.) তাদেরকে তাদের এই নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার জন্য তিরস্কার করলেন এবং সম্মান ও পবিত্রতার জীবন যাপন করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করলেন। আর সুন্দর সম্বোধন ও নম্রতার সহিত যত উপায়ে তাদেরকে বুঝাতে পারা সম্ভব ছিল, সর্বপ্রকারেই তাদেরকে বুঝালেন এবং উপদেশ ও নছীহত প্রদান করলেন এবং অতীত কালের সম্প্রদায়গুলোর মন্দ কাজের পরিণাম উল্লেখ করে তাদেরকে উপদেশ মূলক দৃষ্টান্ত দিলেন।[৮] কিন্তু হতভাগ্যদের উপর কোন ক্রিয়াই হল না বরং এর বিপরীত এই হলো যে, তারা বলতে লাগল ঃ

"লূত (আ.)-এর জাতির জবাব ইহা ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, তারা বলে দিল, ইহা দিগকে (লূত ও তাঁর পরিবার বর্গকে) তোমাদের শহর হতে বের করে দাও।"[৯]

হযরত লূত (আ.) একবার তাঁর জাতিকে একটি সমাবেশে নছীহত করে বললেন– তোমাদের এতটুকু অনুভূতি নেই যে, ইহা বুঝতে পার, পুরুষদের সাথে নির্লজ্জতার সম্পর্ক, লুটতরাজ এবং এই যাবতীয় অশ্লীল চারিত্রিক কার্যগুলো নেহাত খারাপ কাজ, অথচ তোমরা এ সমস্ত কাজ জনবহুল মজলিসে করছ। লজ্জিত হওয়ার পরিবর্তে পরে উহার আলোচনা এভাবে শুনিয়ে থাক যেন এগুলো আর্দশমূলক এবং দেখাবার মত কাজ যা তোমরা সম্পন্ন করছ।[১০] লূত (আ.) এ উপদেশ কুরআনে এরূপে ব্যক্ত হয়েছে ঃ

"তোমরা কি ঐ সমস্ত লোক নও যে, তোমরা পুরুষদের সহিত অপকর্ম করছ, ডাকাতি করছ এবং নিজেদের মজলিস সমূহে এবং পরিবার বর্গের সম্মুখে অশ্লীল কাজ করছ।"[১১]

৭। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫৪

৮। তাহের সুরাটী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

৯। وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون

আল-কুরআন, ৭ : ৮২

১০। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫৬

১১। أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين

আল-কুরআন, ২৯ : ২৯

Dhaka University Institutional Repository

জাতির লোকেরা লূত (আ.)-এর উপদেশ শুনে ক্ষোভে ও ক্রোধে অধীর হয়ে বলল হে লূত! ব্যস, এ সমস্ত উপদেশ ও নছীহত খতম কর। আমাদের এ সমস্ত কাজে তোমার প্রভূ যদি অসন্তুষ্ট হয়, তবে তোমার সে আযাব এনে দেখাও, যা উল্লেখ করে পুনঃ পুনঃ আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছো। বাস্তবিকই যদি তুমি তোমার কথায় সত্যবাদী হয়ে থাক। তবে তোমার ও আমাদের মধ্যে চরম মীমাংসা হয়ে যাওয়াই একান্ত আবশ্যক।[১২] এই মর্মে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

"অতঃপর তাঁর (লূত আ.) জাতির জবাব ইহা ছাড়া আর কিছুই ছিল না, তারা বলতে লাগল, তুমি আমাদের নিকট আল্লাহর আযাব নিয়ে আস, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক।"[১৩]

লূত জাতির শেষ পরিণতি

একদা হযরত ইব্রাহীম (আ.) মাঠে পায়চারী করছেন। তিনি দেখতে পেলেন তিনজন লোক মাঠে দন্ডায়মান। তিনজন লোককে দেখে আনন্দিত হলেন এবং তাদেরকে আপ্যায়নের জন্য নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন। মেহমানগণ হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর খাবার আয়োজনের ব্যস্ততা দেখে মৃদু হেসে বললেন, আপনি ঘাবড়াবেন না, আমরা আল্লাহ্র ফেরেশতা। লূতের সম্প্রদায়ের ধ্বংসের জন্য প্রেরিত হয়েছি। এ কাজে সাদুম যাচ্ছি।

হযরত ইব্রাহীম (আ.) যখন নিশ্চিতরূপে জানতে পারলেন ইহারা শত্রু নহে বরং আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতা, তখন তাঁর অন্তরেই সমবেদনার প্রেরণা, মহব্বত ও স্নেহের আধিক্য প্রবল হয়ে উঠল এবং তিনি লূত (আ.)-এর পক্ষ হয়ে বির্তক করতে আরম্ভ করলেন এবং বললেন তোমরা এ কাওমকে কিভাবে ধ্বংস করতে যাচ্ছো, যাদের মধ্যে লূতের মত আল্লাহ্র মনোনিত নবী বিদ্যমান রয়েছে। সে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রও বটে। হানীফী ধর্মের অনুসারী । ফেরেশতারা বলল– আমরা ইহার সবকিছুই জানি, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইহা মীমাংসা যে, নিজের জাতিকে নিজেদের অবাধ্যতা, অপকর্ম, নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার হটকারিতার কারণে অবশ্যই ধ্বংস করে দেওয়া হবে। অবশ্য লূত (আ.) ও তাঁর খানদান সে আযাব হতে নিরাপদে থাকবেন। তবে লূতের স্ত্রী কাওমের সহায়তা এবং তাদের অপকর্ম ও বদ আকীদাসমূহে শরীক থাকার কারণে লূতের সম্প্রদায়ের সহিত আযাব প্রাপ্ত হবে।[১৪]

১২। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫৬

১৩। فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين

আল-কুরআন, ২৯ : ২৯

১৪। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৭

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন মজীদে এ ঘটনা নিম্নরূপে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ "অতঃপর যখন ইব্রাহীম (আ.)-এর ভয় চলে গেল, এবং তার নিকট (পুত্র ইসহাকের জন্ম সম্বন্ধে) আমার সুসংবাদ পৌছিল। তখন তিনি লূত (আ.) সম্বন্ধে আমার সহিত বির্তক করতে লাগল। নিঃসন্দেহে ইব্রাহীম ধৈর্যশীল, ব্যথার সাথী, দয়ালু। হে ইব্রাহীম! এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিও না। নিঃসন্দেহে তোমার রবের নির্দেশ এসে পড়েছে এবং নিঃসন্দেহে তাদের উপর আযাব আসবে যা কোন ক্রমেই টলবে না।"[১৫]

"ইব্রাহীম বললেন,হে প্রেরিত ফেরেশতাগণ! তোমরা কি জন্য এসেছ। তারা বলল, আমরা অপরাধী কাওমের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। যেন আমরা তাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করি। ইহা চিহ্নিত করে দেখা হয়েছে আপনার প্রতিপালকের তরফ হতে সীমালঙ্ঘন কারীদের জন্য।"[১৬]

"আর যখন আমার ফেরেশতারা সুসংবাদ নিয়ে ইব্রাহীমের নিকট এসে বলল। নিশ্চয় আমরা ধ্বংস করব এই (সাদুম) বস্তীর অধিবাসীকে। নিশ্চয় ইহার অধিবাসীরা অনাচারী। ইব্রাহীম বললেন, এই বস্তিতে তো লূত রয়েছে। ফেরেশতারা বললেন আমরা খুব ভালভাবেই অবগত আছি যারা এই বস্তি অধিবাসী। আমরা তাঁকে ও তাঁর পরিবার বর্গকে অব্যাহতি দিব কিন্তু তার বিবিকে নহে। কেননা সেও বস্তিবাসীদের সঙ্গে থাকবে।"[১৭]

হযরত লূতের সত্য প্রচার, সৎকাজের আদেশ প্রদান এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখা কাওমের উপর কোন ক্রিয়াই করল না। তারা তাদের অসৎ চরিত্রের উপর পূর্ববৎ স্থায়ী রইল। হযরত লূত (আ.) তাদেরকে একটুকু পর্যন্ত লজ্জা ও আত্মসম্মানবোধ জাগিয়ে দিলেন যে, তোমরা এতটুকু চিন্তা কর না যে, আমি দিবা রাত্র ইসলাম ও সিরাতুল মুস্তাকিমের দাওয়াত ও পায়গামের জন্য তোমাদের জন্য হয়রান পেরেশান রয়েছি। আমি কি কখনো এই চেষ্টার জন্য তোমাদের নিকট কোন বিনিময় দাবী করেছি? কোন নযর নিয়ায চেয়েছি? আমার দৃষ্টিতে তো তোমাদের দ্বীন ও দুনিয়ার সৌভাগ্য ও সফলতা ব্যতীত আর কিছুই চাই না। কিন্তু তোমরা আমার কথার প্রতি কর্ণপাতই করনা।[১৮]

১৫। فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط . إن إبراهيم لحليم أواه منيب . يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود .

আল-কুরআন, ১১ : ৭-৭৬

১৬। قال فما خطبكم أيها المرسلون . قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين .لنرسل عليهم حجارة من طين . مسومة عند ربك للمسرفين.

আল-কুরআন, ৫১ : ৩১-৩৪

১৭। ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين . قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين .

আল-কুরআন, ২৯ : ৩১-৩২

১৮। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৯

Dhaka University Institutional Repository

এই মর্মে কুরআন বলে ঃ "লূতের সম্প্রদায় পয়গাম্বরকে মিথ্যা প্রতিপাদন করেছে। যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বললেন, তোমরা কি ভয় করনা? নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত পয়গাম্বর। অতএব, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। আর আমি এই নছীহতের বিনিময়ে তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের নিকট ছাড়া আর কারো নিকট নহে।"[১৯]

আল্লাহ্র ফেরেশতারা হযরত ইব্রাহীমের নিকট হতে রওয়ানা হয়ে সাদুমে পৌছলেন প্রথমে তারা হযরত লূত (আ.) এর গৃহে যান এবং তাঁর কন্যাদেরকে সালাম দেন। লূত (আ.)-এর কন্যারা যথারীতি সালামের জবাব দেন। অতঃপর হযরত জিব্রাঈল (আ.) লূত কন্যাদেরকে বললেন। আমরা বিদেশী মুসাফির এ শহরে এমন হৃদয়বান কেউ কি আছেন ? যিনি আজ রাতের জন্য আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন, তারা জবাবে বললেন, এ কাজের জন্য আমার আব্বা ছাড়া আর কেউ নেই। তিনি এখন 'ইবাদতে ব্যস্ত। 'ইবাদত থেকে উঠলে তিনি অবশ্যই মেহমানদারী করবেন। তাঁরা আকার আকৃতিতে সুশ্রী ও সুন্দর এবং বয়সে নব্যযুবকের আকৃতিতে ছিলেন। মেহমানদের কারোই দাড়ি ছিল না। সবাই সুগন্ধযুক্ত পোশাক পরিচ্ছদ পরিহিত। হযরত লূত (আ.) প্রথমে তাদেরকে দেখে ভয় পেয়ে ঘাবড়িয়ে গেলন। হতভাগ্য কাওম আমার এ মেহমানদের সাথে না জানি কিরূপ আচরণ করে। কেননা, লূত (আ.) কে তখনও আগন্তকগণ বলেন নাই তারা আল্লাহ্র পবিত্র ফেরেশ্তা।[২০]

এহেন দুশ্চিন্তার বর্ণনা আল্লাহপাক কুরআনে বর্ণনা করেনঃ "আর আমার প্রেরিত ফেরেস্তারা লূত (আ.) এর নিকট পৌছল তাদের আগমনে তিনি শংকিত এবং মন ভারাক্রান্ত হলেন, বললেন আজকের দিনটি বড় কঠিন এবং লূত হন্তদন্ত হয়ে তাদের নিকট দৌড়ে এল। এরা পূর্ব থেকে দুষ্কর্মশীল কাওম।"[২১]

১৯। كذبت قوم لوط المرسلين . إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون . إني لكم رسول أمين . فاتقوا الله وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.

আল-কুরআন, ২৬ : ১৬০-১৬৭

২০। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৯-২৬০ ; তাহের সুরাটী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

২১। وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد .

আল-কুরআন, ১১ : ৭৭-৭৮

Dhaka University Institutional Repository

কম বয়স্ক বালকবেশী ফেরেশতারা লূতের ঘরে প্রবেশ করলেন। লূত (আ.) যেহেতু তাদের কাওমের দুষ্কর্ম সম্পর্কে জানতেন। তাই তিনি চিন্তিত ও শংকিত হয়ে পড়েন। তিনি মনে মনে বললেন অনন্যাপায় কাওমের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। তাঁর স্ত্রী ছিল কাফির। তাই সে লূতের ঘরে আগত মেহমানদের সংবাদ তার কাওমকে জানিয়ে দেন। খবর পেয়ে লূত এর নিকট এসে তারা বলল, তোমার গৃহে যে বারজন, সুদর্শন মেহমান আছে। তাদেরকে আমাদের নিকট সমর্পণ কর। হযরত লূত (আ.) যথাসাধ্য বুঝালেন তোমাদের মধ্যে কি সুস্থ প্রকৃতির একজন সৎ লোকও নাই, যে মানবতার পরিচয় দেয় এবং সত্যকে বুঝে, তোমরা কেন এ লানতে পতিত হয়েছ ? এবং কামরিপু চরিতার্থ করার জন্য স্বাভাবিক কর্ম পদ্ধতি বর্জন করে এবং হালাল উপায়ে নারীদেরকে জীবন সঙ্গিনী করে লওয়ার পরিবর্তে এই অভিশপ্ত নির্লজ্জতার পিছনে পড়েছ ?

লূত (আ.) মেহমানদের দুস্কৃতিকারী কাওমের কবল থেকে রক্ষার জন্য নিজের মেয়েদেরকে তাদের সাথে বিয়ে দেবার প্রস্তাব করেন। যদিও তখনকার দিনেও কাফিরদের সাথে ঈমানদার নারীদের বিয়ে নিষিদ্ধ ছিল। এতদসত্ত্বেও মেহমানদের খাতিরে স্বীয় কন্যাদের বিয়ে দিতে সম্মত হন।[২২]

কুরআনের ভাষায় ঃ " লূত (আ.) তাঁর কাওমের দুস্কৃতিকারীদের বললেন, হে আমার কাওম ! আমার এ মেয়েরা আজ তোমাদের জন্য, তারা পবিত্রও বটে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আমাকে আমার মেহমানদের কাছে অপমানিত ও লজ্জিত কর না, তোমাদের মাঝে কি একজনও ভাল মানুষ নেই।"[২৩]

তারা লূত এর কথা না মেনে লূতের ঘরের দরজা ভেঙ্গে ফেলল এবং তারা বলল ঃ "তুমি তো জান তোমার কন্যাদের প্রতি আমাদের কোন দাবী নাই এবং আমরা কি চাই তা তুমি নিশ্চয় জান।"[২৪]

লুত (আ.) কাওমের লোকদের অন্যায় ও অশোভনীয় দাবীর মুখে বললেন, "যদি তোমাদের উপর আমার কোন শক্তি থাকত অথবা কোন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারতাম।"[২৫]

২২। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬৪ ; তাহের সুরাটী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

২৩। قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد .
আল-কুরআন, ১১ : ৭৮

২৪। قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد .
আল-কুরআন, ১১ : ৭৯

২৫। قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد
আল-কুরআন, ১১ : ৮০

Dhaka University Institutional Repository

এ কথা বলে লূত (আ.) তাঁর জাতির লোকদেরকে বুঝাতে চাচ্ছিলেন, আমার শক্তি থাকলে আমি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতাম কিন্তু আমি ধর্যধারণ করছি এবং আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন তিনি তোমাদের দুষ্কর্ম থেকে আমার মেহমানদের রক্ষা করেন।[২৬]

ফেরেশ্‌তাদেরকে প্রেরণকালে তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছিল, যে পর্যন্ত লূত তোমাদের কাছে তাঁর কাওমের ব্যাপারে তিনবার অভিযোগ পেশ না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না এবং তাকে তোমাদের পরিচয় দিবে না। কাওমের দুষ্কৃতিকারীরা লূত (আ.) এর গৃহে প্রবেশ করে যখন তাকে আহত করে কষ্ট দেয়, তখন তিনি মেহমানবেশী ফেরেশতাদের কাছে এসে বললেন, আমি এসব অভিশপ্তদের দুষ্কর্ম থেকে নিজেকে এবং আপনাদের রক্ষা করার শক্তি আমার নেই। তাদেরকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও আমার নেই। অশ্রুসিক্ত নয়নে ফেরেশ্‌তাদের নিকট তিনি এ অভিযোগই করছিলেন। এ অবস্থায় অভিশপ্তদের দল ঢুকে তাঁর সাথে বেআদবীপূর্ণ আচরণ করে, এমনকি তারা তার গায়ে হাত উঠায়, অন্যন্যাপায় হয়ে তিনি মেহমানদের কাছে স্বীয় অক্ষমতার কথা প্রকাশ করেন। লূত (আ.) এভাবে তিনবার নিজের অক্ষমতার অভিযোগ পেশ করলে ফেরেশতারা বলেন ঃ

" মেহমানরা বললেন, হে লূত ! আমরা আপনার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত, এরা কখনোই আপনার নিকট পৌঁছতে পারবে না, সুতরাং রাতের কোন অংশে আপনি আপনার পরিবার নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন আর আপনাদের কেউ যেন পেছনে ফিরে না তাকায়। কিন্তু আপনার স্ত্রী এখানেই থাকবে। তার উপরও সেই মসিবত নাযিল হবে যা অন্যদের উপর হবে। নিশ্চয় তাদের আযাবের প্রতিশ্রুত সময় হচ্ছে ভোর রাত, ভোর রাত কি নিকটে নয় ?"[২৭]

মেহমানরা যখন প্রকাশ করলেন, আমরা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং আমরা এজন্য এসেছি যে অদ্য রাতের কিছু অবশিষ্ট থাকতে আপনি এ এলাকা ত্যাগ করবেন। কারণ এ কাওমের উপর আল্লাহ্‌র আযাব নাযিল হবে। লূত (আ.) ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করছিলেন এ কাওমের প্রতি আযাব কি রাতের প্রথমাংশে অবতীর্ণ হবে, না শেষাংশে। আলোচনা চলতে থাকা অবস্থারই পাপিষ্ঠদের দল এসে হযরত লূত (আ.) এর ঘরের ভিটি খুঁড়তে শুরু করে। তাদের এ সময়ের উক্তি আল্লাহ্‌ তা'আলা কুরআনে বিবৃত করেছেন এভাবে أليس الصبح بقريب অর্থাৎ হে লূত ভোর কি নিকটবর্তী নয় ? অর্থাৎ ভোর তো প্রায় আসল অথচ এখনও তুমি আমাদের দাবী পূরণ করলে না। এ বলে তারা ফেরেশতাদের প্রতি হাত বাড়াতে চাইলে জিব্রাঈল (আ.) তাদের উদ্দেশ্যে ফুঁক মারেন। এতে তাদের নাক, মুখ ও চোখ সব সমান হয়ে যায়।[২৮]

২৬। তাহের সুরাটী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

২৭। قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب

আল-কুরআন, ১১ : ৮১

২৮। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩২

Dhaka University Institutional Repository

এ সম্পর্কে বলেন "এবং নিশ্চয় তারা অসুদুদ্দেশ্যে লূত হতে মেহমানদেরকে ছিনিয়ে নেয়ার সংকল্প করেছিল। অতঃপর আমি তাদের চোখ খুলে ফেললাম। সুতরাং এখন আমার আযাব ও ভয় প্রদর্শনের স্বাদ আস্বাদান কর। অতঃপর তাদের প্রতি চিরস্থায়ী আযাব নাযিল হল ভোর রাতে, সুতরাং আমার আযাবের স্বাদ আস্বাদন কর।"

লূত (আ.)-এর কাওমের যেসব লোক তাঁর গৃহে চড়াও হয়েছিল, তাদের চোখ, মুখ, কান সব সমান হয়ে যায়।

এ অবস্থায় চিৎকার করে বলতে লাগল, লূত জাদুকরদেরকে তাদের ঘরে স্থান দিয়েছে। তারা আরো বলল, তোমার মেহমানদেরকে বল আমাদের চোখ, কান, নাক ভাল করে দিতে, তাহলে আমরা অপকর্ম হতে তওবা করব, তখন জিব্রাঈল (আ.) নিজের পালক তাদের চেহারায় বুলিয়ে দেন। সাথে সাথে তাদের নাক, মুখ, কান সব যথারীতি পূর্বের ন্যায় হয়ে যায়। তারা আবার মেহমান রূপী ফেরেশতাদের শরীরে হাত বাড়াতে চাইলে তাদের সারা দেহ শুকিয়ে অবশ হয়ে যায়। তারা আবার তাওবা করলে জিব্রাঈল নিজের হাত চোখে ও শরীরে বুলিয়ে তাদেরকে আগের মত সুস্থ করে দেন এবং তারা সুস্থ হয়ে লূত (আ.) হতে চলে গিয়ে শহরের সব রাস্তা বন্ধ করে দেয়। তিনি বললেন, পাপিষ্ঠরা তো শহর থেকে বের হওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। সুতরাং আমি পরিবার পরিজনসহ বের হব কিভাবে ? তখন হযরত জিব্রাঈল (আ.) পরিবার পরিজনসহ লূত (আ.) কে শহর থেকে বের করে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর কাছে পৌছে দেন। হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রী কাফির হওয়ায় সে দুষ্কর্মশীলদের মাঝে থেকে যায়। গৃহ স্বামী ইব্রাহীম (আ.) তাদেরকে অত্যন্ত আগ্রহভরে মেহমানরূপে গ্রহণ করেন এবং যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করেন। সূর্যোদয়ের পর হযরত জিব্রাঈল (আ.) স্বীয় ডানা মাটিতে ঢুকিয়ে লূত এর কাওমের শহরটিকে এমনভাবে উল্টে দেন যে, গাছের একটি পাতা অথবা দরজার একটি কব্জাও নড়েনি। শিশুদের একটি দোলনাও স্থানান্তরিত হয়নি। ফেরেশতারা এভাবে সমগ্র দুষ্কর্মশীল সম্প্রদায়কে অস্তিত্বের ধরা থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেন।[২৯] লূত (আ.)-এর কাওম ধ্বংস হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন:

"অতঃপর যখন আমার আদেশ এসে পৌছে তখন আমি সে জনবসতির উপরের দিককে নিচে করে দিলাম এবং আমি তার উপর উপর্যুপরি পাথর বর্ষণ করতে লাগলাম। তারা তোমার রবের নিকট চিহ্নিত নির্দৃষ্টকৃত, আর সে জনপদগুলো জালেমদের চেয়ে দূরে নয়।"[৩০]

২৯। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ, ১, পৃ. ১৩৩

৩০। فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود . مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.

আল-কুরআন, ১১ : ৮২-৮৩

Dhaka University Institutional Repository

"আর আমি নাজাত দিলাম লূত (আ.) কে এবং তাঁর পরিবারের লোকদিগকে। কিন্তু এক বৃদ্ধা রয়ে গেলেন অবশিষ্ট লোকদের মধ্যে। অতঃপর আমি অন্যান্য সকলকে ধ্বংস করে দিলাম এবং বষর্ণ করলাম তাদের উপর এক ভীষণ বর্ষণ। সুতরাং সেই ভয় প্রদর্শিত লোকদের উপর কেমন নিকৃষ্ট বর্ষণ হলো। বস্তুতঃ সেই বিষয়টির মধ্যে নিদর্শন রয়েছে। আর আপনার রব তিনিই মহা শক্তিমান দয়ালূ।"[৩১]

হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রীকে লূত (আ.) থেকে আলাদা করে দুস্কৃতকারীদের অন্তর্ভূক্ত করে অনাগত ভবিষ্যৎ কালের জন্য অবিশ্বাসীদের জন্য এক জঘণ্য দৃষ্টান্ত করে রেখেছেন এই মর্মে আল্লাহ্‌র বাণী- " আল্লাহ্ পাক অবিশ্বাসীদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত বানিয়েছেন নূহের স্ত্রীকে এবং লূতের স্ত্রীকে। তারা উভয়ে আমার নেক বান্দাদের মধ্য হতে দু'জন নেক বান্দার বিবাহের অধীন ছিল। অতঃপর তারা উভয়ে তাদের সহিত বিশ্বাস ঘাতকতা করল। অনন্তর ঐ দুই বান্দা আল্লাহ্‌র আযাব হতে তাদের কোন কাজেই আসল না এবং তাদের প্রতি নির্দেশ হলো দোযখে প্রবেশ করে প্রবেশকারীদের সহিত।"[৩২]

৩১। فنجيناه وأهله أجمعين . إلا عجوزا في الغابرين . ثم دمرنا الآخرين . وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين . إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز الرحيم.

আল-কুরআন, ২৬ : ১৭০-১৭৫

৩২। ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين .

আল-কুরআন, ১০ : ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

মাদইয়ান বা আসহাবে আইকাহ-এর ইতিহাস

মাদইয়ান বা আইকাহ পরিচিতি

মাদইয়ান মূলত কোন স্থানের নাম নহে ; বরং এটি একটি গোত্রের নাম। এই গোত্রের নামানুসারেই তাদের বস্তিটির নাম মাদইয়ান বলে বিখ্যাত হয়েছিল। আবার তারা যে জায়গায় বসবাস করত সে জায়গার নাম ছিল "মাদইয়ান"। সেই জায়গার নামানুসারে জাতির নাম হয় মাদইয়ান।

এই গোত্রটি হযরত ইব্রাহীমের পুত্র মাদইয়ানের বংশ হতে উদ্ভূত। হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর তৃতীয় স্ত্রী "কাতুরার" গর্ভে মাদইয়ানের বংশধর বিধায়- এ কাওমের নাম হয় "কাওমে মাদইয়ান"। পরবর্তীতে হযরত শু'আইব নবীরূপে প্রেরিত হওয়ার পর হতে এই গোত্রটিই কাওমে শু'আইব নামে অভিহিত হতে লাগল।[১]

তাদের " আসহাবে আইকাহ" বলা হয়েছে। "আইকা" অর্থ সবুজ বৃক্ষরাজী ও তরুলতায় ঘেরা ঘন বন।[২]

তাফসীরকারকগণ এ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার মত প্রকাশ করেন " আসহাবে মাদইয়ান" এবং "আসহাবে আইকাহ"একই গোত্রের দুটি নাম ? নাকি ইহারা দু'টি পৃথক পৃথক গোত্র ? কারো মতে, এ দুটি পৃথক পৃথক গোত্র। মাদইয়ান ছিল একটি সভ্য ও শহরী গোত্র। আসহাবে আইকাহ ছিল গ্রাম্য এবং যাযাবর গোত্র যারা বন-জঙ্গলে বসতি করত। এ কারণে তাদেরকে "আসহাবে আইকাহ" অর্থাৎ বন-জঙ্গলের অধিবাসী বলা হয়েছে। এ মতালম্বী তাফসীরগণের মতে ان هما لامام مبين আয়াতে هما দ্বি বচনের সর্বনামটির লক্ষ্যস্থলে এ দুটি গোত্র "মাদইয়ান" এবং আসহাবে আইকাহ উদ্দেশ্য "মাদইয়ান" ও কাওমে লূত নহে।

আর অন্যান্য তাফসীরকারকগণ গোত্র দু'টিকে একই গোত্র সাব্যস্ত করে বলেন যে, জলবায়ুর পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা এবং নদী-নালার প্রাচুর্য এই স্থানটিকে এতই সরস ও মনোমুগ্ধকর করে দিয়েছিল এবং এখানে ফল মেওয়া ও সুগন্ধিযুক্ত ফুলের এত বাগ-বাগিচা ছিল যে, যদি কেহ বস্তির বাইরে দাঁড়িয়ে এর দৃশ্য অবলোকন করত তবে তার বোধ হত ইহা যেন অতি সুন্দর ও সরস ঘন বৃক্ষরাজির একটি ঝোপ। এই কারণেই কুরআন একে "আইকাহ" বলে পরিচয় দিয়েছে।

ইব্ন কাসীর এর তাফসীরকারক হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর এর ধারণা এই যে, এই বস্তিতে "আইকাহ" নামে একটি বৃক্ষ ছিল। গোত্রের লোকেরা উক্ত বৃক্ষের পূঁজা করত বলে "মাদইয়ান" গোত্রকেই "আসহাবে আইকাহ" বলা হয়েছে।[৩]

১। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৪৪

২। তাহের সুরাটী (ভারত), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪

৩। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৪৫-৩৪৬

Dhaka University Institutional Repository

যাহোক, প্রবল মত এই যে, "আসহাবে আইকা" একই গোত্র। পৈত্রিক সম্পর্কের কারণে মাদইয়ান বলা হয়েছে এবং বসত ভূমির স্বাভাবিক ও ভৌগোলিক অবস্থান হিসেবে "আসহাবে আইকাহ" অভিহিত করা হয়েছে।[৪]

মাদইয়ান বা আসহাবে আইকার বসতি

এ গোত্রটি কোন স্থানে বসবাস করত, এ নিয়ে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে: এরা মূলতঃ হেজাযে শামের সহিত সংমিলিত এমন স্থানে বসতি করত যার পরিধি আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের মরুভূমির পরিধির বরাবর অবস্থিত। আবার কেউ কেউ বলেন- এরা শামের সহিত মিলিত "মা'আন" ভূ-খন্ডে বসবাস করত।[৫] কুরআন মজীদে এ গোত্রের বাসভূমি সম্বন্ধে দু'টি কথা জানিয়ে দিয়েছেঃ

১। তারা "ইমামে মুবিনে" বসবাস করত। যেমন- কুরআন মজীদে উল্লেখ আছে। অর্থাৎ কাওমে লুত ও কাওমে মাদইয়ান উভয় কাওমই এক বিরাট রাজপথের পার্শ্বে বসতি করত।

আরব দেশের সে রাজপথটি হেজাযের ব্যবসায় কাফেলাগুলোকে শাম, ফিলিস্তিন, ইয়ামান এমন কি মিশর পর্যন্ত নিয়ে যায় এবং লোহিত সাগরের পূর্ব তীর দিয়ে চলে যেত। কুরআন মজীদে এ সড়কটিকে "ইমামে মুবীন" মুক্ত ও পরিস্কার রাজ সড়ক বলতেছে।

২। তারা "আসহাবে আইকাহ" (ঝোপ ঝাড়ের অদিবাসী) বলে অভিহিত হত। আরবী ভাষায় "আইকাহ" সবুজ বরণ ঝোপ-ঝাড়কে বলা হয়, যা সবুজ ও সতেজ বৃক্ষলতার প্রাচুর্যের দরুন বন-জঙ্গলে উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং ঝোপের আকৃতি ধারণ করে।

এ দু'টি কথা জেনে নেওয়ার পর "মাদইয়ান" গোত্রের বসতির সন্ধান সহজেই পাওয়া যেতে পারে। তা হল মাদইয়ানের গোত্রটি লোহিত সাগরের পূর্ব তীরে এবং আরব দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এমন জায়গায় বসবাস করত যা শামদেশের সংযুক্ত হেজাযের শেষাংশ বলা যেতে পারে। আর হেজায বাসীরা শাম, ফিলিস্তিন এমনিক মিশর পর্যন্ত যাতায়াত কালে " আসহাবে মাদইয়ানের" বস্তির ভগ্নাবশেষগুলো পথে পড়ত, যা তাবুকের বিপরীত দিকে অবস্থিত ছিল।[৬]

"মাদইয়ান গোত্র" সুয়েজ খালের পূর্ব দিকে এবং আরব ভূমির উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত এক স্থানে বসবাস করত, যা আরব ভূমির শেষ সীমায় সিরিয়ার সংলগ্ন। বর্তমানে এস্থান পূর্ব জর্দানের সামুদ্রিক বন্দর মা'আন নামক স্থানে অবিস্থত।[৭]

৪। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৪৪

৫। প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৪৫

৬। প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৪৫

৭। তাহের সুরাটী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪

Dhaka University Institutional Repository

মাদইয়ান বাসীর প্রতি শু'আইব (আঃ)

আল্লাহ তা'আলা মানুষের হিদায়েতের জন্য যুগে যুগে অগণিত রাসূল পাঠিয়েছেন। তারা সকলেই জগতের মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান করেছেন। শু'আইবকেও আল্লাহ পাক তার কাওমকে হিদায়েতের জন্য প্রেরণ করেন। হযরত শু'আইব (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর কিছু দিন পূর্বে নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন যা কুরআন পাকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কুরআন মজীদে সূরা আ'রাফে হযরত নূহ (আ.) হযরত হুদ (আ.) হযরত সালেহ, হযরত শু'আইব (আ.) এর উল্লেখের পরে বলিয়াছে ঃ ثم بعثنا من بعدهم موسى

"অতঃপর আমি ইহাদের পরে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছি মূসা (আ.) কে"।[৮]

শু'আইব (আঃ)-এর দাওয়াত ও সত্য প্রচার

হযরত শু'আইব (আ.) তাঁর নিজ কাওমের প্রতি প্রেরিত হলেন। অতঃপর তিনি যখন দেখতে পেলেন তার কাওমের লোকেরা আল্লাহর আদেশ নিষেধ পরিপন্থি কাজে লিপ্ত রয়েছে। আর তাদের এ নাফরমানী ও পাপানুষ্ঠান গুটি কয়েক মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং গোটা কাওমই ধ্বংসের ঘুর্ণিপাকে আক্রান্ত ও লিপ্ত রয়েছে। এমনকি তারা তাদের এ কার্যসমূহে গর্বের বিষয় বলে মনে করছে। বিশেষত তারা যেসব অসৎ কার্যাবলতিে নিজেকে লিপ্ত রাখত তা হলঃ

(১) মূর্তি পুজা ও মুশরেকী রীতিনীতি (২) ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে নিজে পূর্ণ মাত্রায় মেপে নেয়া এবং অপরের দিকে হলে ওজনে কম দেয়া। (৩) সমস্ত লেনদেনের ব্যাপারেই কৃত্রিমতা এবং ডাকাতি।[৯]

হযরত শু'আইব (আ.) নিজ কাওমের এ অসৎ কার্যাবলী দেখে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করেন। তাদেরকে আল্লাহ্‌র পথের দিকে আহবান করেন। তার এ আহবান পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره

"হে আমার কাওমের লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত আর কেউ তোমাদের প্রভূ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।"[১০]

ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে ওজন ও মাপ পুরোপুরি এবং সঠিক রাখ। আর মানুষের সহিত কাজে কারবারে কৃত্রিমতা করিও না। গতকাল পর্যন্ত হয়ত তোমরা এ সমস্ত অসৎ চরিত্রতার মন্দ পরিনামের অবস্থা জানতে পার নাই। কিন্তু আজ তোমাদের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার প্রমাণ এবং নিদর্শন এসে পৌছেছে। এখন আর অজ্ঞতা ও না জানার ক্ষমার যোগ্য হবে না। সত্যকে গ্রহণ কর ও মিথ্যা হতে নিবৃত হও।[১১]

৮। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৪৭

৯। প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৪৭

১০। আল-কুরআন. ১১ : ৮৪

১১। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৪৯

Dhaka University Institutional Repository

এ মর্মে আল্লাহর উক্তি:

"তোমরা ওজনে পূর্ণ দেবে আর অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে মাপে কম দিয়ে লোকদের ক্ষতি করো না এবং দেশের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করে বেড়িও না।"[১২]

শু'আইব তাদেরকে বলেন, তোমরা রাস্তায় রাস্তায় ওত পেতে বসে থাক। নিরীহ পথচারীকে ভয় প্রদর্শন করে তাদের ধন-সম্পদ লুট করে নিয়ে যাও। আর যারা এ অপকর্ম ছেড়ে দিয়ে ভাল হতে চায় এবং দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করা হতে বিরত থেকে শান্তির পথে আসতে চায় তাদেরকে তোমরা ভয় দেখিয়ে বিরত রাখ। এ সব কার্য হতে অতিসত্ত্বর ফিরে যাও।[১৩]

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

" তোমরা এ উদ্দেশ্যে রাস্তায় বসনা যে, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনায়নকারীদের ভয় প্রদর্শন করবে আর এতে বক্রতা অনুসন্ধান করবে।"[১৪]

হযরত শু'আইব (আ.) কে "খাতীবুল আম্বিয়া" বলা হত। কারণ তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় খুব সুক্ষ্ম ও হিকমতের সাথে বক্তব্য পেশ করতে পারতেন। এ ক্ষেত্রেও তিনি তাদেরকে স্বীয় অনুহগত্যে আনার জন্য বক্তব্য নম্রতা ও কাঠিন্য উভয় দিয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন।[১৫] তিনি তাদের মধ্যে ঈমানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য প্রথমে আল্লাহ পাকের প্রদত্ত নিয়ামতের আলোচনা করতেনঃ واذكروا اذ كنتم قليلا فكثرتم

"স্মরণ কর ! যখন তোমরা নগণ্য ছিলে, অতঃপর তোমাদের বৃদ্ধি করে দেয়া হল।"[১৬]

তোমরা গরীব ছিলে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে তোমাদেরকে একটি শক্তিশালী গোত্রে পরিণত করেছেন। অতএব, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া তোমাদের একান্ত কাম্য। যদি তোমরা তা না করে নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য অনুযায়ী চলতে থাক এবং সংশোধন না হও তবে পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখ।[১৭]

১২। ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين
আল-কুরআন, ১১ : ৮৫

১৩। তাহের সুরাটী, প্রগুক্ত, পৃ. ২৪৭

১৪। ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.
আল-কুরআন, ৭ : ৮৬

১৫। তাহের সুরাটী, প্রগুক্ত, পৃ. ৩৪৭

১৬। আল-কুরআন, ৭ : ৮৬

১৭। তাহের সুরাটী, প্রগুক্ত, পৃ. ২৪৮

Dhaka University Institutional Repository

"বিপর্যয়কারীদের শেষ পরিণাম কি হয়েছে? তা ভেবে দেখ"।[১৮]

হযরত শু'আইব (আ.) ইহাও বললেন, দেখ, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এই জন্য প্রেরণ করেছেন যেন আমি আমার সাধ্যানুযায়ী তোমাদেরকে সংশোধন করার চেষ্টা করি। আর আমি যা কিছু বলছি ইহার সত্যতার জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রমাণ এবং নির্দেশও পেশ করছি। কিন্তু আফসোস ! তোমরা এ স্পষ্ট দলিল প্রমাণ দেখেও অবাধ্যতাচারণ এবং নাফরমানীর উপর স্থায়ী রয়েছ। আমি আমার নছীহত ও হেদায়েতের বিনিময়ে তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিকও দাবী করছি না, আর দুনিয়ার কোন স্বার্থও তোমাদের নিকট চাচ্ছি না। আমার বিনিময় তো আল্লাহ্র নিকট রয়েছে। যদি তোমরা এখনো আমার কথার অমান্য করতেই থাক, তবে আমার আশংকা হচ্ছে আল্লাহ্র আযাব এসে তোমাদেরকে ধ্বংস ও বিনষ্ট করে না ফেলে। জেনে রাখবে আল্লাহ্র ফয়সালা অটল। উহাকে প্রতিরোধ বা খন্ডন করার সাধ্য নেই।[১৯]

হযরত শু'আইব (আ.) এর বার বার আহবানে কাওমের সর্দার ক্রোধান্বিত হয়ে বলল ঃ "তোমার নামায কি আমাদের নিকট ইহাই চায় যে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষের দেবতার পূঁজা ত্যাগ করি এবং নিজেদের ধন-দৌলতে আমাদের এই স্বাধীনতা না থাকে যে, যেরূপ ইচ্ছা লেনদেন করি। যদি আমরা ওজনে কম দেয়া ছেড়ে দেই এবং মানুষের সঙ্গে কারবারে কম দিয়ে তার ক্ষতি না করি তবে তো দরিদ্র এবং কাঙ্গাল হয়ে পড়ব। অতএব, এরূপ শিক্ষা প্রদানে তোমাকে কি কেহ সত্যিকার পথ প্রদর্শক মেনে নিতে পারে?"[২০]

হযরত শু'আইব (আ.) অত্যন্ত মনব্যথা নিয়ে বললেন, হে আমার কাওম ! আমার ভয় হচ্ছে, তোমাদের বেপরোয়া ভাব এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানী পাছে তোমাদেরও সেই পরিণাম ফলই করে না দেয়, যা তোমাদের পূর্বে নূহ, হুদ, সালেহ ও লূত (আ.) কাওমগুলোর হয়েছিল। এখনও সময় যায় নাই। আল্লাহ পাকের সম্মুখে নত হয়ে পড় এবং নিজেদের অসৎ কার্যসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থণা কর এবং ভবিষ্যতের জন্য তাওবা কর। নিঃসন্দেহে আমার পরওয়ারদিগার খুবই দয়ালু অত্যন্ত মেহেরবান। তিনি তোমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন।

কাওমের সর্দাররা এ কথা শুনে জবাব দিল, হে শুআইব! আমাদের কিছুই বুঝে আসে না, তুমি কি বলছ ? তুমি আমাদের সকলের চেয়ে বেশী দুর্বল ও দরিদ্র। তোমার কথা যদি সত্যি হত, তাহলে তোমার জিন্দেগী আমাদের সকলের জিন্দেগীর চেয়ে উত্তম হত। আমরা শুধু তোমার খানদানকে ভয় করছি। অন্যথায় তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করতাম। তুমি আমাদের উপর কখনো জয়ী হতে পারতে না।[২১]

১৮। وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين
আল-কুরআন, ৭ : ৮৬ (শেষাংশ)

১৯। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ: ৩৫০

২০। قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد
আল-কুরআন, ১১ : ৮৭

২১। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৫১

Dhaka University Institutional Repository

হযরত শু'আইব বললেন, তোমাদের জন্য আফসোস ! তোমাদের জন্য কি আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় আল্লাহ্‌র চেয়ে আমার খানদান অধিক ভয়ের কারণ হচ্ছে? অথচ আমার পরওয়ারদিগার তোমাদের যাবতীয় কার্যকে বেষ্টন করে রেখে এবং তিনি সবকিছুই জানেন এবং সবকিছুই দেখছেন। আচ্ছা যদি তোমরা আমার উপদেশ না মান, তোমরাই জান, তোমরা সেই সমস্ত কাজ করতে থাক, যা করতেছ, অচিরেই আল্লাহ্ পাক বলে দিবেন যে, আযাবের উপযোগী কারা ? আর কে মিথ্যাবাদী ? তোমরা অপেক্ষা করতে থাক আমিও অপেক্ষা করতে থাকি।

অবশেষে তাই হলো, যা আল্লাহ্ পাকের বিধানের চিরন্তন ফয়সালা ও মিমাংসা। অর্থাৎ দলিল প্রমাণের আলো আসার পরেও যখন বাতেলের উপর হটকারিতা করা হয় এবং দলিল প্রমাণের সত্যতা নিয়ে বিদ্রুপ করা হয়, সত্য প্রচারে ও অনুসরণে বাধা সৃষ্টি করা হয়, তখন আল্লাহ্‌র আযাব সেই অপরাধী জীবনের অবসান ঘটিয়ে দেয়ার এবং ভবিষ্যতে লোকদের জন্য উহাকে উপদেশমূলক দৃষ্টান্ত বানিয়ে দেন।[২২]

মাদইয়ান বা আইকাহ্ জাতির ধ্বংস

শু'আইব (আ.)-এর কাওম যখন চরম অবাধ্যতা ও নাফরমানীর পরিচয় দিল তখন তাদেরকে সতর্ক করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সূর্যের তাপ বৃদ্ধি করে দিলেন। ফলে অসহ্য গরমে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ল। গরম এত বেশী পড়েছিল যে, মনে হল যেন জাহান্নামের দরজা খুলে দেয়া হয়েছে। কোথাও শান্তি পাওয়া যাচ্ছিল না, তারা কখনো সামান্য শান্তির আশায় কোন ছায়ায় আশ্রয় নিলে সেখানে আরো বেশী অশান্তি লাগত। শান্তির আশায় কখনো তারা পানিতে চলে যেত। কিন্তু পানিতে গরম আরো বেশী অনুভূত হত। অবশেষে তারা মাটিতে গর্ত খুরে সেখানে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করেছে। সেখানেও আরো বেশী গরম। এমনিভাবে দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ল। অবশেষে তারা শহর পরিত্যাগ করে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। সেখানেও তাদেরকে দু'প্রকারের আযাব এসে বেষ্টন করে ফেলল। একটি ভূ-কম্পনের আযাব এবং দ্বিতীয়টি অগ্নি বৃষ্টি। যখন তারা নিশ্চিত মনে নিজ নিজ গৃহে আরাম করতেছিল, তখন হঠাৎ করে এক ভয়ংকর ভূ-কম্পন আরম্ভ হল এবং সেই ভয়ংকর অবস্থা শেষ হতে না হতেই উপর হতে অগ্নি বর্ষণ আরম্ভ হয়ে গেল। ফলে প্রাতঃকালের দর্শকেরা দেখতে পেল গতকালের অবাধ্য ও অহংকারী আজ বিদগ্ধ হয়ে উপুর হয়ে পড়ে রয়েছে।[২৩]

"অতঃপর তা তাদেরকে ভূ-কম্পন পাকড়াও করল। অতএব, প্রাতঃকালে তারা সকলে নিজ নিজ গৃহে অধঃমুখ অবস্থায় পড়ে রইল।[২৪]

২২। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৫২

২৩। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৫১-৩৫২

২৪। فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين

আল-কুরআন, ৭: ৯১

Dhaka University Institutional Repository

"অতঃপর তাদেরকে ভূ-কম্পন পাকড়াও করল। অতএব, তাদের অগ্নি বর্ষণকারী মেঘমালা পাকড়াও করল। নিঃসন্দেহে উহা বড় ভয়ংকার দিবসের আযাব ছিল।"[২৫]

অবশ্য আযাবের সময় হযরত শু'আইব (আ.) এবং তার অনুসারী সম্পূর্ণ শান্তি ও নিরাপদে ছিলেন। তাই তাদেরকে শহর হতে বের হতে হয়নি। আর আযাবের কবলেও পড়তে হয়নি। কুরআন মাজীদে তাদের পরিণতির বর্ণনা করা হয়েছে- "যারা শু'আইব (আ.) কে মিথ্যারোপ করেছিল তাদের অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তারা এসব গৃহে বসবাস করতে পারেনি। যারা শুআইবকে মিথ্যারোপ করেছিল তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।"[২৬]

হযরত শুআইব (আ.)-এর সকল লোক ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় তিনি স্বীয় অনুসারীদেরকে নিয়ে এ স্থানে ত্যাগ করল। কারো কারো মতে শু'আইব (আ.) মাদইয়ান ত্যাগ করে পবিত্র মক্কায় যেয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মাদইয়ান ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় তার ধ্বংস প্রাপ্ত কাওমের প্রতি মুখ করে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, হে আমার কাওমের লোকজন! আমি তো আমার পরোয়ারদিগারের পয়গাম তোমাদের নিকট পৌছে দিয়েছিলাম। আর আমি তোমাদের শুভই চেয়েছিলাম। বার বার নানা ভাবে তোমাদের বুঝিয়েচিলাম। কিন্তু বড়ই আফসোসের বিষয় তোমরা আমার কথায় আমল দাওনি। ফলে আজ তোমাদের এ করুন পরিণতি।[২৭]

২৫। فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

আল-কুরআন, ২৬ : ১৮৯

২৬। وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ .

আল-কুরআন, ৭ : ৯৩

২৭। মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ), প্রাগুক্ত,পৃ.৯৭৭

Dhaka University Institutional Repository

'সাবা' জাতির ইতিহাস

সাবা জাতির পরিচিতি

'সাবা' ক্বাহতানী সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ একটি শাখা গোত্র। আরব ঐতিহাসিকগণ উহার বংশ পরিচয় এরুপ বর্ণনা করে থাকেন। 'সাবা ইব্ন ইয়াশ্জাব ইব্ন ইয়া'রাব ইব্ন কাহতান। অবশ্য তাওরাতে বলা হয়েছে- 'সাবা' ক্বাহতানের পুত্র। [১]

আর ইয়াকতান (ক্বাহতান) হতে আমলুদাদ, সালাফ, হাছার, মাদাত, আরেখ, হাদওয়ারাম, আওয়াল, ওযাক্বলাহ আউবাল, আবি মায়েল, সাবা, খাযারমাউত, আউকীর, হাবীলাহ, ইয়ারেজ ইয়ারাব এবং ইউবাব জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা সকলেই বনী ইয়াকতান ছিল এবং তাদের আবাস ভূমি "মীসা" হতে সেফার যাওয়ার পথে এবং ইউরোপের পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। [২]

'সাবা' তাওরাতের বর্ণনা অনুযায়ী কাহতানের পুত্র ছিল। আরবদের বর্ণনা অনুযায়ী কাহতানের পৌত্র ছিল। ইতিহাসবিদগণ এ কথায় একমত যে, কাহতান 'সাম' ইব্ন নূহ (আ.)-এর বংশধরদের একটি শাখা। [৩]

কোন কোন ঐতিহাসিকদের প্রবল মত এই যে, 'কাহতানীরাও ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর এবং সমগ্র আরব গোত্র ইসমাঈল (আ.)-এর ছাড়া অন্য কোন বংশ হ'তে নহে। যেমন বংশ পরিচয় জ্ঞানী 'আলিমগণের মধ্য হ'তে যুবায়ের ইব্ন বাকার এবং মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (রহ.) এর মত ইহাই। [৪]

আর ইমাম বুখারী (র.)ও এ মত পোষণ করেন। কেননা তিনি বুখারী শরীফে একটি অধ্যায় লিখেছেন- باب نسبة اليمن الى اسماعيل عليه السلام হাদীসটি এই "রাসুলুল্লাহ (সা.) বনী আসলামের একটি সম্প্রদায়ের দিকে বের হলেন, তখন তারা বাজারে তীর ছোড়ার অভ্যাস করছিল। তখন তিনি বললেন, তোমরা খুব তীর ছোড়ার অভ্যাস কর। তোমাদের আদি পিতা ইসমাঈল (আ.)ও তীরন্দায ছিলেন।" [৫]

ইতিহাসের দৃষ্টিতে "সাবা" দক্ষিণ আরবের একটি বৃহৎ জাতির নাম। কতগুলো বড় বড় গোত্র সমন্বয়ে এ জাতিটি গড়ে উঠেছিল। [৬]

১। হিফযুর রহমান , খ. ৪, পৃ. ৫৫

২। পদায়েশ, ১১, অধ্যায় : ২৬-৩০

৩। ড. মাযহার উদ্দিন ছিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

৪। তারিখে ইবনে কাসীর, পৃ. ১৫৬

৫। ইব্ন হাজার, *ফাতহুল বারী,* ২য় সং. বৈরুত: দারু ইহয়াতু তুরাসিল আরাবী, ১৪০২হি. খ. ২য়, পৃ. ৩০৪
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من اسلم يتناضلون باسوق فقال ارموا بنى اسماعيل فان اباكم كان راميا .

৬। মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.),প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৭৬

Dhaka University Institutional Repository

"সাবা" ছিল আরবের এক ব্যক্তির নাম। আরবে তাঁর বংশ থেকে নিম্নোক্ত গোত্রগুলোর উদ্ভব হয়। কিন্দাহ, হিম্য়ার, আয্দ আশ'আরীন, মায্হিজ, আনমার, (এর দুটি শাখা: খাস'আম এবং বাজীলাহ) আমেলাহ, জুযান, লাখম, ও গাসসান। [৭]

তত্ত্বজ্ঞানীগণ দাবী করেন, সমগ্র আরববাসীর বংশসমূহের উৎস দুটি মাত্র, আদনান ও ক্বাহতান। আদনান-বনু ইসমাঈল এবং আরবে মুস্তারেবা অথার্ৎ আদি আরব নহে। আর কাহতান আরেবা অর্থাৎ আদি আরব। [৮]

অতি প্রাচীন কাল থেকে আরবে এ জাতির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। খৃষ্ট পূর্ব-২৫০০ অব্দে "উর" এর শিলালিপিতে সাবোম নামের মধ্য দিয়ে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এর পর ব্যবিলন ও আসিরিয়ার শিলালিপিতে এবং বাইবেলেও ব্যাপক হারে এর উল্লেখ দেখা যায়। [৯]

এ জাতির আবাস ভূমি ছিল আরবের দক্ষিণ পশ্চিম কোনে বর্তমানে ইয়ামন নামে পরিচিত এলাকাটি। এর উত্থানকাল শুরু হয় খৃষ্টপূর্ব ১১শ বছর থেকে হযরত দাউদ ও হযরত সুলাইমান (আ.) এর সময়ে একটি ধনাঢ্য ও প্রভাবশালী জাতি হিসেবে এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। [১০]

"সাবা" শব্দের তাৎপর্য ও পরিচিতি

"সাবা" শব্দটি কারো নাম না কি উপাধী ? ইহাও একটি প্রশ্ন, যা আলোচনাধীনে এসে পড়ে। তাওরাত বলে, ইহা নাম । আর আরব ঐতিহাসিকগণ বলেন, ইহা উপাধি এবং নাম আমর কিম্বা "আবদে শামস"। [১১]

বর্তমানকালের ঐতিহাসিকগণ দ্বিতীয় মতটিকে সঠিক মনে করেন। আরব ঐতিহাসকিকগণ 'সাবা' শব্দটি "ক্বয়েদ" অর্থ হ'তে গৃহীত হয়েছে। যেহেতু সে আরবে সর্বপ্রথম 'যুদ্ধবন্দীর' রীতি প্রচলন করেছে এবং তাদেরকে গোলাম বানিয়েছে। এই জন্য সে "সাবা" উপাধী প্রাপ্ত হয়েছে।

আর নতুন ঐতিহাসিকগণ বলেন, س - ب - الف ও همزة অক্ষর গুলো দ্বারা গঠিত এমন একটি শব্দ হ'তে গৃহীত যার মধ্যে তেজারতের অর্থ শামিল রয়েছে। "সাবা" এবং তার কাওম যেহেতু ব্যবসা-বাণিজ্য করত। সুতরাং সে এবং তাঁর কাওম "সাবা" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যেমন আজ আরবী অভিধানে এই শব্দটি শরাবের ব্যবসায়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। [১২]

৭। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইবনে জারীর, ইবনে আলী হাতেম ইবনে আবদুল বার ও তিরমীযী রসুলুল্লাহ (সা.) থেকে হাদীসটি বর্ণিত।

৮। আল আম্বাহ, আলা কাবায়েলির রওয়াত. পৃ. ৫৭-৫৮

৯। যাবুর ৭২:১৫, যিরযিয়, ৬:২০, হিযিস্কেল ২৭:২২ ও ৩৮:১৩ এবং ইয়োব ৬: ১৯

১০। মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

১১। ইব্ন কাসীর, প্রাগুক্ত, খ. ২য়, পৃ. ১৫৮

১২। হিফজুর রহমান, খ. ২৫, পৃ. ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

سبا الخمر شراها بشربها وسبى سباء الخمر حملها من بلد الى بلد ـ

তার উপাধী "আরবাইশ"ও ছিল। অভিধানে ريش কিম্বা رياش এর অর্থ মাল। এ ব্যক্তি যেহেতু অনেক বড় বিজয়ী এবং দানশীল ছিল এবং মানুষকে অধিক পরিমাণ ধন-দৌলত দান করত, সুতরাং সে এই উপাধীতে প্রসিদ্ধ হয়েছে। [১৩]

তিরমিযী শরীফে ইবন আব্বাসের রেওয়ায়াতে একটি হাদীস রয়েছে যাতে উল্লেখ আছে. যে, জনৈক প্রশ্নকারী নবী (সা.) কে জিজ্ঞাসা করল, "সাবা" কোন দেশের নাম, না কি কোন পুরুষের নাম, নাকি কোন স্ত্রীলোকের নাম ? তিনি বলেন, পুরুষের নাম। যার বংশে দশটি গোত্র আছে। চারটি গোত্র শাম (সিরিয়ায়) বাস করত এবং ছয়টি গোত্র ইয়ামনে বাস করত। ইয়ামনে গোত্রগুলো হচ্ছে মায্জাহ, কান্দাহ, আয্দ, আশ্আর ও আনমার। আর "শামের গোত্রগুলো হচ্ছে নাখম, জোযাম, আমেলাহ, ও গাস্সান। তিরমিযী এ হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন। [১৪]

সাবা'র শাসনকাল

সাধারণ ঐতিহাসিকগণ বলেন- "সাবা" চারিশত চব্বিশ বৎসর শাসনকার্য পরিচালনা করেছে। [১৫]

কিন্তু আধুনিক ইতিহাস দর্শন হিসেবে ইহার অর্থ-এই মনে করা হয় যে, ইহা "সাবা" বংশের শাসনকাল বর্ণনা করা হয়েছে। অবশ্য এই নিয়ম এ স্থলে সঠিক বলে মনে হচ্ছে না। কেননা, কাহতানের তৃতীয় পুরুষ হ'তে এই মুদ্দতটিকে আরম্ভ করা হয়, তবে হইা খৃষ্ট পূর্ব প্রায় ২৫০০ হ'তে পারে। এই হিসেবে "সাবা"র শাসনকাল খৃষ্টপূর্ব ২০০০ সনে শেষ হ'য়ে যাওয়া উচিত অথচ হযরত সুলায়মানের আলোচনায় ইহা প্রমাণিত হয়েছে যে, খৃষ্ট পূর্ব ৯৫০ সনে "সাবা"র "বিলকীস" সুলাইমানের দেখমতে হাজির হয়ে হযরত সুলাইমানের হাতে ইসলাম কবুল করেছেন এবং বহু "হাদ্ইয়া ও তোহফা (উপহার ও উপঢৌকন) পেশ করেছেন।

আর সূরা নামলের মধ্যে যেমন "সাবা"র রাণীর ঘটনা হ'তে প্রকাশ পেয়েছে যে, এই সময়টুকু "সাবা"র শাসনের চরম উন্নতির সময়, যেমন, যাবুর কিতাবে হযরত দাউদ (আ.)-এর দো'আ উল্লেখ রয়েছে ঃ

"হে খোদা! বাদশাহকে ন্যায় বিচারের গুণ সমূহ দান করুন। সে আপনার লোকদের মধ্যে সততার সহিত শাসনকার্য পরিচালনা করবে। তারসীস ও দ্বীপ সমুহের রাজাগণ মানত ও উপহারসমূহ পেশ করবে এবং সে জীবিত থাকবে এবং সাবার স্বর্ণ তাকে দেওয়া হবে। তাঁর জন্য সর্বদা দো'আ হবে।[১৬]

১৩। তাফসীরে ইব্ন কাসীর, সূরা সাবা'র ব্যাখ্যাংশ ।

১৪। প্রাগুপ্ত, খ. ২য়, পৃ. ১০৬

১৫। ইব্ন কাসীর, *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৩৯৮/১৯৭৮, খ. ২য়, পৃ. ২৩৪

১৬। যাবুর -৭২ ও হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

হযরত দাউদ (আ.)-এর দো'আ কুবল হলো এবং খৃষ্ট পূর্ব ৯৫০ সনে তাঁর পুত্র হযরত সুলায়মান (আ.)-এর খেদমতে "সাবা'র রাণী হাযির হ'য়ে বহু স্বর্ণ ও মহামূল্যবান হীরা জহরত পেশ করল।

সূতরাং এরূপ মনে করা হয়, যে, হয়ত সাবার আয়ুস্কাল সম্বন্ধে অত্যুক্তি করা হয়েছে, কিম্বা ইহা দ্বারা "সাবা" খান্দানের সমস্ত বাদশাহদের শাসনকাল বর্ণনা করা হয় নাই। বরং ইহাদের শাসনের দ্বিতীয় স্তর "মুলুকে সাবা"র শাসনকালের মুদ্দত উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যা ন্যূনাধিক চারশত ছত্রিশ বৎসর। [১৭]

সাবা জাতির শাসন যুগের স্তর সমূহ

প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ইয়ামন থেকে প্রায় তিন হাজার শিলালিপি উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলো ইতিহাসের উপর আলোকপাত করে। এই সংগে আরবীয় ঐতিহ্য ও প্রবাদ এবং গ্রীক ও রোমীয় ইতিহাস থেকে সংগ্রহীত তথ্যাবলী একত্র করলে এ জাতির একটি বিস্তারিত ইতিহাস লেখা যেতে পারে। এ সব তথ্যাবলীর দৃষ্টিতে তার ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ যুগগুলো নিম্নভাবে বিবৃত করা যেতে পারেঃ

একঃ প্রথম স্তরের প্রথম যুগ খৃষ্টপূর্ব প্রায় ১১০০ সন হতে আরম্ভ করে খৃষ্ট পূর্ব ৬৫০ সন। ইহা 'সাবা' শাসনের উন্নতির যুগ বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। এ যুগের শাসনকর্তাদের উপাধি ছিল "মাকারেবে সাবা" সম্ভবত এখানে مكرب শব্দটি مقرب এর সম অর্থবোধক ছিল।
এখানে এর অর্থ দাড়ায় ঃ এ বাদশাহ মানুষ ও খোদার মধ্যে নিজেকে সংযোগ মাধ্যম নিসেবে গণ্য করতেন। অথবা অন্য কথায় বলা যায়, তিনি ছিলেন পুরোহিত বাদশাহ (Priest kings) এসময় তার রাজধানী চিল "সারওয়াহ" নগরীতে। মা'রিবের পশ্চিম দিকে একদিনের দূরত্বে অবস্থিত খারাবাহ নামক স্থানে আজও এর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এ আমলে মা'রিবের বিখ্যাত বাঁধের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। এরপর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বাদশাহ এর সীমানা আরো সম্প্রসারিত করেন। হযরত সুলামান (আ.)-এর যামানায় সাবার রাণী (বিলকীস) এ যুগের সহিতই সংশ্লিষ্ট। [১৮]

দুইঃ খৃষ্ট পূর্ব ৬৫০ অব্দ থেকে খৃষ্টপূর্ব ১১৫ অব্দ পর্যন্ত। এ সময় সাবার বাদশাহরা মুকাররিব উপাধী ত্যাগ করে 'মালিকে বাদশাহ' উপাধী গ্রহণ করেন। এর অর্থ হয় রাজ্য পরিচালনায় ধর্মীয় ভাবধারার পরিবর্তে রাজনীতি ও সেকুলারিজমের রং প্রাধান্য লাভ করেছে। এ আমলে সাবার বাদশাহগণ সারওয়াহ ত্যাগ করে মা'রিবকে তাদের রাজধানী নগরীতে পরিণত করেন। এ নগর সাগরের পৃষ্ঠ থেকে ৩৯০০ ফুট উচুঁতে সান'আ থেকে ৬০ মাইল পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। আজ পর্যন্ত এর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষগুলো সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এক সময় এটি ছিল দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুসভ্য জাতির কেন্দ্রভূমি। [১৯]

১৭। সাইয়েদ সুলাইমান নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

১৮। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৮

১৯। ড. মাযহার উদ্দিন সিদ্দিকী, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৭০

Dhaka University Institutional Repository

তিনঃ ১১৫ খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৩০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়, এ সময় সাবার রাষ্ট্রব্যবস্থায় হিম্য়ার গোত্র প্রাধান্য লাভ করে। এ যুগের বাদশাহদেরকে 'সাবা দারীদান' এবং "মূলকে হিমাইরী' বলা হয়। দারিদান তাদের বিখ্যাত দূর্গের নাম এবং হি্ইয়ার সম্পৃক্ত জাতিকে প্রকাশ করে । এ আমলে মা'রিবকে জনশূন্য করে যাইদানে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এ শহরটি হিম্য়ার গোত্রের কেন্দ্র। পরবর্তী কালে এ শহরটি 'যাকার' নামে আখ্যায়িত হয়। বর্তমানে ইয়েমেন শহরের কাছে একটি গোলাকার পর্বতের ওপর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় এবং এর কাছাকাছি এলাকায় হিময়ার নামে একটি ক্ষুদ্রাকার উপজাতির বসতি রয়েছে। একে দেখে কোন জাতিই ধারণা করতে পারবে না যে, এটি এমন একটি জাতির স্মৃতিচিহ্ন একদিন যার ডংকা নিনাদ সমগ্র বিশ্বে গুঞ্জরিত হত। এ সময়ই রাজ্যের একটি অংশ হিসেবে ইয়ামনত ও ইয়ামনিয়াত শব্দটির ব্যবহার শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে আরবের দক্ষিণ কোণে অবস্থিত আসীর থেকে আদন (এডেন) এবং বাবুল আনদাব থেকে হাদরামাউত পর্যন্ত সমগ্র এলাকার নামে পরিণত হয়। এ সময়ই সাবা জাতির পতন শুরু হয়।

চারঃ ৩০০ খৃষ্টাব্দের পর হতে ইসলামের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত সময়। এটি ছিল সাবা জাতির ধ্বংসের সময়। এ সময় তাদের মধ্যে অনবরত যুদ্ধ চলতে থাকে। বাইরের জাতিসমূহের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। ব্যবসা বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। কৃষিব্যবস্থা বরবাদ হয়ে যায়। শেষে জাতীয় স্বাধীনতারও বিলোপ ঘটে। প্রথমে যাইদানী হিময়ারী ও হামদানীদের পারস্পরিক বিরোধ ও সংঘাতের সুযোগ করে ৩৪০ থেকে ৩৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইয়ামনে হাবশীদের রাজত্ব চলে। তারপর স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার হয় ঠিকই কিন্তু মা'রিবের বিখ্যাত বাঁধে ফাটল দেখা দিতে থাকে। এমনকি শেষ পর্যন্ত ৪৫০ বা ৪৫১ খৃষ্টাব্দে বাঁধ ভেঙ্গে পড়ে এবং এর পরে যে মহাপ্লাবন হয়। তাতে এ জনপদ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তা পুনরায় আর একত্রিত হতে পারে নি।

পানিসেচ ও কৃষির যে ব্যবস্থা যে একবার বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল তা আর পুনর্গঠন সম্ভবপর হয়নি। ৬২৩ খৃষ্টাব্দে ইয়ামনের ইহুদি বাদশাহ যু-নুওয়াস নাজরানে খৃষ্টানদের উপর যে জুলম-নিপীড়ন চালায় কুরআন মাজীদে "আসহাবুল উখদুদ" নামে তার উল্লেখ করা হয়েছে। এর ফলে হাবশার (আবিসিনিয়া বর্তমানে ইথিওপিয়া) খৃষ্টান শাসক ইয়ামনের উপর প্রতিশোধমূলক আক্রমন চালায় তিনি সমগ্রদেশ জয় করে নেন। এপর ইয়ামনের হাবশী গভর্ণর আবরাহা কাবা শরীফের কেন্দ্রীয় গুরুত্ব খতম করার এবং আরবের সমগ্র পশ্চিম এলাকাকে রোমান- হাবশী প্রভাবধীনে আনার জন্য ৫৭০ বা ৫৭১ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মদ (স.) জন্মের মাত্র কিছুদিন পূর্বে মক্কা মুয়ায্যমায় আক্রমন করে। এ অভিযানে তার সমগ্র সেনাদল যে ধ্বংসের সম্মূখীন হয়েছিল কুরআন মাজীদে আসহাবুল ফীল শিরোনামে তা উল্লেখিত হয়েছে। সর্বশেষ ৫৭৫ খ্রী. ইরানীরা ইয়ামন দখল করে ৬২৮ খ্রী. ইরানী গভর্ণর বাযান-এর ইসলাম গ্রহণের পর এ দখলদারিত্বের অবসান ঘটে। [২০]

২০। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৮

Dhaka University Institutional Repository

সাবা জাতির অগ্রগতি ও উন্নতির ভিত্তি

সাবা জাতির অগ্রগতি ও উন্নতি মূলত দুইটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এক কৃষি এবং দুই ব্যবসায়। [২১]

কৃষিতে তারা পানি সেচের একটি সর্বোত্তম ব্যবস্থার মাধ্যমে উন্নত করে। প্রাচীন যুগের ব্যবিলন ছাড়া আর কোথাও এর সমপযায়ের পানিসেচ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। সে দেশটি প্রাকৃতিক নদী সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল না। বর্ষাকালে পাহাড় থেকে পানির ঝরণা প্রবাহিত হতো। সারা দেশে এ ঝরণা গুলোতে বিভিন্ন স্থানে বাঁধ বেঁধে তারা কৃত্রিম হ্রদ তৈরী করত। তারপর এ হ্রদ গুলো থেকে খাল কেটে সারা দেশে এমনভাবে পানি সেচের ব্যবস্থা গড়ে তুলে ছিল যাকে কুরআন মজীদের বর্ণনা মতে "যেদিকেই তাকাও সেদিকেই কেবল বাগ-বাগিচা ও সবুজ শ্যামল গাছ-গাছালি দেখা যেত"। এ সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে সবচেয়ে বড় জলাধারটি মা'রিব নগরীর নিকটবর্তী বলক পাহাড়ের মধ্যস্থলের উপত্যকায় বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে গড়ে তোলা হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহ দৃষ্টি যখন তাদের উপর থেকে সরে গেলো, তখন পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ বিশাল বাঁধটি ভেঙ্গে গেল। এসময় এ থেকে বন্যা সৃষ্টি হলো তা পথের বাঁধ গুলো একের পর এক ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে এগিয়ে চললো, এমনকি শেষ পর্যন্ত দেশের সমগ্র পানি সেচ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেল। এরপর আর কোন ভাবেই এ ব্যবস্থা পূনর্বহাল করা গেল না। [২২]

ব্যবসার জন্য এ জাতিকে আল্লাহ সর্বোত্তম ভৌগলিক স্থান দান করেছিলেন। তারা এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। এক হাজারের বেশী সময় পর্যন্ত এ জাতিই পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ব্যবসায়ের সংযোগ স্থান দখল করে থাকে। এদিকে তাদের বন্দরে চীনের রেশম, ইন্দোনেশিয়া ও মালাবারের গরম মশলা, হিন্দুস্থানের কাপড় ও তালোয়ার, পূর্ব আফ্রিকার যংগী দাস, বানর, উট পাখির পালক ও হাতির দাঁত পৌঁছে যেত। অন্যদিকে তারা এ জিনিস গুলো মিসর ও সিরিয়ার বাজারে পৌঁছে দিত। সেখান থেকে এ গুলো গ্রীস ও রোমে চলে যেত। এ ছাড়াও তাদের নিজেদের এলাকায় উৎপন্ন হতো লোবান, চন্দনকাঠ, আম্বর, মিশ্‌ক, মুর কারফা, কাসরুখ, যারীরাহ, সালীখাহ ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্যাদি বিপুল পরিমাণে। মিসর, সিরিয়া, গ্রীস ও রোমের লোকেরা তা লুফে নিত।

দুটি বড় বড় পথে এ বিশ্বব্যাপি বানিজ্য চলতো । একটি ছিল সমুদ্রপথ ও অন্যটি স্থল পথ। হাজার বছর পর্যন্ত সমুদ্রপথে ব্যবসায় ছিল সাবায়ীদের দখলে। কারণ লোহিত সাগরের মৌসুমী বায়ু প্রবাহ ভূগর্ভস্থ পাহাড় ও নোঙ্গর করার স্থান গুলোর গোপন তথ্য একমাত্র তারাই জানতো। অন্য কোন জাতির এ ভয়াল সাগরে চলবার সাহসই ছিল না। এ সমুদ্র পথে তারা জর্দান ও মিসরের বন্দর সমূহে নিজেদের পণ্যদ্রব্য পৌঁছিয়ে দিত।

২১। ড. মাযহার উদ্দিন সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

২২। এনসাইক্লোপেডিয়া অব রিলিজিয়ন এন্ড এথিকস, এডিন বার্গ: খ. ১০, ১৯৫৬, পৃ.৯২৫

Dhaka University Institutional Repository

একদিকে স্থলপথে আদন (এডেন) ও হাদরামাউত থেকে মা'রিবে গিয়ে মিশতো এবং তারপর আবার সেখান থেকে একটি রাজপথ মক্কা, জেদ্দা, ইয়াসরিব, আলউলা, তাবুক ও আইলা হয়ে পেট্রা পর্যন্ত, এরপর একটি পথ মিশরের দিকে এবং অন্য পথটি সিরিয়ার দিকে যেত। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে এ স্থল পথে ইয়ামন থেকে সিরিয়া সীমান্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে সাবাদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং বানিজ্য কাফেলা দিনরাত এ পথে যাওয়া আসা করত। এ উপনিবেশগুলোর মধ্যে অনেক গুলোর ধ্বংসাবশেষ এ এলাকায় আজও রয়ে গেছে এবং সেখানে সাবায়ী ও হিময়ারী ভাষায় লিখিত শিলালিপি পাওয়া গেছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতকের কাছাকাছি সময়ে এ ব্যবসায়ে অধোগতি শুরু হয়। অতঃপর আস্তে আস্তে তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে বিপর্যস্ত জাতিতে পরিণত হয়। [২৩]

"সাবা" জাতির রাজত্বের বিস্তৃতি

সাবার রাজত্ব দক্ষিণ আরব 'ইয়ামানের ' পূর্বাংশ হ'তে আরম্ভ হয়। এর রাজধানী প্রথমে 'সারওয়াহ' ছিল পরে তা 'মা'রিবে' স্থানান্তরিত হয়। ক্রমে ক্রমে এ রাজত্ব উন্নত হয়ে রাজ্য জয় করার সাথে সাথে বাণিজ্যিক উপায়েও অত্যধিক সফলতা অর্জন করল। উত্তর আরব হতে আফ্রিকা পর্যন্ত এর সীমান্ত পরিধি বিস্তৃতি লাভ করল। যেমন হাব্‌শা রাজ্যের উযনিয়া জিলা উহারই আধিকৃত অঞ্চল সমূহের মধ্যে ছিল এবং সাবা রাজ্যের তরফ হতে 'মাগাফের' উপাধি ধারণ করে জনৈক সাবায়ী তথায় শাসনকার্য পরিচালনা করত। ইয়ামন হতে হেজাজের পথে শাম পর্যন্ত যেই প্রাচীন বাণিজ্যিক সড়ক ছিল এবং কুরআন মাজীদ সূরায়ে কুরাইশের মধ্যে رحلة الشتاء والصيف বলে যার উল্লেখ করেছে, অন্য এক স্থানে যাকে امام مبين বলেছে তাও সাবায়ীদের অধিকারে গিয়েছিল। শাম, ফিলিস্তিন ও মাদইয়ানের উপকণ্ঠেও তাদের অধিকৃত বহু অঞ্চল ছিল। এই রুপ খৃষ্টপূর্ব প্রায় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত 'মাঈন' বাসীদের উপর জয় লাভের পর সাবার রাজত্ব আরবের অযীমুশ্‌শান সুশৃঙ্খল জাতি ছিল। [২৪]

২৩। ড. মাযহার উদ্দিন সিদ্দিকী, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৭১

২৪। হিফজুর রহমান, খ.৪, পৃ. ৫২

Dhaka University Institutional Repository

'সাবা' বাসী এবং আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী

সাবাবাসীরা এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত তো এই দুনিয়ার বেহেশতকে আল্লাহর আযীমুশ্শান নিদর্শন ও নেয়ামতই মনে করত এবং ইসলামের গন্ডির মধ্যে থেকে আল্লাহর তা'আলার নির্দেশ পালন করাকে নিজেদের কতর্ব্য বলে বিশ্বাস করতে থাকল। কিন্তু ধন সম্পদ আমোদ-প্রমোদ এবং সর্বপ্রকারের নিয়ামত ক্রমে ক্রমে তাদের মধ্যে সেই চরিত্র ও স্বভাব পয়দা করে দিল। যা তাদের পূর্ববর্তী অহংকারী কাওমগুলোর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। আর তারা এ নাফরমানীতে এত উন্নত করতে থাকল যে, তারা সত্য ধর্মকেও ত্যাগ করল এবং কুফর ও শির্কের জীবনকে পুনরায় অবলম্বন করে লইল। তবুও ক্ষমাশীল প্রতিপালক তৎক্ষণাৎ পাকড়াও করলেন না বরং তাঁর ব্যাপক রহমতে অবকাশ প্রদান অনুযায়ী কাজ করল। তাঁর প্রেরিত নবী ও রাসূলগণ এসে তাদেরকে সত্য পথ শিখালেন এবং বললেন যে, এ সমস্ত নেয়ামতের এই অর্থ নহে যে, মহৎ রচিত সমূহ পরিত্যাগ করে শির্ক ও কুফর অবলম্বন করে আল্লাহ তা'আলার সহিত বিদ্রোহ ঘোষণা করে দাও। চিন্তা কর, অনুধাবন কর, যে, এই পথটি মন্দ এবং উহার পরিণাম নিকৃষ্ট।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন মুনাবেবহের বর্ণনায় বলেন, সেই সময়ে তাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার তেরজন নবী নুবয়তের দায়িত্ব পালন করতে আসেন, কিন্ত তারা মোটেই ভ্রুক্ষেপ করল না এবং নিজেদের সচ্ছল-সুখ-শান্তিময় জীবনকে স্থায়ী উত্তরাধিকারী মনে করে শির্ক ও ফুফরের মত্ততায় নিমগ্ন রইল। [২৫]

অবশেষে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হলো এবং তাদের পরিণতি ও তাই হলো যা পূর্বকালের সত্য খোদার নাফরমান কাওমগুলোর হয়েছিল। [২৬]

মা'আরিবের বাঁধ

মা'আরিবের বাঁধটি সাবা ইব্ন ইয়ারাব নির্মাণ করেছিল কিন্তু সে উহা পূর্ণ করতে পারে নাই, তারপর তার পুত্র হিম্ইয়ার উহার কাজ সমাধা করেছিল। [২৭]

কেউ কেউ বলেন, সাবার রানী "বিলকিস" এই বাঁধটি নির্মাণ করেছিল। কিন্তু এ দু'টি উক্তিই ধারণা ও অনুমান ভিক্তিক। কেননা, প্রত্নতত্ত্ব বিশেষজ্ঞগণ ধ্বংসাবশেষ হতে এই সন্ধান পেয়েছে যে, এই 'পানির বাঁধ' নির্মাণকারীদের নাম শিলালিপিতে খোদিত এই বাঁধেরই ভগ্ন প্রাচীরের উপর বিদ্যমান রয়েছে এবং উহা হতে প্রমাণিত হয় যে, এই বাঁধটি সর্বপ্রথম খৃষ্টপূর্ব ৮০০ সনে আমর ইব্ন সামআলী নিউফ (মাকারিবে সাবা) নির্মাণ করতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু তার আমলে কাজটি পূর্ণ হতে পারে নাই। অতঃপর তার পরবর্তী বাশাহগণ তা পূর্ণ করে। ছী'আমর ব্যতীত যে নামগুলো সেই শিলালিপিতে পাওয়া গিয়েছে, পড়তে পারা গিয়েছে তা হলো সামআলী নিউফ ইব্ন যামর আলী (মাকাবিরে সাবা) কারব আহলে ইব্ন ছী'আমর (মাকারিবে সাবা) যামর আলী দারহ (মালিকে সাবা), য়াদাঈলওতার। ইহা হতে বুঝা যায় এই বাঁধটি মাকারিবে সাবার বাদশাহদের প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত এক দীর্ঘকালে নির্মিত হয়েছে। [২৮]

২৫। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৬০

২৬। ইব্ন কাসীর, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৮০

২৭। তারীখে ইব্ন কাসীর প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ১৫৯

২৮। এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নাল, ১৮৭৪ ইং এর প্রবন্ধ হতে গৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

সাইলে আরেম

ফলতঃ আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর বিবিধ আযাব চাপিয়ে দিলেন, যার ফলে তার বেহেশতের বাগান গুলো বিনষ্ট হয়ে গেল এবং তৎসমুদয়ের স্থলে জংলী বরই কাঁটা বিশিষ্ট বৃক্ষ সমূহ এবং তিক্ত স্বাদ "পীলু" বৃক্ষ সমূহ উৎপন্ন হয়ে এই স্বাক্ষ্য প্রদাণ করতে এবং উপদেশের কাহিনী শুনাইতে লাগল যে, আল্লাহ তা'আলা অবিরত নাফরমানী এবং অবাধ্যতাচারণকারী কাওমগুলোর এরুপ ক্ষতিই হয়ে থাকে।[২৯]

'সাবা' বাসীর বিভিন্ন শাস্তি

বাঁধ নির্মাণের উপর সাবাবাসীদের সীমাহীন গর্ব ছিল। কারণ এ বাঁধ নির্মাণের ফলে রাজধানীর উভয় দিকে তিনশত বর্গমাইল পর্যন্ত সুন্দর ও মনোরম বাগান সমূহ এবং সরস সতেজ ও শস্য-শ্যামল এবং উহাদের উৎপন্ন ফল ও শস্য সমূহের দ্বারা ইয়ামান পুষ্পোদ্যানে পরিণত হয়েছিল। বাঁধটি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে ভেঙ্গে যায়, ফলে হঠাৎ উহার পানি ভীষণ প্লাবনে পরিণত হয়ে উপত্যকার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং মা'আবিব ও আশপাশের জান্নাততুল্য বাগান গুলো ডুবিয়ে বিনষ্ট করে ফেলে। আর যখন পানি ক্রমে ক্রমে শুস্ক হয়ে গেল। তখন সেই পূর্ণ এলাকায় জান্নাত তুল্য শস্য শ্যামল বাগান সমূহের স্থলে পাহাড় সমূহের উভয় পার্শ্ব হতে উপত্যকার উভয় দিকে ঝাউ গাছের ঝাড়, জংলী বরই গাছের ঝোঁপ এবং সেই পীলু বৃক্ষের সারি উৎপন্ন হয়। যার ফল বিস্বাদ ও তিক্ত হয়ে থাকে।

আল্লাহ তা'আলার এ আযাবকে সাবাবাসীদের কোন শক্তি এবং কোন প্রতিপত্তিই প্রতিরোধ করতে পারে নাই। বাঁধটি নির্মাণে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং জ্যামিতি শাস্ত্রে তারা যে, ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিয়েছিল, বাঁধটি পূণ:নির্মাণে সেরকম কোন বুৎপত্তির পরিচয় দিতে পারে নাই। ফলে নিজেদের পরিচ্ছন্ন শহর মা'আরিব ত্যাগ করা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় থাকল না। [৩০]

কোরআন মাজীদ উল্লেখিত উপদেশ মূলক ঘটনাটিকে বর্ণনা করে উপদেশগ্রাহী দৃষ্টি ও সজাগ অন্তরের মানুষকে এই সবক প্রদান করছে।

অতঃপর তারা (সাবার কাওমগুলো) সেই পয়গাম্বরগণের উপদেশ ও হেদায়াত হতে মুখ ফিরিয়ে নিল। অতঃপর অমি তাদের উপর বাঁধ ভাঙ্গা বন্যা পাঠিয়ে দিলাম এবং তাদের সেই দুটি বাগানের পরিবর্তে দুটি এমন বাগান লাগিয়ে দিলাম যা বিস্বাদযুক্ত ফলসমূহ ঝাউ গাছ এবং কিছু বরই গাছে ঝোপ ঝাড় ছিল ইহা আমি তাদের অকৃজ্ঞতা ও না শোকরকারীর শাস্তি প্রদান করলাম। বস্তুত আমি অকৃতজ্ঞ কাওমকেই শাস্তি প্রদান করে থাকি। [৩১]

বস্তুত ঃ মা'আবির বাঁধে ইঁদুর ঢুকে বাঁধের ভিত্তিমূল দূর্বল করে দেয়, ফলে বর্ষা মৌসুমে বাঁধটি ভেঙ্গে শত শত মাইল প্লাবিত করে ফেলে যার কারণে মা'আরিব ও উহার উভয় দিকে বহু মাইল রাজ্যের এক বিরাট অংশ বরবাদ ও বিধব্বস্ত হয়ে যায়।

২৯। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খন্ড-৪র্থ, পৃ. ৬১

৩০। হিফযুর রহমান, খন্ড-৪র্থ, পৃ. ৬১, সাবা ও সাইলে আরেম অধ্যায়।

৩১। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

Dhaka University Institutional Repository

এই কথাটি সুস্পষ্ট যে, "সাবা" নিজেদের গর্ব, অহংকার, বিলাসিতা, আলস্য অমনোযোগীতা, কুফর ও শির্কের উপর গোঁ ধরা এবং অবাধ্যচরণের কারণে বাঁধভাঙ্গা বন্যা (সাইলে আরেম) দ্বারা এমন ভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে যে, তাদের স্থাপত্যশিল্প অট্টালিকা ও ইমারত সমূহের দৃঢ়তা সাধনের অভিজ্ঞতা অকেজো এবং নিস্ফল হয়ে গেল। তারা নিজদেরকে আল্লাহ তা'আলার এ আযাব হতে রক্ষা করতে পারল না এবং আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে রইল। [৩২]

দ্বিতীয় শাস্তি ঃ

মা'আরিবের পানির বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে যখন মা'আরিব শহর এবং উহার উভয় দিকের অঞ্চল সমূহ, শস্য শ্যামল ক্ষেত সমূহ, সুগন্ধ দ্রব্যের বৃক্ষসমূহ, উত্তম ফল ফলাদি সমূহ এবং ফলের সতেজ বাগন সমূহ হ'তে বঞ্চিত হয়ে গেল , তখন সে সমস্ত বস্তির বাসিন্দাদের অধিকাংশ বিক্ষিপ্ত হয়ে কতক শাম, ইরাক, ও হেজাযের দিকে চলে গেল এবং কতক ইয়ামানের বাইরে অন্যান্য অঞ্চলে গিয়ে বসতি স্থাপন করল। বস্তুত কাওমে সাবা যখন আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের না শুকরিয়ার চরমে পৌঁছল তখন আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে দ্বিতীয় শাস্তি হিসেবে ইয়ামন হ'তে শাম দেশ পর্যন্ত তাদের সমস্ত বসতিকে জনমানব শূন্য করে দিলেন। যার কাছাকাছি ঘনঘন ছোট শহর, গ্রাম আরামদায়ক পান্থশালা এবং তেজারতি বাজারের আকারে বসতি আর তাদের শান্তি ও আরামের উপকরণ ছিল এবং সফরের সর্বপ্রকার দুঃখ কষ্ট হতে তাদেরকে রক্ষিত রাখত। আর এরুপে সে পূর্ণ এলাকার ধূলি উড়তে লাগল এবং ইয়ামান হতে শামদেশ পর্যন্ত আবাদ বস্তিসমূহের সারিগুলো অনাবাদ মানবশূন্য ধূ-ধূ প্রান্তরে রুপান্তরিত হয়ে গেল। [৩৩]

যেমন কুরআন মজীদে নিম্নের আয়াত গুলো দ্বারা এর বাস্তব চিত্রটি ফুটে উঠেছে।

"আমি তাদের ও তাদের যে জনবসতিগুলো সমৃদ্ধি দান করেছিলাম, সেগুলোর অন্তবর্তী স্থানে দৃশ্যমান জনপদ গঠন করেছিলাম এবং একটি আন্দাজ অনুযায়ী তাদের মধ্যকার ভ্রমণের দূরত্ব নির্ধারণ করেছিলাম।[৩৪] পরিভ্রমন কর এসব পথে রাত্রি দিন পূর্ণ নিরাপত্তা সহকারে। কিন্তু তারা বলল, হে আমাদের রব! আমাদের ভ্রমনের দূরত্ব দীর্ঘায়িত কর। তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করেছে। শেষ পর্যন্ত আমি তাদের কাহিনী বানিয়ে রেখে দিয়েছি এবং তাদেরকে একদম ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছি। নিশ্চিত এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে বেশী বেশী সবরকারী ও বেশী বেশী কৃতজ্ঞ প্রতিটি ব্যক্তির জন্য"। [৩৫]

৩২। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৬৭

৩৩। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ., পৃ,৬৮

৩৪। "সমৃদ্ধ জনপদ" বলতে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন বুঝানো হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরুপ দেখা যেতে পারে : আরাফ ১৩৭ আয়াত বণী ইসরাঈল ১ আয়াত এবং সূরা আম্বিয়া ৭১ ও ৮১ আয়াত।

৩৫। وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين .

. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور

আল-কুরআন, ৩৪ : ১৮-১৯

Dhaka University Institutional Repository

সাইলে আরমের ফলে সাবা কাওমের গোত্রগুলো মা'আরিব ও ইয়ামান হ'তে বসরা (সিরিয়া) চলে যায়। সাবার গোত্রগুলোর মধ্যে হতে গাস্সানী গোত্রগুলোর একটি শাখা অর্থাৎ খোযা ইয়াসরিবের উদ্দেশ্য বের হয়ে বীতনেসুর অথার্ৎ তেহমাকে শস্য-শ্যামল দেখে সেখানেই থেকে যায়। আর আওস ও খাযরাজ ইয়াসরিব গমন করে তথায় বসতি স্থাপন করে। আর বণী আয্দের একটি অংশ ওমানে ও অপর একটি সোরাত উপত্যকায় বসবাস শুরু করে। [৩৬]

'সাবা' জাতি এমনি বিছিন্ন হয়ে পড়ে কোন কাওম কিম্বা খান্দানের বিছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হওয়ার আলোচনা করা হলে বলা হয়। تفرقوا ايد السبا অর্থাৎ তাদের অবস্থা সাবার মতই হয়ে গিয়েছে। তারা খন্ড বিখন্ড হয়ে গিয়েছে।[৩৭]

৩৬। ইবন কাসীর, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৯১

৩৭। প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৫২০

Dhaka University Institutional Repository

আসহাবুল কাহফ ওয়ার রাক্বীম

কাহফ ও রাক্বীম পরিচিতি

"كهف " এর অর্থ বিস্তৃর্ণ পার্বত্য গুহা। আর غار বলতে বুঝায় সংকীর্ণ গর্তকে। উর্দূ ভাষায় অবশ্য "গার" ও 'কাহাফ' সমঅর্থবোধক।[১] رقيم বা রাক্বীম শাব্দিক অর্থ বা লিখিত বস্তু।[২] "রাকীম" শব্দের অর্থে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন সাহাবী ও তাবেয়ী হতে বর্ণিত হয়েছে "রাকীম" বলতে সেই জনবসতিকে বুঝানো হয়েছে যেখানে আলোচ্য ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল এ স্থানটি আয়লা (আকাবা) ও ফিলিস্তিনের মাঝখানে অবস্থিত ছিল। কোন কোন প্রাচীন তাফসীরকার বলেছেন "রাকীম" বলতে ঐ প্রস্তর লিপিকে বুঝায় যা এই গুহার মুখে গুহাবাসীদের স্মৃতিচিত্ত হিসেবে লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল।[৩]

"রেকম" অর্থ স্মারক লিপি।[৪]

অভিধানে পাহাড়ের অভ্যন্তরস্থ প্রশস্ত গুহাকে "কাহফ" বলে। অবশ্য "রাকীম" শব্দ সম্বন্ধে মুফাস্সীরবিদগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। যাহ্হাক ও সূদ্দী তারা উভয়ই প্রত্যেক তাফসীরী রেওয়াতকে আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাসের প্রতি সম্পর্কিত করে থাকেন। এখানেও তারা ইবন আব্বাসের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। (১) 'রাক্বীম' শব্দটি রক্বম শব্দ হতে গৃহীত এবং রাক্বীম কর্তৃবাচক শব্দটি মারকুম কর্মবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অথার্ৎ লিখিত। যেহেতু তৎকালীন বাদশাহ তাঁদের সন্ধান লাভের পর তাদের নাম একটি শিলাখন্ডে খোদিত করে দিয়েছিলেন। এই কারণে তাদেরকে আসহাবুর রাক্বীম (শিলালিপিওয়ালা) বলা হয়ে থাকে। (২) ইহা সে উপত্যকার নাম যেখানকার পাহাড়ে এই গুহাটি অবস্থিত ছিল। কাতাদা 'আতিয়া আওফী এবং মুজাহিদ এই মতটি পোষণ করেন। (৩) "রাকীম" সেই পাহাড়ের নাম যাতে গুহাটি ছিল। (৪) হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস হতে কাবে আহবার ও ওহাব ইবন মুনাব্বেহ এর রেওয়াতে বর্ণিত আছে যে, "রাকীম" আইলা অথার্ৎ আকাবার সন্নিকটে একটি শহরের নাম। ইহা রোম দেশে অবস্থিত।[৫]

১। মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.), প্রাগুক্ত, সূরা কাহফ এর টীকা, পৃ. ৭৯৭

২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯৭

৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯৮

৪। ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, খ.১৭, ১৯৪৬, পৃ. ৬৫৮

৫। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত খ. ৪, পৃ.৬

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাস ও প্রত্মতত্ত্বানুসন্ধানের পরিপ্রেক্ষিতে এই শেষোক্ত উক্তিটিই সঠিক এবং কুরআন মাজীদের বর্ণনার অনুরুপ। আর বাকী অন্যান্য উক্তিগুলোর ভিত্তি নিছক ধারণা ও অনুমানের উপর নির্ভরশীল।[৬] গুহার নাম "হায়যুম"। "রাক্বীম" হলো সেই পর্বতের নাম। ইব্ন 'আব্বাস বলেন, সেই পর্বতের নাম মিনাজলুস। কুকুরের নাম "হায়রান"। গুহাটি উত্তর দক্ষিণ মূখী ও পশ্চিম দিকে ঢালু।[৭]

কাহ্ফ ও রাক্বীমের অবস্থান

আসহাবে কাহফের ঘটনাটি হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রেরিত হওয়ার কিছু কাল পরবর্তী সময়ের ঘটনা। "আনবাত" এর সহিত সংশ্লিষ্ট। এই " আনবাত" কারা তাদের আবাস্থল ও দেশ কোথায় ? ইহাই সেই সমস্যা যার সমাধান হয়ে গেলে প্রকৃত তথ্যটি উৎঘাঠিত হতে পারে। [৮] "নাবত" কিম্বা "নাবেত" থেকে আনবাত। "নাবেত" বা নাবত হলো হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর। কেননা, হযরত ইসামঈল (আ.)-এর বারজন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ্য পুত্রের নাম ছিল 'নাবেত' কিম্বা 'নাবত'। যেমন ইব্ন কাসীর তার ইতিহাস গ্রন্থে 'নাবেত' নাবত সম্পর্কে লিখেছেনঃ

ثم جيع عرب الحجاز اختلاف قبائلهم يرجون فى انسابهم الى ولديه نابت وكان الرئيس بعده والقائم بامور الحاكم فى مكة والناظر فى امور البيت وزمزم نابت بن اسمائيل وموافت الجرخمين ثم تهلب جر هم على بيت طمعا فى بنى اختهم فحكموا بمكة وما ولاها عوضا عن بنى اسماعيل مدة طويطة فكان اول من صار اليه امر البيت بعد نابت مضاض بن عمرو بن سعد بن الرقيب بن عبير بن نابت اما النبط فكل من لم يكن راعيا او جنديا عند العرب من الساكن الارضين ۔[৯]

নাবতিদের শাসন কাল খৃষ্টপূর্ব ৭০০ হতে আরম্ব করে ১০৬ খৃষ্টাব্দে পর্যন্ত শেষ হয়। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর প্রথম দিকেই রোমীয়রা তাদের উপর আক্রমন করে তাদেরকে পরাজিত করে এবং "রাকীম" ও তার পূর্ণ এলাকা দখল করে নেয়। রোমীয়রা রাকীম অধিকার করে লওয়ার পর ইহাকে নিজেদের শাসন ও সামাজিক উন্নতির কেন্দ্রস্থল করে নিয়ে তারা এর নাম পরিবর্তন করে পেট্রা রাখেন। ইহাই সেই রাকীম কুরআনে মাজীদে "আসহাবে কাহফ" এর ঘটনায় যার উল্লেখ রয়েছে।

৬। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.৬

৭। ইবন কাসীর, প্রাগুক্ত, খন্ড. ৪, পৃ. ১৩

৮। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ.৬

৯। ইবন কাসীর, প্রাগুক্ত, খ. ২য়, পৃ. ২৩৬

Dhaka University Institutional Repository

ام حسبتم ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا ـ

আর ইহাই সেই শহর যেখানকার কতিপয় সৌভাগ্যবান লোক মূর্তিপুজা হতে পলায়ন পূর্বক মূর্তিপূজক শাসকদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন হতে রক্ষিত থাকার উদ্দেশ্য এই শহরেই পর্বত সমূহের একটি গুহায় আত্মগোপন করেছিল। অতএব, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসের উক্তি "রাকীম" আইলার নিকটবর্তী একটি শহর ছিল আর উহা রোমের এলাকাধীন ছিল। সম্পূর্ণ সঠিক এবং কোরআন মাজীদের ও ইতিহাসের হুবহু (অবিকল) অনুরুপ। নিঃসন্দেহে "রাক্বীম" শহরটি আইলা উপসাগরের নিকটে অবস্থিত ছিল। সুতরাং উহাকে রোমীয়দের এলাকাভূক্ত গণ্য করা সম্পূর্ণ সঠিক।[১০]

বিগত বিশ্বযুদ্ধের পর প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান-এর মাধ্যমে আরো নতুন নতুন আবিস্কার হয়েছে। তন্মধ্যে এই "রাকীম" (পেট্রো বা বেত্রা) শহরটির আবিস্কারই সর্বপ্রথম। এর সম্বন্ধে যতটুকু প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধান চলতেছে যার দ্বারা অক্ষরে অক্ষরে কুরআন মাজীদের সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

আইলা (আকাবা) উপসাগর হতে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে পর্বত সমুহের দু'টি সমান্তরাল সারি পাওয়া যায়, এদেরই মধ্য হতে একটি পর্বতের চূড়ার উপর নাবতীদের রাজধানী "রাকীম" আবাদ ছিল।[১১]

আসহাবে কাহফের ঘটনাটি ঘটেছিল এফসুস (Eplesws) নগরীতে। খৃষ্টপূর্ব প্রায় এগারো শতাব্দীতে এই নগরীটির পত্তন হয়। পরবর্তীকালে ইহা একটি মূর্তিপূজার বিরাট কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানকার লোকেরা ডায়না (Diana) নামে চাঁদ বিবির পুঁজা করত।[১২]

সমসাময়িক শাসক

যে বাদশাহের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে এই লোকগুলো জনপদ হতে পলায়ন করে গুহার ভিতর আশ্রয় নিয়েছিল, আমাদের মোফাস্সীরগণ তার নাম উল্লেখ করেছে 'দাকন ইয়ানুস' বা "দাকিয়ানুস" আর গীবন বলেন, সে ছিল কায়সার ডেসিয়াস, সে ২৪৯ হতে ২৫১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রোমান সাম্রাজ্য শাসন করেছে। এই সময় ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদের উপর অত্যাচার যুলুম ও নিষ্পেষণ করার দিক দিয়ে সে খুবই কুখ্যাতি লাভ করে। যে শহরে এ ঘটনাটি সংঘটিত হয় তাফসীরকারকগণ তাঁর নাম বলেছেন "আফসুস" আর গীবন ইহার নাম লেখেছেন 'এসেসুস' এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকুলে এটা ছিল রোমানদের সর্বাপেক্ষা বড় শহর ও প্রসিদ্ধ বানিজ্য কেন্দ্র।

১০। সুলাইমান নদভী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৯-১০

১১। প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬১

১২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান তুরস্কের মার্না বা ইজমির নামক শহর হতে ২০ হতে ২৫ মাইল দক্ষিণে এর ধ্বংসাবশেষ এখানো দেখতে পাওয়া যায়। পরে যে বাদশাহর শাসনকালে এরা জাগ্রত হয়েছিল তাঁর নাম "তেযোসীস"। আর গীবন বলেন, তাদের পুনর্জাগরণের ঘটনাটি সংঘটিত হয় দ্বিতীয় কাইসার "থিওড়োসিস" এর শাসনকালে। রোমান সাম্রাজ্যের খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করার পর ৪০৮ হতে ৪৫০ সন পর্যন্ত তার শাসনকাল অব্যাহত থাকে। ইহার সারকথা এই যে, কাইসার "ডিসায়াস" এর শাসন আমলে যখন হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদের অমানুষিক অত্যাচার ও জুলুম চলতেছিল, তখন এ সাতজন তরুণ এক গুহার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে । পরে কাইসার "থিওডোসিস" এর রাজ্যত্বের আটত্রিশ বৎসর (অথার্ৎ প্রায় ৪৪৫ বা ৪৪৬ খৃষ্টাব্দে) এই লোকেরা জাগ্রত হয়ে উঠে। তখন সমগ্র সাম্রাজ্য হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারী হয়ে গিয়েছিল। এই হিসেবে তাদের গুহায় বসবাসের মেয়াদ দাড়াঁয় প্রায় ১৯৬ বৎসর। [১৩]

ঘটনা

হযরত ঈসা (আ.)-এর পর যখন তাঁর দাওয়াত রোম সাম্রাজ্যে পৌঁছতে শুরু করছিল তখন এই শহরের কয়েকজন যুবক শির্ক হতে তাওবা করে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল। খৃষ্টীয় বর্ণনাবলী একত্র করলে তাদের ঘটনার যে বিস্তারিত বিবরণ গ্রেগরী অব টুরস (Gregory of tour) তার গ্রন্থ (Merace lorum Liber) বর্ণনা করেছেন তার সংক্ষিপ্তসার নিম্নরুপ ঃ

"তারা ছিলেন সাতজন যুবক। তাদের ধর্মান্তরের কথা শুনে কাইজার ডিসিয়াস তাদের রাজদরবারে ডেকে পাঠান। তাঁদের জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের ধর্ম কি ? তাঁরা জানতেন কাইজার ঈসার অনুসারীদের রক্তের পিপাসু। কিন্তু তারা কোন প্রকার শংকা না করে পরিস্কার বলে দিলেন আমাদের রব তিনিই যিনি যমিন আসমানের রব। তিনি ছাড়া কোন মাবুদকে আমরা ডাকি না। যদি আমরা এটা করি তাহলে অনেক বড় গুনা করব। কাইজার ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তোমাদের মুখ বন্ধ কর, নয়তো আমি এখনই তোমাদের হত্যা করার ব্যবস্থা করব। অতঃপর কিছুক্ষণ থেমে বললেন, তোমরা এখনো শিশু, তাই তোমাদের তিনদিন সময় দিলাম। ইতিমধ্যে যদি তোমরা নিজেদের মত বদলিয়ে ফেলো এবং জাতির ধর্মের দিকে ফিরে এসো তাহলে তো ভাল, তা না হলে তোমাদের শিরচ্ছেদ করা হবে"।

"এই তিনদিন অবকাশের সুযোগে এই সাতজন যুবক শহর ত্যাগ করেন। তারা কোন গুহায় লুকাইবার জন্য পাহাড়ের পথ ধরেন। পথে একটি কুকুর তাদের সাথে চলতে থাকে। তারা কুকুরটিকে তাদের পিছু নেয়া হতে বিরত রাখার জন্য বহু চেষ্টা করেন কিন্তু সে কিছুতেই তাদের সঙ্গ ত্যাগ করতে রাজী হয়নি। শেষে একটি বড় গভীর গুহাকে ভাল আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নিয়ে তারা তার মধ্যে লুকিয়ে পড়েন। কুকুরটি গুহার মুখে বসে পড়ে। দারুন ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত থাকার কারণে তারা সবাই সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েন। ইহা ২৫০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।

১৩। হিফজুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৭০

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭ বছর পর ৪৪৬ খৃষ্টাব্দে তারা হঠাৎ জেগে উঠে। তখন ছিল কাইজার দ্বিতীয় থিয়োডোসিসের শাসন আমল। রোম সাম্রাজ্য তখন ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং এফসূস শহরের লোকেরাও মূর্তি পুঁজা ত্যাগ করেছিল"। "ইহা ছিল এমন এক সময় যখন রোমান সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে মৃত্যু পরের জীবন এবং কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে জামায়েত ও হিসাব নিকাশ হওয়া সম্পর্কে প্রচন্ড মতবিরোধ চলছিল। আখিরাতের অস্বীকারের ধারণা লোকদের মন হতে কিভাবে দূর করা যায় কাইজার নিজেও বেশ চিন্তিত ছিলেন। একদিন তিনি আল্লাহর কাছে দো'আ করেন, যেন তিনি এমন কোন নিদর্শন দেখিয়ে দেন যার মাধ্যমে লোকেরা আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। ঘটনক্রমে ঠিক এই সময়েই যুবকেরা ঘুম থেকে জেগে উঠেন। [১৪]

জেগে উঠেই তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেসা করেন, আমরা কতক্ষন ঘুমিয়েছি ? কেহ বললেন একদিন। কেহ বললেন একদিনের কিছু অংশ। অতঃপর আবার এই কথা বলে নীরব হয়ে যান যে এই ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন। অতঃপর জীন (Jean) নামের নিজেদের একজন সহযোগীকে রুপার কয়েকটি মুদ্রা দিয়ে খাবার আনার জন্য শহরে পাঠান। লোকেরা যাতে চিনতে না পারে এই জন্য তাকে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেন। তারা ভয় করছিলেন লোকেরা আমাদের ঠিকানা জানতে পারলে আমাদের ধরে নিয়ে যাবে এবং 'ডায়নার' পূঁজা করার জন্য বাধ্য করবে। কিন্তু জীন শহরে পৌঁছে সবকিছু বদলিয়ে গিয়েছে দেখে অবাক হয়ে যান। তিনি দেখেন সবাই ঈসায়ী হয়ে গিয়েছে এবং ডায়না দেবীর পুজা কেহ করছে না। একটি দোকান থেকে তিনি কিছু রুটি কিনেন এবং দোকানদারকে একটি রুপার মুদ্রা দিলেন। এই মুদ্রার গায়ে কাইজার ডিসিয়াসের ছবি ছাপানো ছিল। দোকানদার এ মুদ্রা দেখে অবাক হয়ে যায় সে জিজ্ঞেস করলো, এই মুদ্রা কোথায় পেলে ? ইহা আমার নিজের মুদ্রা, অন্য কোথাও হতে নিয়ে আসিনি।

এই নিয়ে দু'জনের মধ্যে কাথা কাটাকাটি হয়। লোকদের ভীর জমে উঠে। এমনকি বিষয়টি নগর কোতোয়ালের কাছে পোঁছে যায়। এই গুপ্ত ধন যেখান থেকে নিয়ে এসেছ, সেই জায়গাটি কোথায় আমাকে বল। জীন বললেন কিসের গুপ্তধন, ইহা আমার নিজের মুদ্রা। কোন গুপ্ত ধনের কথা আমার জানা নেই। কোতোয়াল বললেন তোমার কথা মেনে নেয়া যায় না। কারণ তুমি যে মুদ্রা নিয়ে এসেছো ইহাতো কয়েকশত বছরের পুরানো। তুমি সবেমাত্র যুবক, আমাদের বুড়োরাও এ মুদ্রা দেখেনি। নিশ্চয় ইহার মধ্যে কোন রহস্য আছে। 'জীন' যখন শুনেন ডিসিয়াস মারা গিয়েছে বহু বৎসর আগে। তখন তিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত তিনি কোন কথাই বলতে পারেননি। অতঃপর আস্তে আস্তে বলেন, এই তো মাত্র কালই আমি ও আমার ছয়জন সাথী এই শহর হতে পালিয়ে গিয়েছিলাম এবং ডিসিয়াসের জুলুম হতে আত্মরক্ষার জন্য একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। জীনের এ কথা শুনে কোতোয়ালও অবাক হয়ে যান। তিনি তাকে যেখানে তারা লুকিয়ে ছিল সেখানে নিয়ে যান। বিপুল সংখ্যক জনতাও তাদের সঙ্গী হয়ে যায়। তারা যে যথার্থই কাইজার ডিসিয়াসের 'আমলের লোক সেখানে পৌঁছে এই ব্যাপারটি পুরোপুরি প্রমাণিত হয়ে যায়। এ ঘটনার খবর দ্বিতীয় কাইজার দ্বিতীয় মিয়োডিয়াসের কাছেও পাঠানো হয়।

১৪। হিফজুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৭১

Dhaka University Institutional Repository

তিনি নিজে এসে তাদের সাথে দেখা করেন এবং তাদের হতে বরকত গ্রহণ করেন। অতঃপর তারা সাতজন গুহার মধ্য গিয়ে সটান শুয়ে পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের মৃত্যু ঘটে। এই সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখে লোকেরা যথার্থই মৃত্যুর পর জীবন আছে বলে বিশ্বাস করে। এই ঘটনার পর কাইজারের নির্দেশে গুহায় একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। [১৫]

১৫। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৭১-১৭২

Dhaka University Institutional Repository

আসহাবুল কারইয়াহ (اصحاب القرية)

আসহাবুল কারইয়াহ পরিচিতি

কুরআন পাক এ জনপদের নাম উল্লেখ করেনি শুধুমাত্র সূরা ইয়াসীনে اصحاب القرية নামে এ জনপদের বর্ণনা দৃষ্টান্ত হিসেবে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিয়েছে। ঐতিহাসিক বর্ণনায় মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন আব্বাস (রা.)কাবে আহবার, ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বেহ প্রমুখের উদ্ধৃতিক্রমে জনপদের নাম "ইন্তাকিয়া" উল্লেখ করেছে। মুজামুল বুলদানের বর্ণনা অনুযায়ী "ইন্তাকিয়া" শাম বর্তমান সিরিয়ার একটি প্রাচীন নগরী।[১]

এ শহরটি সমৃদ্ধি ও স্থাপত্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এ নগরী দূর্গ ও নগর প্রচীন দর্শনীয় বস্তু ছিল। এতে খৃষ্টানদের স্বর্ণ রোপ্যের কারুকার্য খচিত সুশোভিত গির্জা অবস্থিত ছিল। এটি একটি উপকূলীয় নগরী।[২] ইসলামী সাম্রাজ্যের বিজয়াভিযানে আবু ওবায়দাহ ইব্ন জাররাহ (রা.) এ শহর জয় করেছিলেন।[৩] হাবীব নাজ্জারের সমাধি এ শহরেই অবস্থিত ।[৪]

"ইন্তাকিয়া" সালুতি পরিবারে (Seleucid dynesty) ১৩ জন বাদশাহ এনটিউচাস (Antiouchus) নামে রাজ্য শাসন করেছিল। এ নামের শেষ শাসকের শাসন এবং সে সাথে গোটা পরিবারের শাসনকাল খৃষ্টপূর্ব ৬৫ সালে শেষ হয়ে গিয়েছিল। ঈসা (আ.)-এর যুগে ইন্তে-কিয়া সহ সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের সমগ্র এলাকা রোমানদের শাসনাধীনে ছিল।[৫]

হযরত ঈসা (আ.) নিজেই তাঁর সহচরদেরকে ইসলাম প্রচারের জন্য ইন্তাকিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। এর অধিবাসীরা রাসুলদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তার ফলে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর আযাবের শিকার হয়েছিল।[৬]

১। মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ), প্রাগুক্ত, সুরা ইয়াসীন তাফসীর টীকা, পৃ. ১১২৯

২। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২৯

৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩০

৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩০

৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩১

৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩২

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনা ও শেষ পরিণতি

"এন্তাকিয়া" শাম বা সিরিয়ার একটি বিখ্যাত শহর। শহরের অধিবাসীরা স্বহস্তে নির্মিত মূর্তির পুঁজা করত। তাদের হেদায়াতের জন্য ঈসা (আ.) হাওয়ারী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। অতঃপর তিনি পর্যায়ক্রমে তিনজন তথা সাদিক, সুদুক ও শালুম মতান্তরে শাম'উনকে পাঠান। কুরআনে তাদেরকে রাসূল বলা হয়েছে। সর্ব প্রথম সাদিক ও সুদুককে পাঠানো হয়। তাঁরা প্রথমে শহরের শেষ সীমায় হাবীব ইব্ন ইসমাইল (যিনি নাজ্জার নামে প্রসিদ্ধ) কে মূর্তি পুঁজা ত্যাগ করে আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদতে আহবান জানান। সে ছিল কুষ্ঠ রোগী। সে তার রোগ মুক্তির জন্য মূর্তির কাছে প্রার্থনা জানায়। এভাবে তিনি সত্তর বছর পার করে দেন। কিন্তু তার রোগ ভাল হল না। তারা তাকে বলল যে, সে যে সকল প্রতীমার পূঁজা করছে এদের কিছু করার নেই এরা নিছক পদার্থ। বরং প্রকৃত ক্ষমতা আল্লাহর হাতে তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি যা চান করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই এবাদত পাওয়ার যোগ্য। আর তারা আল্লাহর প্রেরিত নবীর প্রতিনিধি হিসেবে এ শহরে এসেছেন যাতে শহরবাসীকে প্রতীমার পুজা হতে নিবৃত করে আল্লাহ পাকের অনুগত বান্দায় পরিণত করা যায়।

তাদের কথা শুনে হাবীব নাজ্জার জিজ্ঞেস করল, আপনারা যে দাবী করছেন তার সত্যতার উপর কোন প্রমাণ আছে কি ? তারা বলল হ্যাঁ। হাবীব বলল, আমি আজ থেকে সত্তর বছর ধরে এ রোগে কষ্ঠ পাচ্ছি। আপনারা কি আমার এ মারাত্মক রোগ ভাল করতে সক্ষম ? তারা বলল হ্যাঁ, আমরা আমাদের রবের কাছে এ সম্পর্কে প্রার্থণা করব। তিনিই তোমাকে সুস্থ করে দিবেন। হাবীব নাজ্জার বলল খুবই আশ্চর্যের কথা! আজ সত্তর বছর ধরে আমার প্রভূর কাছে রোগ মুক্তির জন্য প্রার্থণা করে আসছি। কিন্তু কোন ফল দেখিনি। আর আপনাদের মাবুদ মাত্র একদিনের মধ্যে কিভাবে এই মরণব্যধি দূর করে আমাকে সুস্থ করে দিবেন ? তারা বলল আমাদের প্রভূ পারেন না, এমন কোন কঠিন কাজই নেই । তোমরা যে সব বস্তুকে তোমাদের প্রভূ বলে মেনে নিয়েছ, এদের তো কোন ক্ষমতাই নেই। এরা তোমাদের হাতের তৈরী, এরা না কোন কারো ক্ষতি করতে পারে, আর না কোন কারো উপকার করতে পারে। সত্তর বছর কেন, সত্তর হাজার বছর দো'আ করলে এদের কিছুই করার নেই। হাবীব নাজ্জার তাদের কথা শুনে আল্লাহর উপর ঈমান আনল তারা তার রোগ মুক্তির জন্য প্রার্থণা করলেন আল্লাহ পাক তাদের প্রার্থণা কুবল করলেন। সে রোগ থেকে মুক্তি পেল। এমনকি তার দেহে রোগের কোন চিহ্নই রইল না। এতে তাঁর ঈমান আরো সুদৃঢ় হলো। অতঃপর সে তাদের সাথে ওয়াদা করল যে, সে তার সারা দিনের উপার্জিত অর্থের অর্ধাংশ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবে।

হাবীব নাজ্জার ও তার পুত্র উভয়ে ঈমান আনল। অতঃপর তারা শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। ধীরে ধীরে তাদের কথা সমস্ত শহরে ছড়িয়ে পড়ল। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত হতে অসুস্থ লোকেরা তাদের কাছে ভীর করা শুরু করল। আল্লাহর মেহেরবানীতে তারা সকলেই রোগমুক্ত হলো। এন্তাকিয়া শহরের বাদশাহর নাম ছিল এনতিখাস। তাদের কথা ধীরে ধীরে বাদশাহর নিকট

Dhaka University Institutional Repository

পৌছল, বাদশাহ তাদের রাজদরবারে ডেকে আনল। তারা দরবারে উপনিত হলে বাদশাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করল। তোমরা কে ? কোথা হতে তোমাদের আগমন ? তারা বলল, আমরা ঈসা (আ.) এর দূত। তিনি আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। বাদশাহ জিজ্ঞেস করল, কেন এসেছ ? জাবাবে তারা বললেন, হে বাদশাহ! আপনারা এমন বস্তুর 'ইবাদত করছেন, যারা না দেখার, না শ্রবন করার কোন শক্তি রাখে। আর এমন প্রভুর 'ইবাদত পরিত্যাগ করছেন, যিনি সবকিছু দেখেন আর এমন মহান সত্তা আল্লাহর দিকে আহবান করার জন্য আমরা এখানে আগমন করেছি। বাদশাহ বলল, তাহলে কি আমাদের মা'বুদ ছাড়াও তোমার জন্য মা'বুদ রয়েছে। তারা বলল, হ্যাঁ, যিনি আমাদের মা'বুদ তিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। আর আপনারা যার ইবাদত করেন তাদেরকেও সৃষ্টি করেছেন। বাদশাহ বলল ঠিক আছে তোমরা অপেক্ষা কর । আমি তোমাদের জন্য চিন্তা করে দেখি। অতঃপর বাদশাহ যা বলল, তার বিপরীত করল। সে তাদেরকে বন্দী করে প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত করল। ঈসা (আ.) তাদের কায়েদের খবর পেয়ে তাদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য শাম'উনকে পাঠালেন।[৭]

আল-কুরআনে এরশাহ হচ্ছে

"আপনি কাফিরদের সামনে এক জনপদের কাহিনী বর্ণনা করুন। যখন এ জনপদে প্রেরিত লোকজন এসেছিল। যখন এ জনপদ বাসীরে জন্য দু'ব্যক্তিকে পাঠাই, তারা তাদের উভয়কে মিথ্যুক বলেছিল। অতঃপর আমি তৃতীয় জনকে পাঠিয়ে তাদের সহায়তা করি"।[৮]

শাম'উন আগেই টের, পেয়ে সরাসরি দাওয়াতের কাজ পরিহার করেন। তিনি কৌশলে তাদেরকে বাগে আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। তিনি একজন অপরিচিত লোক হিসেবে শহরে প্রবেশ করেন এবং রাজ প্রসাদের সন্নিকটে গৃহ নির্মাণ করে বসবাস করা শুরু করেন। তিনি কথা বার্তায় আচার আচরণে শহরবাসীর কাছে একটি উদাহরণ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তার কথা ধীরে ধীরে বাদশাহ-এর কানে প্রবশ করল। বাদশাহ তাঁকে তার দরবারে ডেকে আনলেন। সে দরবারে উপস্থিত হলে বাদশাহ তার সাথে সদ্ব্যব্যবহার এবং তাকে সম্মান প্রদর্শন করল। যখন বাদশাহের সাথে তার ঘনিষ্টতা দৃঢ় হলো তখন একদিন বাদশাহকে জিজ্ঞেস করলেন আমি জানতে পেরেছি আপনি দু'জন লোককে কায়েদ করে রেখেছেন। আর আপনাকে তারা আপনার দ্বীন পরিত্যাগ করতে বললে আপনি তাকে মারধরের নির্দেশ দিয়েছিলেন ? তাদের আলোচনা আস্তেই বাদশাহ রাগান্বিত হয়ে গেল। শামা'উন অতি নম্র স্বরে বলল, জাঁহাপনার অনুমতি হলে আমি তাদেরকে ডেকে এনে তাদের মতামতের ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করে দেখতে পারি। তদুপরি তাদের বক্তব্য সম্পর্ক আমারও একটি ধারণা হয়ে যাবে।

৭। তাহের সুরাটী (ভারত), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬-২৮৭

৮। إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ . قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ .

আল-কুরআন, ৩৬ : ১৩-১৪

Dhaka University Institutional Repository

শাম'উনের উপর বাদশাহর সুদৃঢ় আস্থা থাকায় শাম'উনের কথায় সম্মতি জানালে তাদের সাথে আলাপ আলোচনার জন্য শামউনকে অনুমতি প্রদান করল। শাম'উন তাদেরকে কয়েদখানা থেকে রাজদরবারে হাযির করে জিজ্ঞেস করলেন। তোমাদেরকে এখানে কে পাঠিয়েছেন? তাঁরা বলে দিলেন বিশ্ব নিখিলের মহান স্রষ্টা আল্লাহ পাঠিয়েছেন। তিনি এক, একক তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি এমন এক সত্তা যে, তিনি যা চান তাই করতে পারেন। তিনি সর্ব শক্তিমান। তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নে কেহই বাধার সৃষ্টি করতে পারেন না।

শাম'উন বলেন, তোমাদের প্রেরিত হওয়ার ওপর তোমাদের কাছে কোন নিদর্শন আছে কি ? তারা বলেন, আপনারা যাই চাবেন আজ তাই করে দেখাতে পারব। এখন বাদশাহ তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য একটি অন্ধ ছেলেকে সামনে উপস্থিত করার নির্দেশ দিল। বাদশাহ বল্ল তোমরা এ বালকের চক্ষুকে ভাল করে দাও।

বাদশাহ্ আরো বললো, তোমারা এর চক্ষু ভাল করতে পারলে বুঝব যে, তোমরা সত্য। তাঁরা আল্লাহ পাকের কাছে ছেলের চক্ষু ভাল করে দেয়ার দো'আ করতে লাগলেন। এমতাবস্থায় বালকের চক্ষু খুলে গেল। তখন তারা সামান্য মাটি হাতে তুলে তার চক্ষুদ্বয় মুছে দিলেন। ফলে সে সবকিছু দেখতে লাগল। বাদশাহ এটা দেখে অবাক হয়ে রইল। শাম'উন বাদশাহকে বলেন আপনি আপনার রবের কাছে দো'আ করলে তো আপনার রবও তাকে ভাল করে দিত। ফলে আপনার ও আপনার রবের সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ হত। বাদশাহ বলল আমি তো আপনার কাছে কোন কথা গোপন করি না। আমি যদি আমার মা'বুদের কাছে দো'আ করতাম তবে কোন লাভ হত না। কেননা, আমি যার 'ইবাদত করি তা জড় পদার্থ। এরা না কখনো শুনতে পায়। আর না এরা দেখার কোন ক্ষমতা রাখে। এরা না কারো উপকার করতে পারে, আর না অপকার।

শামউন দেখলো যে, বাদশাহর মন অনেকটাই নরম হয়ে আসছে এবং কায়েদীদের সম্পর্কে নমনীয় ভাব প্রকাশ করছে। কিন্তু এখনো তাদের উপর ঈমান আনতে রাজী নয়। শামউন সর্বদাই বাদশাহের সাথে এমন আচরণ করতেন যাতে বাদশাহ শাম'উনকে অন্য দ্বীনের অনুসারী ভাবতে না পারে। এমনকি বাদশাহের উপাস্যের সম্মুখে গিয়ে দো'আ করতেন, কান্নাকাটি করতেন অতি কৌশলে। তাই ঈমান গ্রহণের জন্য বাদশাহর উপর কোন চাপ প্রয়োগ না করে তার সামনে দ্বিতীয় নিদর্শন উপস্থাপনের পরিকল্পনা করছিলেন। তাই শাম'উন তাদের উদ্দেশ্য বলেন, তোমাদের রব কি মৃত্যু ব্যক্তিকে জীবিত করতে পারেন ? তাঁরা বলেন, আমাদের রব সবকিছু করার ক্ষমতা রাখেন। শাম'উন বলেন, আমাদের এখানে একজন মৃত্যু ব্যক্তি আছে। সাত দিন পূর্বে মারা গিয়েছে। তার পিতার অনুপস্থিতির কারণে আমরা তাকে দাফন করছি না। তার পিতা ফিরে এলে দাফন করব। তোমার রব তাকে পুনর্জীবন দান করতে পারবেন কি ? তারা বলেন, আমাদের রব তাকে পুনরায় জীবিত করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। এ বলে তারা মৃত্যু ব্যক্তিকে সামনে রেখে, তারা প্রকাশ্যে দো'আ করছিলেন।

এদিকে শাম'উনও মনে মনে দো'আ করছিলেন । আল্লাহর ইচ্ছায় মৃত্যুব্যক্তি জীবন লাভ করল। সে উঠে দাঁড়াল আর উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বলল, আমি সাতদিন পর্যন্ত মৃত। আমি

Dhaka University Institutional Repository

মুশরিক। আমাকে দোজকের সাতটি গর্তে ঠুকানো হয়েছে, তোমরা যে দ্বীনের অনুসরণ কর, তা তোমাদের জন্য ভয়াবহ বিপদ হয়ে দাঁড়াবে। তাই আমি তোমাদেরকে এ সম্পর্কে সাবধান করছি। সুতরাং তোমরা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনো সে আরো বলল, আমি আকাশের দরজার নিচে এক সুন্দর যুবককে দর্শন করছি যে, এ যুবক তিনজনের সুপারিশ করছেন। বাদশাহ বলল এ তিনজন ব্যক্তি কে ? সদ্য জীবিত ব্যক্তি বলল, তাদের একজন শাম'উন আর অপর দু'জন হলো এ দু'জন, এ বলে সে সাদেক ও সুদুকের দিকে ঈঙ্গিত করল। শাম'উন বুঝলেন যে, এখন আর তার পক্ষে নিজেকে গোপন রাখা সম্ভব নয়। তাই তিনি বাদশাহের সামনে নিজের পরিচয় তুলে ধরলেন।[৯]

কুরআন পাকে বলা হয়েছে এভাবে فعززنا بثالث "আমি তৃতীয় একজন দিয়ে শক্তি বাড়ালাম"। অতঃপর শাম'উন নিজের পরিচয় আর গোপন না করে বাদশাহকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার জন্য আহবান জানান। আর বলেন, আমাদেরকে আপনাদের নিকট পাঠানো হয়েছে যেন আমরা আপনাদেরকে ঈমানের প্রতি আহবান করি। বাদশাহ ঈমান তো আনলোই না ; বরং তাদের প্রতি মিথ্যারোপ করলো ।[১০] কুরআনের ভাষায় ঃ

"তাঁরা বলল নিশ্চয় আমরা তোমাদের কাছে প্রেরিত। এন্‌তাকিয়াবাসী বলল, তোমরা তো আমাদের ন্যায় মানুষ। পরম করুনাময় তোমাদের কাছে কোন ওহী নাযিল করেন নি। তোমারা তো মিথ্যা বলছ" ।[১১] উত্তরে প্রেরিত রাসূলগণ বললেন ঃ

"আমাদের রব জানেন যে, আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি এবং আল্লাহর পরিস্কার নির্দেশ পৌছে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব" ।[১২]

এরপরও তারা তো ঈমান আনলোই না ; বরং আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান গ্রহণের আহবানকে বার বার ঠাট্টা বিদ্রুপ করত। তাদের এ আচরণের কারণে আযাবের নমুনা স্বরুপ আল্লাহ পাক বৃষ্টি বন্ধ করে দিলেন, দীর্ঘদিন অনাবৃষ্টির কারণে দেশে অভাব দেখা দেয়। তারা একে কর্মের প্রতিফল হিসেবে গ্রহণ না করে তারা আল্লাহর পথে আহবানকারীদের দোষারোপ করছে। অবিশ্বাসীদের সাধারণ অভ্যাস হলো তাদের প্রতি কোন বিপদাপদ আসলে তারা বলত এ বিপদাপদ এদের কারণে হয়েছে। যেমন মুসা (আ.) এর কাওমের লোকদের সম্পর্কে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে "যখন তাদের ভাল অবস্থা আসত তখন তারা বলত যে এটা আমাদের কারণে হয়েছে।

৯। তাহের সুরেটী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৭ -৪৮৮

১০। তাহের সুরাটী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৭ -৪৮৯

১১। إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون . قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون

আল-কুরআন, ৩৬ : ১৪-১৫

১২। وقالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون - وما علينا الا البلاغ المبين .

আল-কুরআন, ৩৬ : ১৬-১৭

Dhaka University Institutional Repository

আর যখন তাদের মধ্যে কোন খারাপ অবস্থা দেখা দিত তখন তারা ধারণা করত যে, এটা মুসা (আ.) ও তাঁর অনুসারীদের কারণে হয়েছে।[১৩] এন্তাকিয়ার আধিবাসীরা ও এর ব্যতিক্রম করল না। তারাও হযরত ঈসা (আ.) প্রেরিত উল্লেখিত ব্যক্তিদ্বয় সম্পর্কে বলল ঃ

"তারা বলল, নিশ্চয় তোমাদের কারণে আমাদের মধ্যে এ অশুভ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বিরত না হলে অবশ্যই তোমাদেরকে পাথর মারব এবং কঠিন শাস্তি দিব"।[১৪] উত্তরে প্রেরিত রাসুলত্রয় বললেন ঃ

"তারা বলল, তোমাদের এ বিপদের কারণ আমরা নই; বরং হক গ্রহণ না করে অসত্যের দিকে ধাবিত হওয়াই বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে। যদি তোমরা সকলে সত্যকে কবুল করতে একমত হয়ে পড়তে এবং সত্য গ্রহণে মতপার্থক্যের সৃষ্টি না করতে তাহলে কোন দিন তোমাদের প্রতি বিপদ আপতিত হত না। সুতরাং আমাদের কারণে তোমরা বিপদগ্রস্থ হওনি বরং বিপদ তোমরাই ডেকে এনেছ"।[১৫]

উল্লেখিত তিনজন প্রেরিত রাসুলের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করে, তাদের জনপদেরই একজন সৎপথপ্রাপ্ত রাসূলত্রয়ের তাসদিককারী হিসেবে অনুসরণ করার আহবান জানান। কিন্তু হতভাগ্য এ কাওম তার কথারও কর্ণপাত করেনি। অধিকন্ত তাঁর ঈমান প্রকাশের কারণে তাকে নির্মমভাবে নির্যাতন করে করে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেয়। নিম্নোক্ত আয়াতগলো এর সাক্ষ্য বহন করছে :

"শহরের প্রান্ত হতে একব্যক্তি দৌড়ে এসে বলল, হে আমার কাওমের লোকসকল! রাসুলদের দেখানো পথের অনুসারী হও। এমন ব্যক্তিদের অনুসারী হও, যারা হেদায়েতের কাজের কোন প্রকার বিনিময় চায় না এবং তারা নিজেরা সঠিক পথে চলে। আমার এমন কি বাধা রয়েছে যে, আমি এমন এক সত্তার 'ইবাদত করব না যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আমি কি এমন সত্তাকে ছেড়ে অন্য কাউকে মা'বুদ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি যে, আল্লাহ পাক আমাকে কোন বিপদে ফেলতে চাইলে এ সকল নকল মাবুদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবে না এবং আমাকে বিপদমুক্ত করতে পারবে না। এ সত্ত্বেও যদি এদের 'ইবাদত করি তাহলে তো আমি প্রকাশ্য গোমরাহীতে নিমজ্জিত হব"।[১৬]

১৩। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৯

১৪। قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم

আল-কুরআন, ৩৬ : ১৯

১৫। قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون .

আল-কুরআন, ৩৬ : ১৯

১৬। من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين . اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون . وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون . أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون . إني إذا لفي ضلال مبين .

আল-কুরআন, ৩৬ : ২০-২৪

Dhaka University Institutional Repository

সে নানা ভাবে তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করল। শেষ পর্যন্ত স্বীয় ঈমান গ্রহণের ব্যাপারটিও প্রকাশ করে দিল। তাঁর ঈমান গ্রহনের কথা শুনামাত্র তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং তাকে আঘাতে জর্জরিত করল। এ অবস্থায়ও সে স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য দো'আ করছিল "হে আমার রব আমার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করুন"। তবুও জালেমদের অন্তর গলেনি। শেষ পর্যন্ত পাষাণ্ডরা তাকে হত্যা করেই ছাড়ল। এমনকি তারা উল্লেখিত ব্যক্তিত্রয় অর্থাৎ শাম'উন, সাদিক ও সুদুককেও হত্যা করেছিল।[১৭]

হাবিব নাজ্জারের শাহাদাতের সাথে সাথেই আল্লাহর পক্ষ হতে তাকে সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে যে, ادخل الجنة "তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর"। কিন্ত সে তখনো আপন কাওমের লোকদেরকে ভুলেননি; বরং কাওমের লোকদের নাজাতের জন্য আফসোস করছে তার আফসোসের কথা এভাবে কুরআন পাকে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

"(হাবীব নাজ্জার) বলল, হায়! আফসোস যদি আমার কাওমের লোকেরা জানত যে, আমার রব আমাকে মাফ করে দিয়েছেন এবং আমাকে সম্মানিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন"।[১৮]

উল্লেখিত ঘটনার পর আল্লাহ এহেন বর্বর জাতির ধ্বংসের ফয়সালা করলেন। হযরত জিব্রাঈল (আ.) কে তাদের ধ্বংসের জন্য প্রেরণ করলেন। তিনি ইন্তেকিয়া শহরে উপনীত হয়ে শহরের উভয় পার্শ্বে হাত রেখে খুব জোরে শব্দ করলেন, শব্দের গর্জনে শহরের সমস্ত লোক কলিজা ফেটে মৃত্যুমুখে পতিত হলো।[১৯]

১৭। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৯০

১৮। بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون

আল-কুরআন, ৩৬: ২৬-২৭

১৯। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৯১

Dhaka University Institutional Repository

আছহাবুল উখদুদ বা কাওমে তুব্বা

আছহাবুল উখদুদ পরিচিতি

"খাদ" কিম্বা "উখদুদ" শব্দ দ্বয়ের অর্থ গর্ত, গহবর এবং পরিখা। এই শব্দটি একবচন এবং বহুবচন 'আখাদিদ' যেহেতু আলোচনাধীন ঘটনাটিতে কাফের বাদশা এবং তার ওমারা ও রাজপরিষদবর্গ গর্ত খনন করে এবং উহার মধ্যে আগুন প্রজ্বলিত করে জলন্ত অগ্নির মধ্যে খৃষ্টান ধর্মীয় মু'মিনদেরকে নিক্ষেপ করে জীবিত পুড়ে ভস্মীভূত করেছিল। এই কারণে এ কাফেরদেরকে "আছহাবুল উখদুদ" অগ্নিকুন্ডওয়ালা বলা হয়। [২০]

আছহাবুল উখদুদ ও কুরআন মাজীদ

কুরআন মাজীদের সূরায়ে "দুখান" ও সূরা "বুরুজে" আছহাবে উখদুদের আলোচনা করা হয়েছে, কুরআনের ভাষ্য- হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে এক স্থানে হক ও বাতিলের এক সংগ্রাম দেখা দেয়। একদিকে ছিল আল্লাহ তা'আলার মুমিন বান্দাগণ, যাদের নিকট যদিও জড়বাদী শক্তি ও ক্ষমতা ছিল না কিন্তু ঈমান এবং সত্য ও সততার বলে আল্লাহ তা'আলার নামে নিজেকে কুরবান করার এবং আত্মোৎসর্গ করার বলে বলিয়ান ছিল।

অপর পক্ষ ঈমান বিল্লাহ ও সত্য গ্রহণ হতে বঞ্চিত এবং বাতিলের পূঁজারী ছিল। কিন্তু জড়বাদী শান-শওকত প্রতাপ প্রতিপত্তি এবং অত্যাচারী সূলভ শক্তির প্রাচুর্য ছিল। এমতাবস্থায় কাফের মুশরিক শক্তি মু'মিনের ঈমানী শক্তি এবং সত্য গ্রহণের ক্ষমতাকে সংগ্রামের মুখোমুখি হওয়ার আহবান জানিয়েছিল যে, হয়ত "ঈমান বিল্লাহ" পরিহার পূর্বক শির্ক ও কুফরের দিকে ফিরে যাও। অন্যথায় ধরাপৃষ্ট হতে মুছে যাওয়ার প্রস্তুতি নাও। সত্যিকারের মু'মিনগণ তাদের এ আহবান এবং চ্যালেঞ্জকে ঈমানী শক্তি ও সাহসের সহিত গ্রহণ করল এবং ঈমান বিল্লাহর আলো হতে বের হয়ে শির্ক ও কুফরের অন্ধকারে প্রবেশ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করল।

ইহা দেখে কাফের দলের পক্ষ হতে রাজকীয় ক্ষমতা এবং অত্যাচারীসূলভ প্রতাপের সহিত শহরের বিভিন্ন অংশে গর্ত সমূহ খনন করা হচ্ছে, গর্ত সমূহের মধ্যে অগ্নি প্রজ্জলিত হচ্ছে, লেলিহান শিখাসমূহ দাউ দাউ করছে এবং শহরের বেশীর ভাগ ভূখন্ডই অগ্নিকুন্ডে পরিণত হয়েছে। অনন্তর মুমিন জামাতের আত্মমর্যাদাবান এবং আল্লাহর নামে আত্মোৎসর্গকারী লোকদিগকে দলে দলে টেনে এনে স্থানে স্থানে অগ্নিকুন্ডের ধারে দাঁড় করানো হচ্ছে আর শির্ক কফুর স্বীয় জড়বাদী শক্তির বলে বলছে, হয় আমাকে গ্রহণ কর অন্যথায় প্রজ্বলিত অগ্নির জ্বলন্ত গহবরে নিক্ষিপ্ত হবে।

২০। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৮২

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরে ঈমানদারগণ বললেন, দোযখের আগুনের মোকাবিলায় তোমাদের আগুনের এ আযাব একটি খেলা মাত্র। অতএব, ঈমান বিল্লাহ জাহান্নামের আগুনের মোকাবিলায় আনন্দের সহিত তাদের অগ্নিকান্ডকে কবুল করে লয়। কিন্তু শির্ক ও কুফরকে এক মুহুর্তের জন্যও বরদাশত করতে পারে না। কুফর ও শির্ক এর শক্তি ইহা শ্রবন করে নিরুত্তর হয়ে যায় এবং ক্রোধে উম্মাদ হয়ে তাওহীদের জন্য আত্মোৎসর্গকারীদের জীবন্ত অবস্থায় অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করে। এরুপে সত্য, বিজয়ী ও সফলকাম এবং মিথ্যা পরাজিত বিফলকাম হয়ে যায়। কেননা, যাদেরকে বিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে, অগ্নিকুন্ড সমূহের প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্যে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করা হলো, বাস্তবিক পক্ষে তারা পুড়ে নাই এবং মরে নাই বরং চিরঞ্জীব হয়ে অনন্তর বেহেস্ত প্রবেশ করেছে। আর যারা নিজেদের অহংকারে মত্ত হয়ে নেককার লোকদের উপর অস্থায়ী অগ্নি প্রজ্বলিত করছিল তারা চিরস্থায়ী ও অনন্ত অগ্নির অর্থাৎ জাহান্নামের উপযোগী সাব্যস্থ হয়েছে, যারা দুনিয়ার মধ্যে প্রজ্বলিত করেছে এবং সত্যিকারের মুমিনদেরকে ইহার ইন্ধন বানিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পরলোকে এক ভয়ংকর অগ্নিকুন্ড জাহান্নাম প্রস্তুত করে বা প্রজ্বলিত করে রেখেছে। ইহার ইন্ধন হবে কাফির ও মুশরিকগণ এবং অত্যাচারী ও উৎপীড়কের দল। ইহাদের অগ্নিকুন্ড সত্বর হোক কিম্বা বিলম্বে হোক একদিন নিভে যাবেন। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালার প্রজ্বলিত অগ্নিকুন্ড অনন্ত ও স্থায়ী ইহা কোন কালেও নিভে যাবে ও বিলীন হবে না। কুফর ও শিরক পার্থিব ক্ষমতার উপর গর্বিত হয়েছে কিন্তু ইহার শাস্তি 'আযাবুল হারীক' এবং আযাবে জাহান্নামের। আর ঈমান বিল্লাহ আল্লাহ পাকের ক্ষমতার উপর ভরসা করছে। অতএব, ইহার ফলে তার الفوز الكبير অর্থাৎ বিরাট সাফল্য جنت تجرى من تحتها الانهار - এবং এমন জান্নাত লাভ করেছে যার তলদেশ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত রয়েছে। [২১]

আছহাবুল উখদুদের ইতিহাস

মুফাস্সিরগণ "আছহাবুল উখদুদের" তাফসীরে গর্তে আগুন জালিয়ে ঈমানদারদেরকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করার একাধিক ঘটনা হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন। এ থেকে জানা যায় এধরনের জুলুম ও নিপীড়নমূলক ঘটনা দুনিয়ায় কয়েকবার ঘটেছে। তন্মোধ্য নিম্নে বর্ণিত ঘটনা গুলো অধিক প্রসিদ্ধ :

এক. অতীতকালে জনৈক এক বাদশার কাছে এক যাদুকর ছিল। বৃদ্ধ বয়সে সে বাদশাহকে বলল, একটি ছেলেকে আমার কাছে নিযুক্ত কর, সে আমার কাছ থেকে এ যাদু শিখে নেবে। বাদশাহ যাদু শেখার জন্য যাদুকরের কাছে একটি মেধাবী ও চতুর ছেলেকে নিযুক্ত করল। কিন্তু সেই ছেলেটি যাদুকরের কাছে আসা যাওয়ার পথে একজন রাহেবের (যিনি হযরত ঈসা (আ.) দ্বীনের অনুসারী সাধক ছিল।) সাথে সাক্ষাত করতে লাগল। তাঁর কথায় প্রভাবিত হয়ে তাঁর প্রতি ঈমান আনলো। এমনকি তাঁর শিক্ষার গুনে সে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়ে গেল। সে জন্মান্ধদের দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিতে এবং কুষ্টরোগীদের ভাল করে দিতে লাগলো, ছেলেটি তাওহীদের প্রতি ঈমান এনেছে, এ কথা জানতে পেরে বাদশাহ প্রথমে রাহেবকে হত্যা করলো তারপর ছেলেটিকে হত্যা করতে চাইলো কিন্তু কোন অস্ত্র দিয়েই এবং কোনভাবেই তাকে হত্যা করতে পারল না।

২১। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৮৩

Dhaka University Institutional Repository

শেষে ছেলেটি বলল, যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও তাহলে প্রকাশ্যে জনসমাবেশে "বিসমি রব্বিল গুলাম" (অথার্ৎ এ ছেলেটির রবের নামে) বাক্য উচ্চরণ করে আমাকে তীর মারো, তাতেই আমি মারা যাবো। বাদশাহ তাই করল। ফলে ছেলেটি মারা গেল। এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে লোকেরা চিৎকার করে বললো আমরা এ ছেলেটির রবের প্রতি ঈমান আনলাম। বাদশাহর সভাসদরা তাকে বললো, এখন তো তাই হয়ে গেলো যা থেকে আপনি বাঁচতে চাচ্ছিলেন। লোকেরা আপনার ধর্ম ত্যাগ করে এ ছেলেটির ধর্ম গ্রহণ করেছে। এ অবস্থা দেখে বাদশাহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলো। সে রাস্তার পাশে গর্ত খনন করল তাতে অগুন জ্বলালো। যারা ঈমান ত্যাগ করতে রাজি হলো না, তাদের সবাইকে তারমধ্যে নিক্ষেপ করল।[২২]

দুই ঃ ইরানের এক বাদশাহ শরাব পান করে নিজের বোনের সাথে ব্যাভিচার করে এবং উভয়ের অবৈধ সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়। কথাটি প্রকাশ হয়ে গেলে বাদশাহ জন সমক্ষে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ বোনের সাথে বিয়ে হালাল করে দিয়েছেন। লোকেরা তার একথা মানতে প্রস্তুত হল না। ফলে সে নানান ধরনের শাস্তি দিয়ে লোকদের একথা মানতে বাধ্য করতে থাকে। এমনকি সে অগ্নিকুন্ড জালিয়ে যে ব্যক্তি তার এ কথা মানতে প্রস্তত হয়নি তাকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করতে থাকে। হযরত আলী (রা.) বলেন, সে সময় থেকেই অগ্নি উপসকদের মধ্যে রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়কে বিয়ে করার পদ্ধতি প্রচলিত হয়। [২৩]

তিন ঃ হিময়ার (ইয়ামন) বাদশাহ তুবান আস্‌য়াদ।

আবু কারিবা একবার ইয়াসরিবে যায়। সেখানে ইয়াহুদিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করে এবং বনি কুরাইযার দু'জন ইহুদি 'আলিমকে সঙ্গে করে ইয়ামনে নিয়ে যায়। সেখানে ব্যাপকভাবে ইহুদি ধর্মের প্রচার চালায়। তারপর তার ছেলে যু-নুওয়াস তার উত্তরাধিকারী হয়। সে দক্ষিণ আরবে ঈসায়ীদের কেন্দ্রস্থল নাজরান আক্রমন করে। সেখানে ঈসায়ী ধর্ম উৎখাত করা এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে জোরপূর্বক ইহুদি ধর্মে দীক্ষিত করাই ছিল তার লক্ষ। (নাযরানবাসীরা হযরত ঈসা (আ.)-এর ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।) নাজরান পৌঁছে সে লোকদেরকে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করার আহবান জানায়। লোকেরা অস্বীকার করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সে বিপুল সংখ্যক লোককে দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনের কূঁয়ায় নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দেয় এবং অনেককে হত্যা করে। এভাবে মোট বিশ হাজার লোক নিহত হয়।

২২। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৮৪.

২৩। প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

নাজরান বাসীদের পক্ষ থেকে 'দাউস যু-সালাবান' নামক এক ব্যক্তি কোন ক্রমে প্রাণে রক্ষা পেয়ে সে রোমের কায়সারের দরবারে চলে যায়। কেউ বলেন, সে হাবশার (ইথিওপিয়া) বাদশাহ নজ্জাসীর দরবারে চলে যায়। সেখানে সে এই জুলুমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। সর্বশেষে হাবশার বাদশাহ নাজ্জাসী আইরন নামক এক সেনাপতির পরিচালনাধীনে সত্তর হাজার সৈন্য আক্রমণ করে ইয়ামন দখল করে নেয়, যুদ্ধে যু-নুওয়াস নিহত হয়। ইহুদি রাষ্ট্রের পতন ঘটে । ইয়ামন হাব্শার ঈসায়ী রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত হয়। [২৪]

আছহাবুল উখদুদের যমানা

মুসলিম ঐতিহাসিক তথ্যাদিতে জানা যায়, সর্ব প্রথম ৩৪০ খৃষ্টাব্দে ইয়ামন হাবশার ঈসায়ীদের দখলে আসে। ৩৭৮ খৃ. পর্যন্ত সেখানে তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে । এ সময়ে ঈসায়ী মিশনারীরা ইয়ামনে প্রবেশ করতে থাকে। এরি নিকটবর্তী সময়ে ফেমিউন (Faymiyvn) নামক একজন সংসার ত্যাগী সাধক, পুরুষ, কাশ্ফ ও কারামতের অধিকারী ঈসায়ী পর্যটক নাজরানে আসেন। তিনি স্থানীয় লোকদেরকে মূর্তিপূঁজার গলদ বুঝাতে থাকেন। তার প্রচার শুনে নাজরানে ঈসায়ী ধর্মে দিক্ষিত হয়। ঈসায়ী ধর্মের উত্থানও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে তৎকালিন ইয়ামনের "তুববা" যু-নুওয়াস এ গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি দখল করে তৎকালিন "সাইয়েদ" হারেশাকে হত্যা করে। তাঁর স্ত্রী রুমার সামনে তার দুটি কন্যাকে হত্যা করে।"ওসকুফ" বিশপ পলের শুকনো হাড় কবর থেকে বের করে এনে জালিয়ে দেয়। আগুন ভরা গর্ত সমূহে নারী, পুরুষ, শিশু, যুবা, বৃদ্ধা, পাদরী, রাহেব সবাইকে নিক্ষেপ করে। সামগ্রিক ভাবে ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছিল। ৫২৩ খৃষ্টাব্দে এ ঘটনা ঘটে। অবশেষে ৫২৫ খৃষ্টাব্দে হাবশীরা ইয়ামন আক্রমন করে যু-নুওয়াস ও তার হিমাইয়ারী রাজত্বের পতন ঘটায় । প্রত্নত্তাত্বিক গবেষকগণ ইয়ামন হিসনে গুরারের যে শিলালিপি উদ্ধার করেছেন তা থেকেও এর সত্যতা প্রমাণিত হয়।

খৃষ্টীয় ষষ্ট শতকে ঈসায়ী লেখকদের বিভিন্ন লেখায় গর্ত ওয়ালাদের এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এর মধ্যে মূল ঘটনার সময় এবং এ ঘটনা যারা প্রত্যক্ষ করেছিল তাদের বিবরণ সহকারে লিখিত কিছু গ্রন্থ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে তিনটি গ্রন্থের রচয়িতরা এই ঘটনার সমসাময়িক।

২৪। ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত,খ. ৪, পৃ. ৪৯৪-৪৯৫

Dhaka University Institutional Repository

তাদের একজন হচ্ছেন ঃ প্রকেপিউস দ্বিতীয় জন কসমস ইনডিকোপ্লিউসটিস (Cosmos Indicopleustis) তিনি নাজ্জাশী এলিস বুয়ানের (Elesboan) সে সময় বাতলিমুসের গ্রীক ভাষায় লিখিত বই গুলোর অনুবাদ করেছিলেন। এ সময় তিনি হাবশার সমুদ্রোপকুলবর্তী এডোলিশ (Adolis) শহরে অবস্থান করছিলেন। তৃতীয় জন হচ্ছেন জোহান্নাস মালানা (Johannes Malala) পরবর্তী বহু ঐতিহাসিক তাঁর রচনা থেকে ঘটনাটি উদ্বৃত করেছেন। এদের পর এফেসুসের জোহান্নাসের (Johannes of Ephesus) নাম করা যায়। তিনি ৫৮৫ খৃষ্টাব্দে মারা যান। তার গীর্জার ইতিহাস গ্রন্থে নাজরানের ঈসায়ী সম্প্রদায়ের উপর এই নিপীড়নের কাহিনী এ ঘটনার সমসায়িক বর্ণনাকারী বিশপ শিমউনের (Simeon) একটি পত্র থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

এ পত্রটি লিখিত হয় জাবলা ধর্ম মন্দির প্রধানের (Abbot von Garabula) নামে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বিভিন্ন ইয়ামানবাসীর বর্ণনার মাধ্যমে শিম'উন তার এ পত্রটি তৈরী করেন। এ পত্রটি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে রোম থেকে এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ঈসায়ী শহীদানের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রকাশিত হয়। কিলবি তাঁর (Arabian Highlands) নামক সফর নামায় লিখেছেন ঃ গর্ত ওয়ালাদের ঘটনা যেখানে সংঘটিত হয়েছিল সে জায়গাটি আজও নাজরান বাসীদের কাছে সুস্পষ্ট "উম্মুল খারাক" এর কাছে এক জায়গায় পাথরের গায়ে খোদিত কিছু চিত্রও পাওয়া যায়।[২৫]

হযরত আনাস (রা.)-এর পুত্র রবী বলেন, আসহাবে উখদুদ এর ঘটনাটি "ফাতরাত' এর যামানায় অর্থাৎ ঈসা (আ.) এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর মধ্যবর্তী যামানায় সংঘটিত হয়েছিল।[২৬]

ইব্ন কাসীর একজন ঐতিহাসিক হিসেবে ইহা প্রমাণ করেছেন যে, এ জাতীয় ঘটনা নিঃসন্দেহে একাধিকবার ঘটে গিয়েছে এবং তিনি উল্লেখ করেন ঃ

"আর ইহা সম্ভব যে, এই জাতীয় ঘটনা পৃথিবীতে বহু ঘটে থাকবে। যেমন, ইব্ন হাতেম বলেন, উখদুদের ঘটনা একটি তো ইয়ামনে "তুববা" হিমইয়ারীর সময়ে ঘটেছিল, আর দ্বিতীয় একটি ঘটনা কনষ্ট্যানটাইনের কবলে কনষ্ট্যনটিনোপলে ঘটেছিল। আর তৃতীয় ঘটনা ইরাকের বাবেলে বোখতে নাছার-এর যামানায় ঘটেছিল। সে একটি মূর্তি তৈরী করে লোকদেরকে ইহার পূঁজা করতে বাধ্য করত। যে ব্যক্তি উহার পূঁজা করতে অস্বীকার করত তাকে জীবন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হতো। [২৭]

২৫। ইব্ন কাসীর, প্রাগুক্ত, খ. ৪ পৃ. ৪৯৩

২৬। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৯৩

২৭। উদ্বৃত, ইব্ন কাসীর, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ.১২৩০

মূল আরবীঃ

قد يحتمل ان ذلك قد وقع فى العالم كثيرا كما قال ابن ابى حاتم كانت لاخدود فى اليمن زمن تبع وفى القسطنطنية زمان قسطنطين وفى العراق فى ارض بابل بخت نصر الذى صنع الصنم وامر الناس ان يسجدوا له ـ

Dhaka University Institutional Repository

"আর মুকাতেল বলেন, উখদুদ সংক্রান্ত তিনটি ঘটনা রয়েছে। একটি আরবের ইয়ামন দেশের নাজরান শহরে ঘটেছিল। দ্বিতীয় শাম দেশে এবং তৃতীয়টি পারস্য দেশে। এ সমস্ত ঘটনায় মাযলুমদিগকে প্রজ্বলিত অগ্নিতে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়েছে। শাম দেশের ঘটনাটি ইস্তানানূস রুমীর হতে ঘটেছিল। আর পারস্যের ঘটনাটি বোখ্ত নাছার নামক প্রসিদ্ধ ও দুর্দান্ত জালেমের হাতে এবং ইয়ামানের ঘটনাটি ইউসুফ যু-নুওয়াস-এর হাতে ঘটেছিল কিন্তু পারস্য ও শামের ঘটনাগুলোর উল্লেখ কুরআন মাজীদে নাই। অবশ্য নাজরানে যে ঘটনাটি ঘটিয়াছে উহা কুরআন মাজীদে উল্লেখ হয়েছে। [২৮]

মোটকথা ইয়ামনের ইহুদী শাসক যু-নওয়াস নাজরানে ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদের ওপর যে জুলুম করেছিল তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য হাবশার (বর্তমান ইথিয়পিয়া) ইয়ামান আক্রমন করে হিমইয়ারী শাসনের অবসান ঘটিয়েছিল। যার ফলে ৫২৫ খৃষ্টাব্দে এ সমগ্র এলাকাটিতে হাবশার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[২৯]

২৮। উদ্বৃত, ইব্ন কাসীর, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ.১২৩২, মূল আরবী:

وعن مقاتل قال كانت لاخدود ثلاثة واحدة بنجران باليمن والاخرى بالشام - والاخرى بفارس فهو بخت نصر واما لتى بارض العرب (نجران) فهو يوسف دو نواس قاما لتى بفارس والشام فلم ينزل الله تعالى فيهم قرانا وانزل فى التى كانت بنجران .

২৯। মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

আসহাবুল ফীলের ইতিহাস

আসহাবুল ফীলের পরিচিতি

"আসহাব" শব্দের অর্থ "বাহিনী" বা "ওয়ালা" আর "ফীল" অর্থ হস্তী বা হাতি। "আসহাবুল ফীল"অর্থ হস্তী বাহিনী বা হস্তীওয়ালা। কুরআন মাজীদের যে সুরায় এ বিস্ময়কর ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ তা'আলা যে সুরাটির নামও "সূরাতুলফীল" নামে নামকরণ করেছেন। আসহাবুল ফীলের এ অলৌকিক ঘটনাটি 'মুহাররম' মাসে মহানবী (সা.)-এর জন্ম গ্রহনের চল্লিশ কিম্বা পঞ্চাশ দিন পূর্বে ঘটেছিল। আরববাসীর নিকট ঘটনাটি এত অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রসিদ্ধ ছিল যে, তারা এ বৎসরটির নাম আ'মুল ফীল বা হাতির বৎসর রেখে দিল। অতঃপর ঐতিহাসিক ঘটনা সমূহে ঐ বৎসরটির হিসেবে গণনা করতে লাগল। সে বৎসরটি খৃষ্টাব্দ হিসেবে ৫৭১ খৃষ্টাব্দ এবং রোমীয় সন হিসাবে ৮৮৬ সেকান্দরী সন হয়। [১]

পবিত্র কুরআন মাজিদে সুরায়ে ফীলে এ হস্তী বাহিনী ও তার পরিণতির কথা উল্লেখ করেছে।

"হে মুহাম্মদ (সা.)! আপানি কি দেখেন নাই যে, আপনার পরোয়ারদেগার হস্তীবাহিনীর সাথে কিরুপ আচরণ করিয়াছে ? তাদের বড় ষড়যন্ত্র নিষ্ফল করে দেন নি কি ? এবং পাঠিয়ে দিয়েছেন তাদের উপর পাখির ঝাক। উহারা তাদের উপর নিক্ষেপ করেছিল প্রস্তরখন্ড, ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে চর্বিত ভূষির ন্যায় করে দিলেন। [২]

আসহাবে ফীলের সেনাপতি

আসহাবে ফীলের যে ব্যক্তি নেতৃত্ব দিয়েছিল তার নাম আবরাহা যাকে আরবগণ "আশরাম" অথার্ৎ নাককাটা বলে ডাকত। আবরাহা ছিল হাবশার আদুলিস বন্দরের একজন গ্রীক ব্যবসায়ীর ক্রীতদাস। তিনি নিজের বুদ্ধিমত্তার জোরে ইয়ামন দখলকারী হাবশী সেনা দলে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টিতে সক্ষম হয়।

হাবশা সম্রাট তাকে দমন করার জন্য সেনা বাহিনী পাঠায়। কিন্তু এ সেনাদল হয় তার পক্ষে যোগ দেয় অথবা সে ঐ সেনাদলকে পরাজিত করে। অবশেষে হাবশা সম্রাটের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী তাকে ইয়ামনে নিজের গভর্ণর হিসেবে স্বীকার করে নেয়। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ তাঁর নাম বলেছেন আবরামিস (Abrames) এবং সুরিয়ানী ঐতিহাসিকগণ তাকে আবরাহাম (Abraham) নামে উল্লেখ করেছেন। আবরাহাম সম্ভবত এরই হাবশী উচ্চারণ আরবীতে এর উচ্চারণ ইব্রাহীম। ৩

১। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১২২

২। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل . ألم يجعل كيدهم في تضليل . وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل . فجعلهم كعصف مأكول .

আল-কুরআনুল, ১০৫-১০৬

৩। ইব্ন কাসীর, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ.১৫০২

Dhaka University Institutional Repository

আবরাহা শাহী খানদানের লোক ছিল। কিন্তু নাক কাটা ছিল বলে আববরা তাকে "আশরাম" বলে ডাকত। তার রাজত্বের কাল কারো মতে ৫২৫ খৃষ্টাব্দ এবং কারো মতে ৫৪৩ খৃষ্টাব্দ হতে আরম্ভ হয়।[৪]

আবরাহা ইব্রাহীম শব্দের হাবশী উচ্চারণ। এ লোকটি ঈসায়ী ধর্মে অতি উৎসাহী ছিল। সে তাঁর সমগ্র রাজ্যে ঈসায়ী ধর্মের বহু ধর্ম প্রচারক নিযুক্ত করেছিল। রাজ্যের শহরসমূহে বড় বড় গির্জা নির্মাণ করেছিল। এ সমস্ত গির্জার মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ গির্জা নির্মাণ করেছিল ছান'আ শহরে, আরবরা একে "আল কালিস" বলত যা গ্রীক শব্দ "কালীসা" হতে আরবীরুপ।[৫]

আবরাহার "আল কালীস" গির্জাটি নির্মাণ শিল্পে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় ছিল। ইহার নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হলে আবরাহা নাজ্জাসীকে লিখে "আপনার জন্য ছান'আ শহরে এমন একটি নযিরবিহীন গির্জা নির্মাণ করেছি যে, ইতিপূর্বে ইতিহাস এমন গির্জা আর কখনো দেখেনি। এখন আমার আকাংঙ্খা এই যে, আশ পাশের আরবেরা যারা মক্কা শহরে কাবা গৃহের হজ্বের জন্য সমবেত হয়ে থাকে, তাদের সকলের মনযোগ এগির্জার দিকে আকৃষ্ট করে দেই এবং সমগ্র আরব জাতির জন্য ইহাই যেন হজ্জের স্থান হয়ে যায়। আরববাসীরা ইহা শুনে ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট হয়ে গেল।[৬]

'সুহাইলী' বলেন, আবরাহা এই গির্জা নির্মাণে ইয়ামনবাসীদেরকে ভীষণ অত্যাচার করেছিল। তাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে শ্রমিক নিযুক্ত করেছিল। ইয়ামনের অপরিমিত ধন-সম্পদ এবং মহামূল্যবান হীরা-জহরত বিনাদ্বিধায় এর উপর ব্যয় করেছে। ইহা মহামূল্যবান প্রস্তর সমূহের নির্মিত অতি সুন্দর এবং অতিশয় দীর্ঘ ও প্রশস্ত এক ইমারত ছিল। বিস্ময়কর ও বিচিত্র স্বর্ণখচিত চিত্রাবলীতে বিত্রিত এবং রত্ন খন্ডে খচিত ছিল। আর হস্তিদন্ত ও আবনোস কাল ও সুগন্ধি শক্ত কাঠের কারুকার্যে সুশোভিত মিম্বর এবং রৌপ্য নির্মিত ক্রুশচিহ্নসমূহ দ্বারা ইহা সুসজ্জিত করা হয়েছিল। ইহার ধ্বংসাবশেষ প্রথম আব্বাসী খলীফা "আবুল আব্বাস সাফ্ফা" এর রাজত্বকাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।[৭]

"আবরাহার" কাবা ধ্বংসের ষড়যন্ত্র

আবরাহার সান'আয় গির্জা নির্মাণের অন্যতম কারণ কাবার সম্মানের হানী করা, ব্যবসায়িক মুনাফা অর্জন করা, সর্বপরি কাবার ধ্বংসের সুযোগ লাভ করা। তার এ হীন উদ্দেশ্যর কথা সারা আরবে প্রচার করে দেয়া হয়। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন, তার এ ধরনের ঘোষণায় ক্রুদ্ধ হয়ে সান'আ শহরে অবস্থানকারী জনৈক হিজাযী কোন প্রকারে তার গির্জার মধ্যে প্রবেশ করে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করে। ইবনে কাসীর বলেন, এ কাজটি করেছিল এক কুরাইশী।[৮]

৪। সুলায়মান নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫০

৫। হিফযুর রহমান, প্রগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১৫-১১৬।

৬। ইব্ন কাসীর, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭০

৭। ইব্ন কাসীর, খ. ২, পৃ. ১৭

৮। প্রাগুক্ত, পৃ.১৮

Dhaka University Institutional Repository

মাকাতিল ইব্ন সুলাইমানের বর্ণনা মতে, কয়েক কুরাইশ যুবক গিয়ে এ গির্জায় আগুন ধড়িয়ে দেয়। এর মধ্যে যে কোন একটি ঘটনাই যদি সত্যি সত্যি ঘটে থাকে, তাহলে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ আবরাহার এ ঘোষণাটি ছিল নিশ্চিত ভাবে অত্যন্ত উত্তেজনা সৃষ্টিকারী। এ কারণে প্রাচীন জাহেলী যুগের কোন আরব বা কুরাইশীর অথবা কয়েক জন কুরাইশী যুবকের পক্ষে উত্তেজিত হয়ে গির্জাকে নাপাক করা অথবা তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়া কোন অস্বাভাবিক বা দুর্বোধ্য ব্যাপার ছিল না। কিন্তু আবরাহার নিজের পক্ষে এ ধরনের কোন কান্ড করে ফেলাটাও অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হয় না। কারণ সে এভাবে মক্কা আক্রমন করার বাহানা সৃষ্টি করতে এবং কুরাইশদেরকে ধ্বংস এবং সমগ্র আরববাসীকে ভীত সন্ত্রস্ত করে দিয়ে নিজের উভয় উদ্দেশ্য সফলকাম হতে পারবে বলে মনে করেছিল। মোটকথা দু'টি অবস্থার মধ্য থেকে যে কোন একটিই সঠিক হোক না কেন, আবরাহার কাছে যখন এ রির্পোটি পৌছলো যে, কাবার ভক্ত অনুরক্তরা তার গীর্জার অবমাননা করছে, তখন সে কসম খেয়ে বসে, কাবাকে গুড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে না দেয়া পর্যন্ত আমি স্থির হয়ে বাসবো না।[৯]

অতঃপর ৫৭০ বা ৫৭১ খৃষ্টাব্দে সে ৬০ হাজার পদাতিক, ১৩টি হাতি অন্য বর্ণনায় ৯টি হাতি সহকারে মক্কার পথে রাওয়ানা হয়। পথে প্রথমে যু-নফর নামক ইয়ামনের একজন সর্দার আরবদের একটি সেনাদল সংগ্রহ করে তাকে সে বাধা দেয়। কিন্তু যুদ্ধে সে পরাজিত ও ধৃত হয়। তারপর খাশআম এলাকার নুফাইল ইব্ন হাবীব তার খাশআম গোত্রের লোকদের নিয়ে তার পথ রোধ করে কিন্তু সেও পরাজিত ও গ্রেপ্তার হয়ে যায়। সে নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য আবরাহার সেনাদলের পথ প্রদর্শকের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

আবরাহা ও তার সেনাদল যখন তায়েফে গিয়ে পৌছল তখন বনু সফীকের সরদার মাসউদ ইব্ন মুআত্তাব অগ্রসর হয়ে আবরাহার সাথে সাক্ষাত করে এবং আশ্বাস দিল যে, আপনার সহিত আমার ও আমার গোত্রের কোন বিবাদ নাই। কেননা, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আপনি "বায়তুল্লাহ" ধ্বংস করতে ইচ্ছা রাখেন না। যাতে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত মা'বুদ লাত রক্ষিত রয়েছে। আবরাহা তাদেরকে এ বিষয়ে নিশ্চিত করে নিরবে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়ে যায়। মাসউদ সাকাফী আবরাহাকে মক্কার পথ দেখানোর জন্য আবু রিগাল নামক এক ব্যক্তিকে তাদের সাথে দিয়ে দেয়।

কিন্তু আবু রিগাল মক্কা পৌছতে তিন ক্রোশ বাকী থাকতে ওয়াদিয়ে "মুগাস্সাস" বা মুগাস্সিস নামক স্থানে মৃত্যু বরণ করে। আরবরা দীর্ঘকাল পর্যন্ত তার কবরে পাথর মেরে আসছে। বনী সফীককেও তারা বছরের পর বছর ধরে এই বলে ধিক্কার দিয়ে এসেছে যে, তোমরা লাতের মন্দির বাঁচাতে আল্লাহর ঘরের উপর আক্রমনকারীদের সহযোগীতা করেছ। ১০

৯। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১৭

১০। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

Dhaka University Institutional Repository

আবরাহা মুগাসসাসে পৌছে আসওয়াদ ইবনে মাকসুদ এর নেতৃত্বে অগ্রবাহিনীকে সামনের দিকে পৌছে দেয়। তারা তিহামার অধিবাসীদের ও কুরাইশদের উট, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি বহু পালিত পশু লুট করে নিয়ে যায়। এর মধ্যে রসুলুল্লাহ (সা.) এর দাদা আবদুল মুত্তালিবের দু'শ উটও ছিল।

এই সময়ে আবদুল মুত্তালিব কুরাইশদের সর্দার ছিলেন। এই অবস্থা দেখে কুরাইশ, কেনানা, হুযাইল প্রভৃতি গোত্র পরস্পর পরামর্শ করল যে, আবরাহার সহিত কি ভাবে মোকাবিলা করা যায় ? পরামর্শের পর সাব্যস্ত হলো যে, আমাদের মধ্যে মোকাবিলা করার সাধ্য কারো নাই। সুতরাং আমাদের মক্কা ত্যাগ করে নিকটবর্তী পাহাড়ে চলে যাওয়া উচিত। তারা মক্কায় থাকতেই আবরাহার পক্ষ হতে জামাতাহুল হিম্ইয়ারী মক্কায় এসে পৌঁছল এবং জিজ্ঞেস করল মক্কার সর্দার কে ? লোকেরা আবদুল মুত্তালিবের দিকে ইশারাহ করে দেখিয়ে দিল। জামাতা বলল, "আমি আমাদের বাদশাহ আবরাহার পক্ষ হতে এসেছি, আমাদের বাদশাহর আদেশ আপনাদের নিকট পৌছে দেয়া, আপনাদের কোন ক্ষতি করা আমাদের ইচ্ছা নহে। আমরা আপনাদের সহিত কোন যুদ্ধ করতে আসি নাই আমরা শুধু এই ঘরটি (বায়তুল্লাহ) ধ্বংস করতে এসেছি। অতএব, যদি আমাদের সহিত মোকাবিলা করার কিম্বা আমাদিগকে বাঁধা প্রদানের ইচ্ছা আপনাদের থাকে, তবে তা আপনাদের বিবেচনা, আর যদি আপনারা আমাদের ইচ্ছার প্রতিবন্ধক না হন, তবে আমাদের বাদশাহ আপনার সহিত সাক্ষাত করতে ইচ্ছুক। আবদুল মুত্তালিব উত্তর করলেন, তোমাদের বাদশাহর সহিত যুদ্ধ করার ইচ্ছা মোটেও আমাদের নেই, আমাদের মধ্যে এ ক্ষমতাও নেই। ইহা আল্লাহর তা'আলার ঘর এবং তার সম্মানিত নবী ইব্রাহীম (আ.)-এর স্মৃতি । অতএব, আল্লাহ তা'আলার যদি ইহা রক্ষা করার উদ্দেশ্য না হয় তবে বাঁধা প্রদানে সাধ্য আমাদের মোটেও নাই।

এরুপ কথাবার্তা বলার পর দূত বলল আপনি আমার সাথে আবরাহার কাছে চলুন। তিনি সম্মত হন এবং দূতের সাথে আবরাহার কাছে যান। তিনি এতই সুশ্রী আকর্ষণীয় ও প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, আবরাহা তাকে দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে পড়ে। সে সিংহাসন থেকে নেমে এসে নিচে তার কাছে বসে পড়ে। সে তাকে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি চান ? তিনি বলেন আমার যে উটগুলো ধরে নেওয়া হয়েছে, সে গুলো আমাকে ফেরত দেয়া হোক। আবরাহা বলল, আমি আপনাকে দেখে তো বড়ই প্রভাবিত হয়েছিলাম।[১১]

কিন্তু আপনি নিজের উটের দাবী জানালেন, অথচ এই যে ঘরটা আপনার ও আপনার পূর্ব পুরুষদের ধর্মের কেন্দ্র, সে সম্পর্কে কিছুই বলছেন না, আপনার এ বক্তব্য আপনাকে আমার দৃষ্টিতে মর্যাদহীন করে দিয়েছে। তিনি বললেন আমি তো কেবল আমার উটের মালিক এবং সে গুলোর জন্য আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আর এই ঘর। এর একজন মালিক, রব ও প্রভু আছেন। তিনি নিজেই এর হেফাযত করবেন। আবরাহা জবাব দেয় তিনি একে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আবদুল মুত্তালিব বললেন, এ ব্যাপারে আপনি জানেন ও তিনি জানেন। একথা বলে তিনি সেখান থেকে উঠে পড়েন। আবরাহা তাকে তার উট গুলো ফিরিয়ে দেয়। [১২]

১১। হিফযুর রহমান, খ. ৪, পৃ. ১১৭

১২। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

Dhaka University Institutional Repository

ইব্ন 'আব্বাস (রা.) ভিন্ন ধরনের বর্ণনা পেশ করেছেন। তাঁর বর্ণনায় উট দাবীর কোন কথা নেই, আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনুল মুনযির ইব্ন মারদুইয়া, হাকেম, আবু নুআইম ও বায়হাকী তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন তাতে তিনি বলেন আবরাহা আসসিফাই (আরাফাত ও তায়েফের পাহাড় গুলোর মধ্যে হারম শরীফের সীমানার কাছাকাছি একটি স্থানে পৌছে গেলে আব্দুল মুত্তালিব নিজেই তার কাছে যান এবং তাকে বলেন, আপনার এখানে আসার কি প্রয়োজন ?

আপনার কোন জিনিসের প্রয়োজন থাকলে আমাদের কাছে বলে পাঠাতেন। আমরা নিজেরা সে জিনিস নিয়ে আপনার কাছে পৌছে যেতাম। জবাবে সে বলল, আমি শুনেছি এটা নিরাপত্তা ও শান্তির ঘর। আমি এর শান্তি ও নিরাপত্তা খতম করতে এসেছি। আবদুল মুত্তালিব বলল এটি আল্লাহর ঘর। আজ পর্যন্ত এটির উপর কাউকে চেপে বসতে দেননি। আবরাহা বলল, আমি একে বিধ্বস্ত না করে এখান থেকে সরে যাবো না। আবদুল মুত্তালিব বলেন, আপনি যা কিছু চান আমাদের কাছ থেকে নিয়ে চলে যান। কিন্তু সে অস্বীকার করে, আবদুল মুত্তালিবকে পেছনে রেখে সে তার সেনাবাহিনী নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। [১৩]

কাবা রক্ষায় মক্কা বাসীদের আল্লাহর নিকট ধর্ণা

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, আবরাহা সেনা দলের কাছ থেকে ফিরে এসে আবদুল মুত্তালিব কুরাইশদেরকে বললেন, নিজেদের পরিবার পরিজন নিয়ে পাহাড়ের উপর চলে যাও এভাবে তারা ব্যাপক গনহত্যার হাত থেকে রক্ষা পাবে। তারপর তিনি ও কুরাইশদের কায়েকজন সর্দার হারাম শরীফে হাজির হয়ে যান। তারা কাবার দরজার কড়া ধরে আল্লাহর কাছে দো'আ করতে থাকেন, তিনি যেন তার ঘর ও তার খাদেমদের হেফাজত করেন। সে সময় কাবা ঘরে ৩৬০ মূর্তি ছিল। কিন্তু এই সংকট কালে তারা এই মূর্তিগুলোর কথা ভুলে যায়। তারা একমাত্র আল্লাহর কাছে প্রার্থণা করার জন্য হাত উঠায়। ইব্ন হিশাম তার সীরাত গ্রন্থে আবদুল মুত্তালিবের নিম্নোক্ত দো'আর কবিতা সমূহ উদ্ধৃত করেছেন ঃ

"হে আল্লাহ! বান্দা নিজের ঘর রক্ষা করে তুমি তোমার ঘর রক্ষা কর । আগামীকাল তাদের ক্রুশ ও তাদের কৌশল যেন তোমার কৌশলের উপর বিজয় লাভ না করে। যদি তুমি ছেড়ে দিতে চাও তাদেরকে ও আমাদের কিবলাকে তাহলে তাই কর যা তুমি চাও।[১৪]

সুহাইলী "রওযুল উনুক " গ্রন্থে নিম্নোক্ত কবিতাটি উদ্ধৃত করেন ঃ

"ক্রুশের পরিজন ও তার পুঁজারীদের মোকাবিলায় আজ নিজের পরিবারকে সাহায্য করো" ।[১৫]

১৩। হিফযুর রহমান, খ. ৪, পৃ. ১১৯

১৪। উদ্ধৃত, ইব্ন হিশাম থেকে ঃ (মূল আরবী).

لاهم ان العبد يمنع رحلة فامنع حلاطك لايغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك ـ ان كنت تاركهم وقبلتنا فامر مابدا لك ـ

১৫। উদ্ধৃত, ইব্ন হিশাম, (মূল আরবী) : وانصر على ال الصليب وعابديه اليوم الك ـ

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল মুত্তালিব দো'আ করতে করতে যে, কবিতাটি পড়ে ছিলেন ইব্ন জরীর সেটিও উদ্ধৃত করেছেন। সেটি হচ্ছে ঃ

" হে আমার রব! তাদের মোকাবিলায়
তুমি ছাড়া কারো প্রতি আমার আশা নাই,
হে আমার রব! তাদের হাত থেকে
তোমার হারমের হেফাজত কর
এই ঘরের শত্রু তোমার শত্রু
তোমার জনপদ ধ্বংস করা থেকে
তাদেরকে বিরত রাখো। [১৬]

এ দো'আ পাঠ করার পর আবদুল মুত্তালিব ও তাঁর সাথীরা পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। পরদিনই আবরাহা তার বাহিনী নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করার জন্য এগিয়ে আসে। [১৭]

১৬। উদ্ধৃত, ইব্ন হিশাম, (মূল আরবী) :

يارب لا ارجوالهم سواكا ـ يارب قامنع منهم حماكا ـ
ان عدوا البيت من غداكا ـ امنعهم ان يخربوا قراكا ـ

১৭। হিফযুর রহমান, খ. ৪, পৃ. ১২০

Dhaka University Institutional Repository

আসহাবুল ফীলের শেষ পরিণতি

আবদুল মুত্তালিব ও সমস্ত কুরাইশ গোত্রের লোকেরা মক্কা ত্যাগ করে নিকটস্থ পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন এবং অবস্থা কি ঘটে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরবর্তী দিন ভোরে আবরাহা নিজের সেনাবাহিনীকে মক্কার দিকে অগ্রসর করল। প্রথম সারিসমূহে হস্তিবাহীনী ছিল এবং হইার পিছনে ছিল বিরাট পদাতিক বাহিনী ।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইব্ন আবী হাতেম ওবাইদ ইবন উমাইর রেওয়ায়াতে বর্ণনা করেন যে, যখন আবরাহার সেনাবাহিনী মক্কার দিকে অগ্রসর হল তখন প্রচন্ড বায়ু প্রবাহিত হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের দিক হতে পাখির ঝাঁক উড়ে এসে আবরাহার বাহিনীর উপর ছেয়ে গেল। যেন শুণ্যমন্ডল পাখিদের বিরাট সেনা বাহিনী সারির পর সারি বেঁধে রইলো। তাদের মুখে ও উভয় পাজায় প্রস্তর খন্ড ছিল। তারা প্রথমে শব্দ করল, অতঃপর আবরাহার সেনাবাহিনীর উপর প্রস্তরখন্ড নিক্ষেপ করতে লাগল। যার উপর এ প্রস্তর খন্ড পড়ত সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ গলে যেতে থাকত। মুহাম্মদ ইসহাক ও ইকরামার বর্ণনা, ইহা ছিল বসন্ত রোগ এবং আরব দেশে এ বছরই বসন্ত রোগ দেখা যায়।

ইব্ন 'আব্বাসের মতে, যার উপরই এ পাথর কণা পড়তো, তার সারা গায়ে ভীষণ চুলকানি শুরু হত এবং চুলকাতে চুলকাতে চামড়া ছিড়ে গোশত ঝড়ে পড়তে থাকত। ইব্ন 'আব্বাস তাঁর অপর বর্ণনায় বলেন, গোশত ও রক্ত পানির মত ঝড়তে থাকতো এবং হাড় বের হয়ে পড়তো আবরাহা নিজেও এ অবস্থার সম্মুখীন হয়। তার শরীর থেকে টুকরো টুকরো গোশত খসে পড়তো এবং সেখান থেকে রক্ত ও পুঁজ ঝড়ে পড়তে থাকতো। বিশৃংখলা ও হুড়ো হুড়ি ছুটাছুটির মধ্যে তারা ইয়ামানের দিকে পালাতে শুরু করে। খাশ্আম এলাকা থেকে যে নুফাইল ইবন হাবীব খাশআমীকে তারা পথ প্রদর্শক হিসেবে নিয়ে আসে তাকে খুজে পেয়ে সামনে নিয়ে আসা হয় এবং তাকে ফিরে যাবার পথ দেখিয়ে দিতে বলা হয়। কিন্তু সে সরাসরি অস্বীকার করে বসে। সে বলে,

"এখন পালাবার জায়গা কোথায়
যখন আল্লাহ নিজেই করেছেন পশ্চাদ্ধাবন ?
আর নাক কাটা আবরাহা পরাজিত
সে বিজয়ী নয়" ।[১৮]

এই পলায়ন তৎপরতার মধ্যে লোকেরা পথে ঘাটে এখানে সেখানে পড়ে মরতে থাকে। আতা ইবন ইয়াসার বর্ণনা করেছেন। তখনই সবাই একসাথে মারা যায় নি। বরং কিছু লোক সেখানে মারা পড়ে আর দৌড়াতে দৌড়াতে কিছু লোক পথের উপর পড়ে যেতে থাকে। এভাবে সারাটা পথে তাদের লাশ বিছিয়ে থাকে। আবরাহাও খাসআম এলাকায় পৌছে মারা যায়। [১৯]

১৮। উদ্ধৃত, ইব্ন হিশাম, (মূল আরবী) :

ابن المفرو الا له الطالب ـ والاشرم المغلوب ليس الغالب ـ

১৯। হিফযুর রহমান, খ. ৪, পৃ. ১২১

Dhaka University Institutional Repository

মহান আল্লাহ হাবশীদেরকে শুধু মাত্র শারীরিক শাস্তি দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং চার বৎসরের মধ্যে ইয়ামানের উপর থেকে হাবশী কৃর্তত্ব পুরোপরি খতম করে দেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় হাতির ঘটনার পর ইয়ামনে তাদের শক্তি সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়ে। বিভিন্ন স্থানে ইয়ামনী সরদাররা বিদ্রোহের ঝান্ডা উড়াতে থাকে। সাইফ ইব্ন খী- ইয়াযান নামক একজন ইয়ামনী সরদার ইরানের বাদশাহর কাছ থেকে সামরিক সাহায্য গ্রহণ করে ছয়টি জাহাজে চড়ে ইরানের একহাজার সৈন্য ইয়ামানে অবতরণ করে এবং খুব সহজে ৫৭৫ খৃষ্টাব্দে ইরান ইয়ামান থেকে হাবশী শাসনের অবসান ঘটিয়ে ইয়ামানকে ইরানের অন্তর্ভূক্ত করে নেন।[২০]

আবরাহার উপর শাস্তির স্থান

মুযদালিফা ও মিনার মধ্যে অবস্থিত মহাসাব উপত্যকার সন্নিকটে মুহাস্‌সির নামক স্থানে এ ঘটনাটি ঘটে। ইমাম মুসলিম (রহ.) ও ইমাম দাউদের বর্ণনা অনুযায়ী রাসূল (সা.)-এর বিদায় হজ্জের যে ঘটনা ইমাম জাফর সাদেক তার পিতা ইমাম বাকের থেকে এবং তিনি হযরত জাবের ইব্ন আবদুল্লাহ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, তাতে তিনি বলেন, রাসূল (সা.) যখন মুযদালিফা থেকে মিনার দিকে চলেন তখন মুহাসসির উপত্যাকায় তিনি চলার গতি দ্রুত করে দেন। ইমাম নববী (র.)-এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আসহাবে ফীলের ঘটনা এখানেই অনুষ্ঠিত হয়। তাই এই জায়গাটা দ্রুত অতিক্রম করা সুন্নাত। মুআত্তা ইমাম মালিক রেওয়ায়াত করেছেন, রাসূল (সা.) বলেন, মুযদালিফার সমগ্র এলাকাই এর অবস্থান স্থল, ইব্ন ইসহাক নুফাইল ইব্ন হাবীবের যে সব কবিতা উদ্ধৃত করেছেন তাতে এই ঘটনার প্রত্যক্ষ বিবরণ এভাবে পেশ করা হয়েছে।

"হায় যদি তুমি দেখতে হে রুকাইনা
তবে তুমি দেখতে পাবে না যা কিছু দেখেছি আমি মুহাসসাব উপত্যকার কাছে।
আল্লাহর শুকর করছি আমি
যখন দেখেছি পাখিদের কে
শংকিত হচ্ছিলাম বুঝিবা পাথর ফেলে মোদের উপর
নুফাইলের সন্ধানে ফিরছিল তাদের সবাই আমি যেন হাবশীদের ঋণের দায়ে বাঁধা।[২১]

২০। হিফযুর রহমান, খ. ৪, পৃ. ১২২

২১। উদ্ধৃত, ইব্ন হিশাম, (মূল আরবী) :

ردينه رورأيت ولا تريه - لدى جنب المحصب ما رأينا حمت الله اذا بصرت الطيرا - وخفت حجارة تلقى علينا وكل القوم يسأل عن تفيل - كان على للجشان دينا -

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সার্বিক পর্যালোচনা, শিক্ষা ও করণীয়

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সার্বিক পর্যালোচনা, শিক্ষা ও করণীয়

সার্বিক পর্যালোচনা

ক) বস্তুতান্ত্রিক চিন্তা

আল-কুরআনে আলোচিত জাতিসমূহ বস্তুতান্ত্রিক চিন্তা ও মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হত। আ'দ, সামুদ সহ সকল জাতি-গোষ্ঠি শুধু জাগতিক উন্নতি নিয়েই পুরোপুরি ব্যতিব্যস্ত থাকত। হিসেব-নিকেশের দিনকে একে বারে ভুলে গিয়ে জীবন কাটাত।[১]

পবিত্র কুরআনের ঘোষণাঃ

"তোমরা কি প্রত্যেক উচ্চস্থানে তামাশার জন্য স্তম্ব (নিদর্শন) প্রস্তুত করছ? এবং বড় বড় ঘর বানিয়ে তোমরা উহাতে চিরদিন থাকবে মনে করছ? এবং যখন তোমরা জবরদস্তি কর,তখন অত্যন্ত অত্যাচারী হয়ে যাও।"[২]

আরবের অতিক্রান্ত জাতিসমূহ তাদের ধন-সম্পদ ও উন্নতির প্রভাবে আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনকে ভুলে গিয়েছিল। তারা ধারণা করত, তাদের শক্তির উর্ধ্বে এমন কোন শক্তি নেই, যিনি তাদের যাবতীয় কাজ কর্মের হিসাব-নিকাশ নিবেন। এটাই ছিল তাদের ধ্বংসের অন্যতম কারণ।[৩]

অনন্ত জীবনকে সম্পূর্ন ভুলে গিয়ে শুধু এই জীবনের জন্যই নিজেকে সম্পূর্ন রূপে নিমগ্ন করে দেওয়ার পরিণতি এই জীবনের উন্নতি ও শান্তির পক্ষে মারাত্মক হয়ে দাড়ায়।[৪]

১। ড. মাযহার উদ্দিন ছিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

২। أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ . وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ . وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ .

আল-কুরআন, ২৬ : ১২৮-১৩০

৩। ড. মাযহার উদ্দিন সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

ক) অহংকার ও দাম্ভিকতা

কুরআনের বর্ণনানুসারে উল্লেখিত জাতিসমূহ ছিল স্ব-স্ব যুগে প্রবল শক্তিশালী জাতি। তারা দুনিয়াতে অযথা অহংকার করত এবং নিজেরাই নিজেদেরকে শক্তিশালী হিসেবে সাবস্ত করত। এই রূপে আ'দ জাতি অহংকার করে বলতঃ "আমাদের চেয়ে শক্তিতে অধিক শ্রেষ্ঠ কে আছে? [৬]

আ'দ জাতির নবী হযরত হুদ (আঃ) তাদের স্মরণ করে দিয়েছিলেন যে, "আল্লাহ তাদেরকে কিছু দান করেছেন, তজ্জন্য গর্ব করার কিছুই নেই বরং সে কারণে আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞ থাকাই বাঞ্চনীয়। তার প্রতি তোমরা তোমাদের কর্তব্য পালন কর যিনি তোমাদেরকে (শিখিয়েছেন) যা কিছু তোমরা জেনেছ। পশু ও সন্তান-সন্ততিকে দিয়ে তোমাদের সাহায্য করেছেন আর করেছেন বাগ-বাগিচা ও ঝরণা সমূহ দিয়ে।"[৭]

ইহাতে অনুমান করা করা যেতে পারে যে, ধন-সম্পদ, উন্নতি এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞানের ফলশ্রুতির সাময়িক ও অর্থনৈতিক শক্তি, যা সমাজের নৈতিক কাঠামো ও অধ্যাত্মিক শক্তিকে বিনষ্ট করে দেয়, যদি তার সাথে একটি গভীর অবচেতনা না জন্মে যে, এই সমস্ত কিছুর উৎস হলো মানুষ ও প্রকৃতির উর্ধ্বে অন্য কেউ অর্থাৎ ঐশ্বরিক সত্তা রয়েছে, যার আইনের প্রতি মানুষের অবশ্যই আত্মসমর্পন করা উচিত এবং যার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ধারণা মানুষের মধ্যে এরূপ একটি সৃষ্ট ভাব এবং নমনীয় অনুভূতির জন্ম দেবে যার ফলে তার মধ্যে সমাজের অন্যান্য সদস্যের প্রতি পরস্পরিক ভালাবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধের উদয় হবে। [৮]

৬। من اشد منا قوة .

আল-কুরআনা, ৪১ : ১৫

৭। واتقوا الله واطيعون . واتقوا الذى امدكم بما تعلمون . امدكم بانعام وبنين وجنت وعيون .

আল-কুরআন, ৪১ : ১৩২-১৩৪

৮। ড. মাযহার উদ্দিন সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

আল-রাযী বলেন, যে, ধন-সম্পদ থেকে দারিদ্র্যই শ্রেষ্ঠ, কেননা, অতিরিক্ত ধন-সম্পদের প্রত্যক্ষ ফল হচ্ছে দুনিয়ার ক্ষমতা ও সম্মান লাভের জন্য অত্যধিক বাসনা এবং অপরকে ঘৃণা করা এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বোধ ও অহংকারের অনুভূতির উদ্রেক করা। এ সমস্ত জিনিসের অভাব থেকেই ঘৃণিত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অতএব, আল্লাহ ইহা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, অতিরিক্ত ধন-সম্পদ দুনিয়ার ক্ষমতা ও সামাজিক মর্যাদা অবিশ্বাস,অস্বীকার এবং অহংকারের পথে মানুষকে পরিচালিত করে, অন্য দিকে সম্পদ ও সম্মানের অভাব অন্য দলকে বিশ্বাস ও আনুগত্যের পথে পরিচালিত করে।[৯]

গ) মাপে ওজনে কম দেওয়া ও কৃত্রিম উপায়ে পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করা

আল-কুরআনে আলোচিত জাতিসমূহের মধ্যে বিশেষত শু'আইব (আঃ) এর জাতি ওজনে কম ও কৃত্রিম উপায়ে পণ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করে সাধারণ জনগণকে কষ্ট দিত। মহান আল্লাহ শু'আইব (আ.) এর মাধ্যমে তাদের উক্ত অপকর্ম থেকে বিরত থাকার জোড় আহ্বান জানান। কুরআনের ভাষায়ঃ

"এবং মাদাইয়ান জাতির নিকট তাদের ভাই শু'আইবকে পাঠিয়ে ছিলাম। সে বলেছিল হে আমার লোকেরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ভিন্ন তোমাদের আর কোন মাবুদ নেই এবং মাপে-ওজনে কম দিও না। আমি তোমাদের ভাল অবস্থায় দেখছি। কিন্তু আমি তোমাদের সম্বন্ধে এমন এক দিনের শাস্তির ভয় করছি যেদিন তোমাদেরকে ঘিরে ধরবে (আযাব)। আর হে আমার কাওম! ওজনে মাপে ঠিক ঠিক দিও এবং লোকদিগকে তাদের পাওনা কম দিও না এবং দুনিয়াতে উপদ্রব করে বেড়াইও না। যদি তোমরা মু'মিন হও, তবে আল্লাহর দেয়া সম্পদই তোমাদের জন্য উত্তম। অবশ্যই আমি তোমাদের পাহাড়াদার নই। তারা বলল,"হে শু'আইব! তোমার ধর্ম কি তোমাকে আদেশ করে যে, আমাদের বাপ-দাদাগণ যাদের ইবাদত করত আমরা তাদেরকে বাদ দেব এবং আমাদের ইচ্ছামত ধনের ব্যবহার করব না? নিশ্চয় তুমি তো বেশ ধৈর্যশীল ও উত্তম। [১০]

৯। আল-রাযী, *মাফাতিহ আল-গায়েব,* কায়রো:১৩০৭হি. ৪. ২৫২

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ . وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ . بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ . قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ .

আল-কুরআন, ১১ : ৮৪-৮৭

Dhaka University Institutional Repository

"আর মাদইয়ানবাসীদের নিকট তাদের ভাই শু'আইবকে পাঠিয়েছিলাম, সে বলল "হে আমার ভাই সকল! একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন প্রভু নেই। তোমাদের নিকট তোমদের প্রভুর নিকট হতে স্পষ্ট দলিল এসেছে। অতএব, পুরোপুরি দাও মাপ ও ওজন এবং কম দিও না লোকদের জিনিস এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার পর দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টি করো না। তাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা মু'মিন হও। আর তোমরা পথে পথে বসে থেকো না ভয় দেখাতে ও আল্লাহর পথ থেকে এমন লোককে বাঁধা দিতে, যে ঈমান আনে এবং উহাতে তোমরা দোষ-ত্রুটি খুঁজতেছ ! আর মনে রেখো, যখন তোমরা কম ছিলে এবং পরে কিভাবে তোমাদেরকে অধিক করে দিয়েছেন। আর দেখ দুষ্ট লোকদের পরিণাম কি হয়েছিল।" [১১]

আল-রাযী মন্তব্য করেছেন, যে, শু'আইব তাদেরকে ওজনে কম দেয়া ও কৃত্রিম উপায়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সর্তক করে দিয়ে বলেন, "তোমরা ওজনে কম দেয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ কর নতুবা আল্লাহ তা'আলা যে সুখ-শান্তি দান করেছেন তা তিনি কেড়ে নিয়ে যাবেন। দ্বিতীয়ত ইহার অর্থ এরূপ হতে পারে যে, যেহেতু আল্লাহ তোমাদের এত ভাল করেছেন যে, তোমাদেরকে সস্তায় জীবন-যাপন, প্রচুর জিনিসপত্র ও ধন-সম্পদ দান করেছেন, অতএব লোকদেরকে ওজনে কম দেওয়ার অভ্যাস রপ্ত করা তোমাদের কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহর দেয়া জিনিসই তোমদের উত্তম"। এই আয়াতের অর্থ আল-রাযী এইভাবে করেছেন যে, ক্রেতাদেরকে মাপে-ওজনে পুরোপুরি দেওয়ার পর আল্লাহ তোমাদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে যা দান করেছেন তা লোকদের মালামাল লুণ্ঠন করা ওজনে কম দেয়ার চেয়ে অনেক উত্তম। [১২]

ইব্ন আব্বাসের বরাত দিয়ে ইব্ন আসাকীর বলেছেন যে, যখনই কোন অপরিচিত লোক তাদের বাড়ীতে আসত তারা তার নিকট থেকে তার দিরহামসমূহ নিয়ে যেত এবং বলত যে, এগুলো জাল মুদ্রা। তারপর তারা তার নিকট থেকে বাট্টা কাটত এবং কম দামে তার নিকট থেকে কিনে নিয়ে তার অনেক ক্ষতি করত। খাদ্যশস্য কেনার জন্য মানুষ তাদের শহরে আসত। রাস্তার পাশে বসে থেকে তারা তা লুট করে নিয়ে যেত। [১৩]

১১। وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ .

আল-কুরআন, ৮৫ : ৮৫-৮৬

১২। আল-রাযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

১৩। আস-সূয়ূতী, *আল-দুর-মানসুর,* কায়রো:মাতবাআ হিজাবী. ১৩১৪হি., ৩ : ৩৪৬-৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমত ইহা পরিষ্কার যে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে তাদের ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় প্রচন্ডভাবে মুনাফা শিকারী হয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন প্রকার অপকৌশলের আশ্রয় নিয়ে তারা ক্রেতা সাধারণকে ভীষণভাবে অসুবিধায় ফেলেদিত। এ সমস্তের মধ্যে কুরআন দু'টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছে যথা মাপ ও ওজনের ক্ষেত্রে তারা অসাধু ছিল, যেহেতু তারা ক্রেতাদেরকে মাপে-ওজনে কম দিত। ক্রেতারা তার টাকার পূর্ণমূল্য পেত না। কুরআনে বলা হয়েছে , "অতএব মাপ ও ওজনে পুরোপুরি দাও।" আরো সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, "তোমরা ওজনে ও মাপে ঠিক ঠিক দিও এবং লোকদেরকে তাদের পাওনা কম দিও না।" ইহা কোন সাধারণ হুশিয়ারী থেকে অনেক ব্যাপক এবং শিল্প ও ব্যবসা ক্ষেত্রে সবরকম অসদচারণই ইহার অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণ স্বরূপ মুনাফাখোরীর মাধ্যমে মানুষকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পূর্বে তারা যে পরিমাণ জিনিস কিনতে পারত, সেই পরিমাণ থেকে বঞ্চিত করা হয়। কারণ এ অবস্থায় ক্রয় ক্ষমতা কমে যায়, যদি তাদের আয় একই অনুপাতে বৃদ্ধি না পায় এবং বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভবনা একান্তই বিরল। যেহেতু একান্ত আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও বিশ্বে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে সাধারণ মানুষের আয় বৃদ্ধি একই হারে সম্ভব হয় না। এই সমস্ত কাজই ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাদের একটি সাংঘাতিক অসাধুতারই প্রকাশ মাত্র এবং ইহা তাদের অন্যান্য ক্ষেত্রের আচরণকেও প্রভাবিত করতে পারে। কারণ যদি কোন লোক জীবনে একটি ক্ষেত্রে অসাধু হতে পারে তবে উহা খুবই সম্ভব যে, সে অন্যান্য ক্ষেত্রে অসাধুতার আশ্রয় গ্রহণ করবে। মানুষের নৈতিক জীবন একটি অবিচ্ছিন্ন ক্ষেত্র। অতএব, যদি নৈতিক অধঃপতন মানুষের চরিত্রের একটি দিককে গ্রাস করে, তবে খুব সম্ভব যে ইহা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়বে। কারণ ইহা একটি ভুল ধারণা যে, ব্যবসায়িক নৈতিকতা বলতে কোন বস্তু আছে যাকে মানুষের নৈতিক জীবনের ক্ষেত্র থেকে একেবারে আলাদা করা যেতে পারে। [১৪]

মাপে ওজনে কম দেওয়া, কৃত্রিম উপায়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করা, মওজুদদারী করা, মানুষকে চরমভাবে কষ্ট দেয়। অধুনা সারা বিশ্বে ব্যবসায়িক এ অসাধুতা সাধারণ মানুষকে ভাবিয়ে তুলছে। এজন্যই মহান আল্লাহ মানুয়ের এহেন কল্যাণের কথা চিন্তা করে মাপে ওজনে কম দেওয়া কৃত্রিম উপায়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটানোকে হারাম ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ বলেনঃ

"মাপে ওজনে পূর্ণকর, এবং মানুষকে তাদের দ্রব্যাদির কম দিও না।" [১৫]

ঘ) অন্ধ অনুসরণ করা

আল-কুরআনে আলোচিত বিভিন্ন জাতির চরিত্রে আর যে, গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে তা হলো তারা ধর্মের ব্যাপারে তাদের বাপ-দাদাদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করত এবং উপাসনা ও বিশ্বাসের ব্যাপারে একটি উন্নতমানের ধর্মবিশ্বাস অনুসরণ করার জন্য তাদের রাসূলের আহ্বানে তারা কর্নপাতও করেনি।"[১৬]

১৪। ড. মাযহার উদ্দিন সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫-৬৬

১৫। فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
আল-কুরআনা, ৭ : ৮৫ (আয়াতাংশ)।

১৬। ড. মাযহার উদ্দিন সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

তারা এ বলে মন্তব্য করত, "তোমার ধর্ম কি তোমাকে আদেশ করে যে, আমাদের বাপ-দাদাগণ যাদের ইবাদত করত, আমরা তাদেরকে বাদ দেব এবং আমাদের ইচ্ছা মত অর্থের ব্যবহার করব না?" [১৭]

নূহের জাতির মত কাওমে আ'দ ও কাওমে সামুদ স্ব-স্ব নবী-রাসূলগণের আহ্বানে আল্লাহর 'ইবাদতের পরিবর্তে ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুস, নাসর, হাতার, ও ছাদা নামের মূর্তির উপাসনা করত। [১৮]

আস-সুয়ূতীর মতে, আল-কুরআনে উল্লেখিত জাতিসমূহের নবী-রাসূলগণ তাদেরকে মূর্তি পূজা ও অন্যায়-অত্যাচার ও নির্যাতন থেকে বিরত থাকতে আহ্বান করেছিলেন। তাদেরকে কোন বিশেষ প্রার্থণা করা ও বিধিবদ্ধ আইন মেনে চলতে বলেননি। তারপর তাদের নবীগণকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং শক্তি ও ক্ষমতার অহংকারে গর্বিত ছিল। একই সময়ে তারা দেশের মধ্যে বির্শঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং লোকজনকে অবদমিত করে দেয়। [১৯]

ঙ) অভিন্ন দ্বীনের দাওয়াত

আল-কুরআনের দাওয়াতী কার্যক্রমে যে বক্তব্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে , তা হচ্ছে প্রত্যেক নবী ও রাসূলদের দ্বীন ছিলো এক এবং তারা প্রত্যেকে একই দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। আবার প্রত্যেক নবীর জাতি যারা একমাত্র দ্বীনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে মনে হয় তা একই সুতোয় গাঁথা। নবীগণ যখনই এসেছেন তখনই সেই বিভিন্ন গোষ্ঠির মোকাবিলা করতে হয়েছে। আল-কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় সেসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। কিন্তু সেই পুনরাবৃত্তির মধ্যেও এক ধরনের শৈল্পিক সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে মনে হয়ে এরা ভিন্ন ভিন্ন জাতি নয়, বরং একই জাতি। তদ্রুপ মিথ্যে প্রতিপন্নকারীরাও দীর্ঘ সময় ও অবস্থার ব্যবধানেও মনে হয় সকলে একই মানসিকতার অধিকারী। প্রত্যেক নবী এসেছে এবং কালিমার দাওয়াত দিয়ে পৃথিবী থেকে চলে গেছেন। আর গোমরাহ মানুষগুলো সবসময়ই তাদেরকে মিথ্যেবাদী বলেছে এবং তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে। [২০]

১৭। قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ.

আল-কুরআন, ১১ : ৮৭

১৮। হিফযুর রহমান, প্রগুক্ত, খ.১, পৃ. ৯২

১৯। আস-সূয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

২০। সাইয়্যেদ কুতুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩

Dhaka University Institutional Repository

নিচের আয়াতগুলো লক্ষ্য করুনঃ

"আমি নূহকে তার জাতির নিকট পাঠিয়েছি। সে বললো, হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আমি তোমদের জন্য এক মহাদিবসের শাস্তির ভয় করি। তাঁর জাতির সরদাররা বললো, আমরা তোমাকে সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। সে বললো, হে আমার জাতি ! আমি কখনো গোমরাহ নই, আমি তো রাব্বুল আলামিনের রাসূল। তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌছিয়ে দেই এবং তেমাদেরকে সদুপদেশ দেই। আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে সে সব জিনিস জানি, যা তোমরা জানো না। তোমরা কি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছ এই কারণে যে, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদেরই একব্যক্তি উপদেশ নিয়ে এসেছে যাতে সে তেমাদের ভীতি প্রদর্শন করে। অতঃপর তারা তাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করল। আমি তাকে ও জাহাজের আরোহিদেরকে রক্ষা করলাম, আর যারা মিথ্যে প্রতিপন্ন করছিলো তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। নিশ্চয় তারা ছিল অন্ধ। [২১]

"আ'দ জাতির কাছে তাদের ভাই হুদকে পাঠিয়েছি। সে বললোঃ হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। তাঁর জাতির নেতৃত্ববৃন্দ বললঃ আমরা দেখছি তুমি একজন নির্বোধ, আর আমরা তোমাকে মিথ্যেবাদী মনে করি। তিনি বলল্লেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমি মোটেই নির্বোধ নই। বরং আমি রাব্বুল আলামিনের পয়গাম্বর। তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌছিয়ে দেই এবং আমি তোমাদের হিতাকাঙ্খী বিশ্বস্ত। তোমরা কি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছ এই কারণে যে, তোমাদেরই প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এবং তোমাদেরই একব্যক্তি উপদেশ নিয়ে এসেছে, যেন সে তোমাদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করে। তোমরা স্মরণ করো, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে নূহের জাতির পর নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং দেহাকৃতিও বৃদ্ধি করে দিয়েছেন"।[২২]

২১। لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ . قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ . قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ . أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ . أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ . فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ .
আল-কুরআন ৭ : ৫৯-৬৪

২২। وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ . قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ . قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ . أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ . أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

আল-কুরআন, ৭: ৬৫-৬৯

Dhaka University Institutional Repository

"তোমরা আল্লাহর নিয়ামতকে স্বরণ কর, যাতে তোমাদের মঙ্গল হয়। তারা বললো, তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছো, আমরা এক আল্লাহর ইবাদত করি এবং আমাদের বাপ-দাদা যাদের পূঁজা করত আমরা তাদেরকে ছেড়ে দেই? তাহলে তুমি যার ভয় আমাদেরকে দেখাচ্ছ তা নিয়ে এসো। যদি তুমি সত্যবাদী হও। তিনি বললেন, অবধারিত হয়ে গেছে তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে শাস্তি ও ক্রোধ। আমার সাথে ঐসব নাম সম্পর্কে কেন তর্ক করছো। যেগুলো তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখেছে। আল্লাহ এদের কোন মন্দ অবতীর্ণ করেননি। অতএব, তোমরা অপেক্ষা করো, আমি তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় রইলাম। অতঃপর আমি তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে রক্ষা করলাম এবং যারা আমার আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করতো তাদের মূল কেটে দিলাম। কারণ তারা বিশ্বাসী ছিল না।" [২৩]

"সামুদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভাই সালেহ (আঃ) কে পাঠিয়েছি। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ এসে গেছে। এটি আল্লাহর উটনী। অতএব, একে ছেড়ে দাও, আল্লাহর যমীনে চড়ে বেড়াবে। অসৎ উদ্দেশ্য একে স্পর্শও করবে না। নইলে তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির পাকড়াও করবে। স্মরণ করো, তোমাদেরকে আ'দ জাতির পর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠিকানা দিয়েছেন। তোমরা নরম মাটিতে অট্টালিকা নির্মাণ করো এবং পর্বত গা খোদাই করে প্রকোষ্ট নির্মাণ করো। অতএব, তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্বীকার করো এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। তাঁর সম্প্রাদায়ের দাম্ভিক নেতৃবৃন্দ দরিদ্র্য ঈমানদারকে জিজ্ঞেস করলোঃ তোমরা কি বিশ্বাস করো, সালেহ (আঃ)কে তাঁর পালনকর্তা প্রেরণ করেছেন? তারা বললো, আমরাতো তার আনীত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসী। অহংকারীরা বললো, তোমরা যে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছো আমরা তা বিশ্বাস করি না। অতঃপর তারা উটনীকে হত্যা করে ফেললো এবং স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করলো।

২৩। قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ . فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

আল-কুরআন ৭: ৭৫-৭৬

Dhaka University Institutional Repository

তারা আরো বললো, হে সালেহ! নিয়ে এসো তোমার সেই শাস্তি যার ভয় তুমি আমাদেরকে দেখাচ্ছো, তুমি যদি রাসূল হয়ে থাকো। অতঃপর তাদেরকে পাকড়াও করলো ভূমিকম্প। ফলে সকাল বেলায় নিজ নিজ গৃহে তারা মুখ থুবড়ে পড়ে রইল।" [২৪]

"আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শু'আইবকে প্রেরণ করলাম। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোন উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রমাণ এসে গেছে। অতএব, তোমরা মাপ-ওজনে পূর্ণকর এবং মানুষকে তাদের দ্রব্যাদি কম দিও না এবং ভূ-পৃষ্টে সংস্কার সাধন করার পর তাতে অনর্থ ঝগড়া সৃষ্টি করো না। এই হলো তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। তোমরা পথে-ঘাটে এ কারণে বসে থেকো না যে, আল্লাহর বিশ্বাসীদেরকে হুমকি দিয়ে আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করবে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করবে। স্মরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে আল্লাহ তোমাদেরকে অধিক করেছেন এবং লক্ষ্য কর কিরূপ অশুভ পরিণতি হয়েছে অনর্থকারীদের। আর যদি তোমাদের একদল ঐ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তবে ছবর কর যে পর্যন্ত, আল্লাহ আমাদের মধ্যে মীমাংসা না করে দেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসা কারী।" [২৫]

২৪। وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَـٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ . قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ . قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ . فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ . فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ .

আল-কুরআন ৭ : ৭৩-৭৮

২৫। وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ . وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ . قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ .

আল-কুরআন, ৭ : ৮৬-৮৮

Dhaka University Institutional Repository

"আপনি তাদের কাছে সে জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন, যখন সেখানে রাসূলগণ আগমন করেছিলেন। আমি তাদের নিকট দু'জন রাসূল প্রেরণ করেছিলাম। অতঃপর ওরা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, তখন আমি তাদেরকে শক্তিশালী করলাম তৃতীয় একজনের মাধ্যমে। তারা সবাই বলল, আমরা তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি। তারা বললোঃ তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ। রহমান আল্লাহ কিছুই নাযিল করেন নি। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলে যাচ্ছ। রাসূলগণ বললঃ আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। পরিষ্কার ভাবে আল্লাহর বাণী পৌছে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব। তারা বলল, আমরা তোমাদেরকে অশুভ অকল্যাণকর দেখছি। যদি তোমরা বিরত না হও তবে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রস্তর বর্ষনে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদেকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে। রাসূলগণ বললঃ তোমাদের অকল্যাণ তোমাদের সাথেই, এটাকি এজন্য যে, আমরা তোমাদেরকে সদুপদেশ দিয়েছি, বস্তুতঃ তোমরা সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায় বৈ নও।"[২৬]

আল-কুরআনের যেখানেই এ ধরনের দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে সেখানে সকল নবী-রাসূলের সাথে মিলে যায়। এ অবস্থা প্রত্যেক নবীর সময়েই চলেছে। চলতে চলতে অবশেষে মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত এসে পৌছেছে। কল্পনার চোখে আমাদের সামনে ভেসে উঠে সেই দৃশ্য কাফিরদের সামনে তিনি কালিমার দাওয়াত পেশ করেছেন ঠিক সেইভাবে, যেভাবে অতীতের নবী-রাসূলগণ পেশ করেছেন। এদিকে কাফিররা তাঁর সাথে সেই আচরণই করছে, যে আচরণ পূর্ব থেকে চলে আসছিল। নবী-রাসূলদের এ সমস্ত ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা গভীরভাবে চিন্তা করলে এর মধ্যে অবারিত সৌন্দর্য ও সুষমা দৃষ্টিগোচর হয়। [২৭]

কতিপয় শিক্ষণীয় বিষয়

আল-কুরআনে আলোচিত বিভিন্ন জাতির ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট নবী-পয়গাম্বরগণের জীবন কর্ম ও তাদের দাওয়াতের কার্যক্রম ও পদ্ধতিতে আজকের যুগের সাধারণ মুসলিম ও দাঈদের জন্য অসংখ্য উপদেশাবলী ও শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে। যা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করলে প্রকৃত ঈমানী দায়িত্ব পালন করা ও ইসলামী দাওয়াহকে ফলপ্রসু করা সম্ভব। যেমনঃ

২৬। إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ . قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ . قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ . وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ . قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ . قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ . وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ .

আল-কুরআন, ৩৬ : ১৪-২০

২৭। সাইয়্যেদ কুতুব : প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

Dhaka University Institutional Repository

ক) নিজের আমলের জন্য নিজেকেই জবাবদিহি করতে হবে

প্রত্যেকটি মানুষকে নিজের কার্যকলাপ ও আমলের জন্য নিজেকেই আল্লাহ পাকের দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। পিতার বুযুর্গ ও উচ্চ মর্যাদা দ্বারা পুত্রের পাপের প্রতিকার হতে পারে না এবং পুত্রের নেক আমল ও পরালৌকিক সৌভাগ্য পিতার অবাধ্যচারণের বিনিময় বা বদলাও হতে পারে না। নূহ (আঃ) এর নবুওত ও পয়গাম্বর পুত্র কেনানের কুফরের শাস্তি ঠেকাতে পারে নাই এবং ইব্রাহীমের পয়গাম্বরী ও উচ্চ মর্যাদা পিতা আযারের শির্কের জন্য মুক্তির কারণ হতে পারে নাই। [২৮]

كل يعمل على شاكلته . "প্রত্যেকে নিজ নিজ পদ্ধতিতে কাজ করবে"।[২৯]

খ) অসৎ সংসর্গ বিষের চেয়েও মারাত্মক

অসৎ সংসর্গ হল বিষের চেয়েও অধিক মারাত্মক। ইহার প্রতিফল, পরিণতি, অপমান, লাঞ্ছনা ও ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নহে, মানুষের জন্য নেক আমল যেমন অতিশয় জরুরী, তদপেক্ষা অধিক জরুরী নেককারদের সংসর্গ। পক্ষান্তরে মন্দকাজ হতে আত্মরক্ষা করা মানুষের জীবনের উজ্জল বৈশিষ্ট্য। তদপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় অসৎ সংসর্গ হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা।[৩০]

জনৈক কবি বলেছেনঃ "নূহের পুত্র পাপাচারীদের সাথে উঠাবসা করেছে ফলে সে নবী বংশের মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। নবী বংশে জন্ম লাভ করা কোন কাজে আসে নাই। আস্হাবে কাহফের কুকুর কিছুদিন নেককারদের সংসর্গ লাভ করে মানবের ন্যায় মর্যাদাশালী হয়ে গিয়েছে। নেককারদের সংসর্গ তোমাকে নেককার বানিয়ে দেয়। বদকারদের সংসর্গ তোমাকে বদকার বনিয়ে দেয়।"[৩১]

গ) আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরতার সাথে বাহ্যিক উপকরণের ব্যবহার তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নয়

আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভর ও ভরসা রাখার সাথে বাহ্যিক উপকরণের ব্যবহার তাওয়াককুল পরিপন্থী নহে। আল্লাহর উপর তাওয়াককুলের জন্য সঠিক কর্মপন্থা সেই কারণেইতো নূহের প্লাবণ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য নূহ (আ.)-এর নৌকার প্রয়োজন হয়েছিল।

২৮। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৬

২৯। আল-কুরআন, ১৭ : ৮৪ (আয়াতাংশ)

৩০। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৬

৩১। প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৬

Dhaka University Institutional Repository

ঘ) নবী-রাসূলগণ ত্রুটি-বিচ্যুতির উর্ধে নন

নবী-রাসূলগণ নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও মানবীয় স্বভাব সূলভ কারণে নবী-রাসূলগণের ত্রুটি বিচ্যুতি সংঘটিত হতে পারে কিন্তু তারা সে ত্রুটি বিচ্যুতির উপর স্থায়ী থাকেন না বরং আল্লাহ পাকের তরফ হতে তাদেরকে দূরে সরাইয়া লওয়া হয়। আদম (আ.)-এবং নূহ (আ.)-এর ঘটনাগুলো ইহার সঠিক সাক্ষ্য, এতদ্ভিন্ন তারা অদৃশ্য সংবাদ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের অধিকারী নহেন। যেমন এই ঘটনায় নূহ (আ.) কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন "আমার নিকট এমন বিষয়ের সুপারিশ করিও না যা সম্বন্ধে তুমি অবহিত নও।" [৩২]

ঙ) সত্যিকার দা'ঈরা বিরোধীদের ঠাট্টা-বিদ্রুপের পরওয়া করেন না

আল্লাহ পাকের মনোনিত মানব বা তাদের অনুসারীরা যখন কারো হিত কামনা করেন এবং বক্র পথের পথিকদের বক্রতা সোজা করার জন্য উপদেশ প্রদান করেন, তখন তারা অভ্যন্তরীণ চক্ষু ও দিলের অন্ধ লোকদের অর্থহীন উক্তি, ঠাট্টা-বিদ্রুপ এবং হীন প্রতিপন্ন করার কোনই পরোয়া করেন না। অন্তরে ব্যথা ও দুঃখ নিয়ে সত্য প্রচার হতে মুখ ফিরিয়ে নেন না। অসন্তুষ্ট হয়ে হিত কামনা করা ও নছীহত ত্যাগ করেন না বরং চরিত্র মাধূর্য, নম্রতা এবং দয়ার সহিত আধ্যাতিক রোগীদের চিকিৎসায় মশগুল থাকেন। আর তাঁদের এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অধিকতর স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য এই হয় যে, তিনি নিজের এই নছীহত ও হিত কামনার জন্য কাওম হতে মোটেই কোন রকমের স্বার্থের আকাংক্ষী না এবং তাঁর জীবন বদলা ও বিনিময়ের একেবারে উর্ধ্বে থাকে। [৩৩]

এই মর্মে নবী-রাসূলগণের প্রায় একই কথা, যা কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

"হে আমার কাওম ! আমি এ প্রচার কার্যের জন্য তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাচ্ছি না। আমার বিনিময় কেবল তারই নিকট রয়েছে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন।" [৩৪]

চ) সত্য প্রচারের পথে মন্দ ব্যবহারের বদলা সদ্ব্যবহারে দেয়া উত্তম

হযরত হুদ (আ.) এবং অন্যান্য আম্বিয়ায়ের এই রীতি একটি উত্তম আদর্শের যে, তাবলীগ এবং সত্য প্রচারের পথে মন্দ ব্যবহারের বদলা সদ্ব্যবহারে দেওয়া উত্তম। আর কর্কশ ও কঠোর কথার উত্তর মধুর বাণী দ্বারা পূর্ণ করা শ্রেয়। যেমনটা হযরত নূহ (আ.) হযরত হুদ (আ.) সহ সকল নবী-রাসূলগণ করেছিলেন। নূহ (আ.)-এর জাতিকে তাকে বলেছিল "নিঃসন্দেহে আমরা তোমাকে নির্বোধ দেখিতেছি, এবং নিঃসন্দেহে আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদীদের মধ্যে গণ্য করছি।" [৩৫]

৩২। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৭

৩৩। প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৯

৩৪। يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

৩৫। قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ .

আল-কুরআন, ৭ :৬৬

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু নূহ (আ.) তাদের উত্তরে কঠোর ভাষার পরিবর্তে নম্রভাষায় নিম্মোক্ত উত্তরটি প্রদান করেন-

"হে আমার জাতি ! আমি নির্বোধ নই, বরং আমি রাব্বুল আলামিনের তরফ হতে প্রেরিত রাসূল। তোমাদের নিকট আমার রবের পয়গাম পৌছিয়েছি, এবং আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্খী।" [৩৬]

ছ) কোন জাতিকে ধ্বংস করা আল্লাহর ইচ্ছা নয়

আল্লাহ পাকের নিয়ম এরূপ প্রচলিত রয়েছে যে, যদি তিনি কোন কাওমের হেদায়াতের জন্য তদীয় নবীকে প্রেরণ করেন এবং কাওম তার হিদায়াতের প্রতি কর্ণপাত না করে তবে ইহা জরুরী নয়, যে, সে কাওমকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। কিন্তু সেই কাওম নিজেদের নবীর নিকট এই ওয়াদার উপর মু'জিযা তলব করে যে, যদি তাদের বাঞ্ছিত মু'জিযা প্রকাশিত হয়ে যায় তবে তারা অবশ্যই ঈমান আনয়ন করবে, অতঃপর যদি তারা ঈমান আনয়ন না করে তবে সেই কাওমের ধ্বংস সুনিশ্চিত হয়ে যায় এবং আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করেন না। কিন্তু আমাদের নবী বিশ্বনবী মুহাম্মদ(সঃ) এর পয়গাম্বরী আল্লাহ তা'আলার এই নিয়মের উর্ধ্বে। কেননা মুহাম্মদ (সঃ) ফরমিয়েছেন, আমি আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনা করেছি, তিনি যেন আমার (বর্তমান ও ভবিষ্যতের) উম্মতদের উপর ব্যাপক আযাব নাযিল না করেন।" [৩৭]

আল্লাহ পাক তার এই দো'আ এই বলে মঞ্জুর করেছেনঃ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم

"হে রাসূল! আপনি তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকাকালে আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের উপর ব্যাপক আযাব নাযিল করবেন না।" [৩৮]

জ) দুনিয়ার স্বচ্ছল জীবিকা,আরামের যিন্দিগী ও দুনিয়াবী মান-মর্যাদা আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ্টির ফল নয়

ইহা একটি মারাত্মক ভুল ধারণা এবং নফসের ধোঁকা যে, মানুষ স্বচ্ছল জীবিকা, আরামের যিন্দিগী এবং দুনিয়াবী মান-মর্যাদা দেখে মনে করে যে সম্প্রদায়ের ও যে ব্যক্তির নিকট এ সমস্ত বিদ্যমান রয়েছে তারা অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার আশ্রয়ে রয়েছে। আর ইহাও যে, তাদের স্বচ্ছল জীবিকা এ কথার নিদর্শন যে, আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ ও সম্মতি তাদের সাথে রয়েছে।

৩৬। قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ . أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ .

আল-কুরআন, ৭ : ৬৭-৬৮

৩৭। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪১

৩৮। আল-কুরআন, ৮ : ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

এই ভুল ও ধোঁকা এই জন্য যে, সামুদ জাতির ঘটনাটিতে স্থানে স্থানে এরূপ বর্ণিত আছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত স্বচ্ছল জীবিকা ও অতিরিক্ত আরাম-আয়েশ আযাব ও ধ্বংসের পূর্বাভাস বলে সাব্যস্ত হয়ে থাকে সর্বপ্রকার পার্থিব সফলতা এবং আনন্দময় জীবনের সাথে যখন কুফর অবাধ্যতাচরণ এবং অহংকার কোন জাতির স্বতন্ত্র অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন মনে করবে যে, কাওমের ধ্বংসের সময় এসে পড়েছে। অবশ্য যদি এ সমস্ত শান্তি ও আনন্দময় জীবনের সাথে কাওমের অধিকাংশ লোক আল্লাহ পাকের শোকর আদায়কারী হয়, তাঁর বান্দাগণের সাথে সদাচারী হয় এবং পরস্পর নেক নিয়ত ও হিতাকাংখার উপর কাজ করতে থাকে। তবে নিঃসন্দেহে তারা আল্লাহ পাকের দরবারে প্রিয়। তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।[৩৯]

আর তাদের জন্য এ পার্থিব জিন্দেগী অসীম নেয়ামতের আলামত। যেমনঃ আল্লাহ পাক বলেন, "আল্লাহ তা'আলা ঐ সমস্ত লোকের সাথে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছে. যারা তোমাদের মধ্য হতে ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, এই মর্মে যে তাদেরকে যমীনের প্রতিনিধি দান করবেন। যেমন ঃ তাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতিনিধি বানিয়ে ছিলেন। আর তাদের জন্য তাদের দ্বীন ও ঈমান মজবুত করে দিবেন। যেরূপ তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন। আর তাদের ভয় ভীতিকে নিরপত্তায় রূপান্ত রিত করে দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না।"[৪০]

"আর নিঃসন্দেহে, আমি নসীহতের পর যাবুর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, যমীনের উত্তরাধিকারীত্ব আমার নেককার বান্দাগণ লাভ করবে।"[৪১]

এই আয়াতগুলো স্পষ্ট বর্ণনা করছে যে, শাসন ক্ষমতা ও রাষ্ট্র পরিচলনার অধিকার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রদানের ওয়াদা তাদেরই প্রাপ্য, যারা মু'মিন হয় এবং আল্লাহ পাকের আহকাম অনুযায়ী আমল করে "ছালেহীন" অর্থাৎ নেককার লোকদের সারিভুক্ত হয়। অর্থাৎ যাদের সামাগ্রিক জীবন এক সঙ্গে এই দু'টি গুণে গুণান্বিত তাদের জন্য নিঃসন্দেহে এই শাসন ক্ষমতা ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা আল্লাহর পুরষ্কার ও অনুগ্রহ। আর যদি এ গুণের অধিকারী না হয়, তবে শাসন ক্ষমতা ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য মু'মিন ও কাফিরদের কোন বৈশিষ্ট্য নাই।

৩৯। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪১-১৪২

৪০। وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

আল-কুরআন, ২৪ : ৫৫

৪১। وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ.

আল-কুরআন, ২১ : ১০৫

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তা'আলার হিকমত ও মুছলেহাতের প্রেক্ষিতে ইহা পার্থিব সরঞ্জামের আকারে চলন্ত ছায়া বটে। আর শাসন ক্ষমতা ও রাষ্ট্র পরিচলনার জন্য ইহা জরুরী নহে যে, ইহার প্রতি আল্লাহ পাকের সন্তোষ ও সম্মতি থাকবে।" [৪২]

ঝ) ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে পরিমাপ সঠিক বা পরিপূর্ণ করা

শু'আইব (আঃ)-এর জাতির আচরণ থেকে এ শিক্ষা পেয়ে থাকি যে, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে মাপে-ওজনে কম দেয়া একটি মারাত্মক অপরাধ। কেননা, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে অন্যের হককে পরিপূর্ণরূপে বুঝিয়ে না দেওয়া মানব জীবনে এমন একটি ব্যাধি সৃষ্টি করে দেয় যে, এ অসৎ স্বভাব বৃদ্ধি পেতে পেতে বান্দার সমুদয় হক নষ্ট করার স্বভাব জন্মিয়ে দেয়। এই রূপে মানব জাতির মর্যাদা এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করে লোভ- লালসা, স্বার্থপরতা, হীনতা, নীচতার মত নিকৃষ্ট স্বভাব সমূহের বাহক বানিয়ে দেয়।" [৪৩]

এজন্যই আল্লাহ পাক বলেছেনঃ "ধ্বংস ও বিনাশ ঐ সমস্ত লোকের জন্য যারা অন্য লোক হতে লওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় ওজন করে লয়, আর যখন নিজের জিনিস অন্যকে মেপে দেয় তখন মাপে-ওজনে কম মেপে দেয়।" [৪৪]

মাপে ও ওজনে ন্যায়নীতি অবলম্বন করা শুধু ক্রয়-বিক্রয় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নহে, বরং মানুষের যাবতীয় কার্যকলাপে এই পূর্ণতা গুণ থাকা আবশ্যক যে, আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর বান্দাগণের যাবতীয় হক এবং কর্তব্যে এই একটি নীতিকে মূলভিত্তি বানিয়ে লয়। কোন ক্ষেত্রে এবং কোন অবস্থাতেই ন্যায় ও ইনসাফের পাল্লাকে হাত ছাড়া করা যাবে না। ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে মাপে ওজনে কম না করা এবং ইনসাফ ঠিক রাখা যেন একটি মাপকাঠি। যে ব্যাক্তি মানব জীবনে সাধারণ লেনদেনের ব্যাপারে ইনসাফ ঠিক রাখে না, তার দ্বারা কি আশা করা যেতে পারে যে, সে ধর্মীয় ও পার্থিব ব্যাপারে ইনসাফ ও ন্যায়নীতিকে কাজে লাগাবে।

ঞ) ঈমানের মজবুতী আত্মত্যাগে প্রেরণা যোগায়

পূর্বে অতিক্রান্ত জাতির সমূহের নবী- রাসূলগণের অনুসারীদের আচরণে এটা সুনিশ্চিত হয়েছে যে, মানুষ যখন আল্লাহ তা'আলার উপর বিশ্বাস মজবুত করে লয় এবং ঈমানের সুমিষ্ট স্বাদ উপভোগ করতে থাকে, তখন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠ শক্তি এবং দুনিয়ার ভীষণ হতে ভীষণ অত্যাচারও তাকে সত্য ও সততা হতে পদস্খলিত করতে পারে না, এবং সে পর্বতের ন্যায় সুদৃঢ় হয়ে আত্মত্যাগের প্রতিমূর্তি প্রমাণিত হয়, যেমন আসহাবে উখদুদের ঘটনা ইহার জীবন্ত প্রমাণ।[৪৫] সকল নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের কার্যক্রম ও পদ্ধতিতে আজকের যুগের দা'ঈদের জন্য অসংখ্য উপদেশাবলী ও করণীয় বিষয় রয়েছে। যেমনঃ

৪২। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪২-১৪৩

৪৩। প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৫৭

৪৪। وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ . الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ . وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ .

আল-কুরআন, ৮৩ : ১-৩

৪৫। হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১১

Dhaka University Institutional Repository

কিছু করণীয় বিষয়

ক) নম্র ও উত্তম ব্যবহার

ইসলামী দাওয়াহর ক্ষেত্রে নম্র ও উত্তম ব্যবহারের গুরুত্ব অপরিসীম। নম্রতা দা'ঈকে মাদ'উদের নিকটবর্তী করে দেয় এবং তাদেরকে দ্বীন গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। আমাদের প্রিয় নবী ছিলেন এ গুণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। [৪৬]

কুরআনে এসেছে- "আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয়ের হয়েছেন। যদি আপনি দৃঢ় ও কঠিন হৃদয়ের হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেত। সুতরাং আপনি তাদের ক্ষমা করে দেন এবং তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করুন।" [৪৭]

খ) সুস্পষ্টভাবে দাওয়াত পেশ

দা'ঈকে সুস্পষ্টভাবে দাওয়াত দিতে হবে, কোন অস্পটতার ভাব-ছাপ থাকবে না। নবী-রাসূলগণ স্বজাতির নিকট এভাবে দাওয়াত দিতেন।" [৪৮]

আল্লাহ বলেনঃ আমি প্রত্যেক জাতির নিকট তাদের ভাষা সহকারে রাসূল পাঠিয়েছি যাতে করে তিনি সুস্পষ্টভাবে তাদের মাঝে বক্তব্য উপস্থাপন করেন।"[৪৯]

তাই নূহ (আঃ) বলেনঃ "নিশ্চয় আমি তোমদের সুস্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী।" [৫০]

প্রিয়নবী (সাঃ)ও সুস্পষ্ট ভাষায় কথা বলতেন, যাতে করে মাদউ'গণ বুঝতে ও অনুধাবন করতে সক্ষম হন।"[৫১]

৪৬। উদ্ধৃত, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা,* ঢাকা: ৪৫ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই, মে-২০০৩ খ্রী, পৃ. ১৯৭

৪৭। إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ .
আল-কুরআন, ৩ : ১৬০,

৪৮। ইসলামীক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

৪৯। وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ
আল-কুরআন, ১৪ : ৫

৫০। আল-কুরআন, ৭১: ২ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ

৫১। আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা, *সুনানে তিরমিযি,* শামায়েলে তিরমিযি, দিল্লি: মাকতাবাতে রশীদিয়া, তা.বি, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

গ) নিঃস্বার্থ ও একনিষ্ঠাভাবে দাওয়াত দান

দা'ঈকে নিঃস্বার্থভাবে দাওয়াত পেশ করতে হবে। এক্ষেত্রে দুনিয়ার কোন প্রকারের আশা করা যাবে না। একমাত্র আল্লাহর প্রতিদানের প্রত্যাশী হয়েই যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ দাওয়াতের মহান কাজ আন্‌জাম দিয়েছেন। এ মর্মে নূহ (আঃ) এর বক্তব্য পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছেঃ

"হে আমার সম্প্রদায়, আমি দাওয়াতের বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন সম্পদের প্রত্যাশী নই। আমি একমাত্র আল্লাহর প্রতিদানের প্রতীক্ষায় আছি।" [৫২]

হুদ (আ.) এর বক্তব্য কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে এভাবেঃ "আর আমি তোমাদের নিকট এ নছীহতের জন্য কোন উজরত চাই না। আমার উজরত তো কেবল বিশ্ব প্রতিপালকের নিকটে রয়েছে।"[৫৩]

ঘ) সৎকর্ম মুক্তির একমাত্র উপায়

প্রত্যেককে নিজ নিজ কৃতকর্ম ও কার্যকলাপের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এক্ষেত্রে পিতার বুযর্গী ও উচ্চ মর্যদা দ্বারা পুত্রের প্রতিকার হবে না এবং পুত্রের নেক আমল দ্বারা পিতা উপকৃত হবে না। এ বিষয়ে হযরত নূহ (আঃ) ও হযরত ইব্রাহীম (আঃ) প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ। সুতরাং সৎকর্মই একমাত্র মুক্তির গ্যারান্টি। [৫৪]

ঙ) মু'মিনের সংস্পর্শ লাভ

কোন কাফির যদি মু'মিনের সংস্পর্শে থাকে তাহলে তাতে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। যতক্ষণ না সে ব্যাক্তি মু'মিন হবে। ফলে নবীর স্ত্রী ও পুত্র হয়েও জাহান্নামের শাস্তির উপযোগী হতে পারে। সৎ সংঙ্গ মানুষকে পাপাচার থেকে দূরে রাখে এবং অসৎ সঙ্গ মানুষকে মন্দ কজে নিয়োজিত করে। অতএব, দা'ঈদের উচিত সর্বদা সৎলোকের সংস্রবে থাকা। হাদীসে আছেঃ "প্রতিটি লোক তার সাথেই মুক্তি পাবে যাকে সে ভালবাসে।" [৫৫]

৫২। وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ

আল-কুরআন, ১১ : ২৯

৫৩। وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ

আল-কুরআন, ২৬ :১০৯

৫৪। অত্র অধ্যায়ের ২৭তম টীকায় দ্রষ্টব্য।

৫৫। মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, বাবুল বির, খ. ২, পৃ. ৩৩১

Dhaka University Institutional Repository

চ) আল্লাহর সাহায্যের প্রত্যাশী হওয়া

দা'ঈদের সর্বদা আল্লাহর প্রত্যাশী হতে হবে। কেননা, আল্লাহর সাহায্যে ব্যতীত এ কাজে সফলতা আনা অসম্ভাব। ফলে অনুকূল প্রতিকূল সর্বাবস্থায় তাঁর সাহায্য কামনা করবে। নবী-রাসূলগণ সর্বদা আল্লাহর সাহায্যের প্রতীক্ষায় থাকতেন। জাতির লোকদের অবাধ্যতার অবসানে নূহ (আ:) প্রার্থণা ছলে বলেন "আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করুন। তারা আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে।"[৫৬]

ছ) জোড় জবরদস্তির আশ্রয় না নেয়া

মাদ'উদের দ্বীনের পথে জোর জবরদস্তি করে দাওয়াত গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না। কেননা, জোর করে কারো হৃদয়কে বিজয় ও সন্তুষ্ট করা যায় না। অতএব, দাওয়াতে হিকমত পূর্ণ ও সঠিকভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে মাদ'উদের আকৃষ্ট করবে। কুরআনে এসেছেঃ "সে (নূহ) বলল, হে আমার কাওম! একটু ভেবে দেখ আমি আমার রবের পক্ষ থেকে একটা স্পষ্ট স্বাক্ষ্য প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি এবং তাঁর বিশেষ রহমত প্রাপ্ত হয়েছে। অথচ তা তোমাদের নজরে পড়েনি, তাহলে আমি কি জবরদস্তি করে তোমাদের ঘাঁড়ে চাপিয়ে দিতে পারি।"[৫৭]

তাছাড়া মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন-"দ্বীনের মধ্যে কোন জবরদস্তি নেই।" [৫৮]

জ) হিকমত অবলম্বন

হিকমত বা প্রজ্ঞার গুরুত্ব দাওয়াতের জন্য অপরিসীম। দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ সময়, স্থান, কাল, পাত্র ভেদে দিন রাত সর্বাবস্থায় দাওয়াতের কাজ আন্‌জাম দিবে। পাশাপাশি হিকমত পূর্ণ ও উত্তমভাবে মাদ'উদের প্রশ্ন সন্দেহের অসারতা প্রমাণ করে যুগের শ্রেষ্ঠ চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাওয়াতকে তুলে ধরবে। মহান আল্লাহ বলেন,"হে রাসূল (সঃ) আপনি পালনকর্তার পথে হিকমত, উত্তম ও পছন্দযুক্ত পন্থায় যুক্তির মাধ্যমে আহ্বান করুন।" [৫৯]

৫৬। قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ .
আল-কুরআন, ২৩ : ২৬,

৫৭। عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ
আল-কুরআন, ১১ : ২৮

৫৮। لا إكراه الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .
আল-কুরআন, ২ : ২৫৬

৫৯। ادع إلى سبيل ربك با بِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ .
আল-কুরআন, ১৬ : ১২৫

Dhaka University Institutional Repository

ঝ) যুলুমের পরিনাম ধ্বংস

কোন জাতির ধ্বংসের অন্যতম কারণ যুলুম বা অত্যাচার। আল্লাহর পথে শরীক সাব্যস্ত করা মস্তবড় যুলুম। তার পরিণতি হল ধ্বংস। মূলতঃ কুফর ও শির্ক নিয়ে বাড়াবাড়ির কারণেই অতীতের জাতি সম্প্রদায়গুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

পরিশেষে বলা যায় সকল নবী-রাসূল ছিলেন স্বজাতির কাছে শ্রেষ্ঠ, বড় মাপের মুজাহিদ ও হিতাকাঙ্খী দা'ঈ। একজন্য দা'ঈ ইল্লাল্লাহ হিসেবে অসংখ্য গুণের আধার ছিলেন তাঁরা। তাঁরা সকলেই মানুষদেরকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন এবং যাবতীয় শির্ক ও মূর্তিপূঁজা থেকে বিরত থাকার জন্য স্বজাতিকে সর্তক করেছেন। ইসলামী দাওয়াকে মানুষের মাঝে স্পষ্ট ও কাঙ্খিত উপায়ে তুলে ধরার জন্য তারা স্থান, কাল, পাত্র ভেদে বিভিন্ন হিকমত পূর্ণ কৌশল অবলম্বন করেন। এমনকি দাওয়াতকে ফলপ্রসূর করার নিমিত্তে আল্লহর সাহায্য ও তাঁর উপর পূর্ণ নির্ভর হওয়ার পাশাপাশি সমসাময়িক যুগশ্রেষ্ঠ উপকরণ ব্যবহার করতে দ্বিধা করেন নি কেউ। তাই বর্তমান যুগে যারা দা'ঈ ইলাল্লাহ হিসেবে কাজ করছেন, তারা যদি দাওয়াহর ক্ষেত্রে নবী-রাসূলগণের আদর্শ ও পন্থা বেছে নেন তবে, দাওয়াহর একটি বিপ্লব সাধন সম্ভব হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ইতিহাস জীবন ও জগতের অতীত দর্পন। ইতিহাসের ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। প্রাগৈতাহাসিক যুগ হতে মানুষের জীবন কেমন ছিল, কিভাবে মানব জাতির উত্থান-পতন ঘটে, কিভাবে তাদের সূচনা হয়েছিল, মানুষ ও সৃষ্টিজগত সম্পর্কিত এসব বিষয়ের বিশ্লেষণে বহু ঐতিহাসিক অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়েছেন। ফলে এমন কিছু ঐতিহাসিক তথ্য ও তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে যার অধিকাংশই অনুমানভিত্তিক, অবিশ্বাস্য। কিন্তু ইসলামে অনুমানভিত্তিক তথ্য ও তত্ত্বের গুরুত্ব নেই। পবিত্র কুরআন মানব জাতির জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ জ্ঞান বিজ্ঞানের আসমানী আধার। আল-কুরআনে অতীত অতিক্রান্ত জাতিসমূহের ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ ও তা অধ্যয়নের আহবান জানানো হয়েছে। আমাদের মনে রাখা কর্তব্য যে, আল-কুরআন কোন ইতিহাস গ্রন্থ নয়। তবে ইতিহাস যেহেতু জীবন ও জগত সম্পর্কে মানব জাতির অতীত অভিজ্ঞতার ভান্ডার, তাই অতীতের শিক্ষণীয় বিষয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার জন্য পবিত্র কুরআনে মানব জাতিকে আহবান জানানো হয়েছে। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন:

"তারা কি পৃথিবীতে চলাফেরা করেনি যার ফলে তাদের এমন হৃদয় হতো যা দ্বারা অনুধাবন করতে পারতো এবং তাদের এমন শ্রবণ ইন্দ্রিয় হতো যা দ্বারা তারা শুনতে পারতো"।[১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

"আমরা এদের পূর্বে অনেক জাতিকে ধ্বংস করেছি যারা এদের চেয়ে বেশী শক্তিধর ছিল। তারা বিভিন্ন দেশ ভ্রমন করত। অথচ তারাও কি কোন পলায়নস্থল পেয়েছিল ? ঐ সমস্ত ঘটনায় অত্যন্ত শিক্ষামূলক সবক রয়েছে এমন সব ব্যক্তির জন্য যার হৃদয় আছে, বা খুব মনোযোগ দিয়ে কথা শুনে, মনে হয় সে ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে"।[২]

১। أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور

আল কুরআন : ২২:৪৬

২। وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص . إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

আল কুরআন : ৫০:৩৬-৩৭

Dhaka University Institutional Repository

আমার এ দীর্ঘ গবেষণাধর্মী আলোচনায় কুরআনে আলোচিত বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীর ইতিহাস, উত্থান- পতন পবিত্র কুরআনেরই উপস্থাপিত রূপ। প্রাচীনতম ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে ও পর্যায়ে এই ঘটনাসমূহ সংঘটিত হয়েছে এবং তা হয়েছে নবী-রাসূলের পেশ করা দাওয়াত আগ্রাহ্য করায় বড় ধরণের কোন মারাত্মক গুণাহে সে সমাজ-সমষ্টির লিপ্ত হয়ে পড়ার কারণে। আমি আমার আলোচনায় কুরআনকে মূল হিসেবে নিয়ে কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে সে বিষয়ের চিত্র তুলে ধরেছি। প্রাকৃতিক শক্তি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে কুফর, দম্ভ-অহংকারে মুকাবিলা করার জন্য, যেমন: বন্যা-প্লাবন, শুষ্কতা-দুর্ভিক্ষ, প্রচন্ড বাতাস, ঝড়ঝঞ্জা, প্রকম্পধ্বনি, ভূমিকম্প, ভূমিধস, পোকা-মাকড়, তীব্র বৃষ্টিপাত, প্রবল বায়ু, মহামারী, সমাজ সমূহের চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া, ভয়-ভীতি, সন্ত্রাস, ক্ষুধা-কাতরতা প্রভৃতি এবং কোন বিশেষ মাধ্যম ছাড়াই চূড়ান্ত ধ্বংস।

অতিক্রান্ত জাতিসমূহের নবী রাসূলগণ তাদের উম্মতদেরকে খিলাফত তথা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনের আহবান জানিয়েছেন। কিন্তু সকল জাতি-গোষ্ঠীই তাদের নবী-রাসূলের এ আহবান ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। ভুলে গিয়েছে আদম সৃষ্টি মূহুর্তে সেই ওয়াদা। যা আল্লাহ বান্দাদের সাথে করেছেন। আল্লাহর ঘোষণা হচ্ছে :

"আল্লাহ ঈমান গ্রহণকারী ও নেক আমলকারী লোকদের জন্য এ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে যমীনে খলীফা বানাবেন, যেমন তাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে খলীফা বানিয়ে ছিলেন এবং তাদের জন্য ভয়-ভীতির পরে পূর্ণ প্রশান্তি এনে দিবেন। এরা কেবল আল্লাহরই 'ইবাদত করবে, আমার সাথে একবিন্দু শির্ক করবে না। আরা যারা এরপরও কুফরী করবে, প্রমাণিত হবে যে, মূলত তারই সীমালংঘনকারী"।

এই মাত্র উদ্ধৃত আয়াতটি আল্লাহর নেকযোগ্য বান্দাগণকে নেতৃত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসার এক চিরন্তন ওয়াদা উচ্চারিত হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা এই ওয়াদা পূরণ করতে প্রতি মূহুর্তেই প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আয়াতটিতে শুধু আল্লাহর ওয়াদার কথাই বলা হয়নি, সেই সাথে বান্দাদের ঈমান ও নেক আমল যোগ্যতার অধিকারী হওয়ার উপর কঠিনভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তা হচ্ছে বান্দাদের খেলাফত লাভের যোগ্যতা অর্জন। এটা আল্লাহর দিক থেকে তাঁর ওয়াদা পূরণের বাস্তবায়নের জন্য আরোপিত শর্তভিত্তি। ভিত্তি নির্মিত হলেই তার উপর কাঠামো দাঁড়াতে পারে।

৩। وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون

আল কুরআন : ২৪:৫৫

Dhaka University Institutional Repository

আর ভিত্তিই যদি নির্মিত হয়ে যায়, তাহলে তার উপর কাঠামো নির্মাণ অর্থাৎ আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠার ওয়াদা বাস্তবায়িত হতে কোন বিলম্ব হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তেমনি প্রশ্ন ওঠে না ভিত্তি প্রস্তুত ও প্রস্তুত না হওয়া সত্ত্বেও খিলাফতের বিরাট বিশাল সুউচ্চ প্রসাদ নির্মিত হওয়ার।

এখানে সে ভিত্তি নির্মাণের জন্য অতীত জাতি-গোষ্ঠীর বান্দাদের প্রস্তুতি ছিল না কোন কালেই। যার ফলে অতীত-জাতি গোষ্ঠীর উপর নেমে এসেছে উল্লেখিত ধ্বংসাত্মক আযাব।

অতীত জাতি-গোষ্ঠীর এ করুণ পরিণতি কুরআনে কোথাও সংক্ষিপ্তভাবে কোথাও বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে, যাতে বর্তমান ও অনাগত মানুষগুলো এ থেকে শিক্ষা নিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমে সঠিক পথের সন্ধান পায়। অতীত মানুষগুলোর ন্যায় ভুল আচার-আচরণ, নেতিবাচক চরিত্র প্রদর্শন ও সভ্যতার ধ্বংস্তুপ থেকে রক্ষা পায়। আর কোন কালেও যেন নবী রাসূলগণের দাওয়াত অস্বীকারকারী, দাম্ভিক, উচ্চকণ্ঠে বড়াইকারীর ন্যায় জাতিপুঞ্জের আবির্ভাব না ঘটে। ভবিষ্যত জাতি-গোষ্ঠীর কোন নেতৃত্ব কুফর, অহংকার, পরাক্রম পৌরষ প্রদর্শনের মাধ্যমে যাতে না বলে, انا ربكم الاعلى "আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় ইলাহ" এবং من اشد منا قوة "আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী আর কে আছে" ?

আমার উপস্থাপিত গবেষণাকর্মে আল-কুরআনে আলোচিত বিভিন্ন জাতির আগমনের সময়কাল, আচার-আচরণ, জীবন ও কর্ম, ধর্ম-দর্শন, প্রেরিত রাসূলগণের সাথে তাদের ব্যবহার এবং সমকালীন মানুষের সার্বিক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

আমার উপস্থাপিত এম. ফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভটি স্বীকৃত নীতিমালা অনুসরণের পাশাপাশি অভিসন্দর্ভে উল্লেখিত প্রামাণ্য তাফসীর ও হাদীস গ্রন্থসহ অন্যান্য গবেষণামূলক গ্রন্থ ও জার্নাল থেকে তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ করে প্রভূত জ্ঞানে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। উপস্থাপিত বিষয়ে আমার পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ জ্ঞানের জগতে এক নতুন সংযোজন হবে বলে আমি দৃঢ় প্রত্যাশী। আশা করা যায়, উপস্থাপিত শিরোনাম গবেষণা আকারে প্রকাশিত হলে অতীত জাতিসমূহের জীবন-কর্ম থেকে শিক্ষা লাভ করে ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে অবস্থান গ্রহণ করবে দৃঢ়ভাবে। আর এ সুমহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। মহান আল্লাহ আমার এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের তাওফীক দান করুন । আমীন!

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আল-কুরআনুল কারীম

আত্-তাবারী ঃ *জমিউল বয়ান আত্-তাবিল আইয়িল কুরআন,* বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খৃ.

ঃ *তারিখুল উমামি ওয়াল মুলূক,* তা.বি.

ঃ *আদ্-দীন ওয়াদ্ দৌলাহ,* মিশর: দারুল কুতুব আরাবী, ১৯৩৩ খৃ.

আল-আজদী, আবুল মানসুর, ইব্ন হুসাইন ঃ *আল-ইখবারুল আউয়্যাল আল-ইসলামিয়াহ্,* মিশর: দারুল কুতুব আরাবী, , ১৯৬৭ খৃ.

আবদুল ফাত্তাহ্, আফীফ ঃ *মা'য়াল আম্বিয়া ফিল কুরআন,* কায়রো: দারুল ইল্ম, ৩য় সং, ১৯৮৪ খৃ.।

আবদুল -আযীয, শাহ ঃ *বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন,* দিল্লী: ১ম সং, মাতবা'আহ মুজতাবয়ী, ১৯১৫ খৃ.।

আবদুল আযীয, আল-খাওলী ঃ *মিফতাহুস সুন্নাহ্,* মিশর: ২য় সং, আল-মাতবা'আতুল-হুসায়নিয়াহ্, তা.বি.।

আবদুল মাজীদ, মাহমুদ ঃ *আবু জা'ফর আত-তাহাভী ওয়া আসারুহু - ফিল - হাদীস,* কায়রো: ১ম সং, আল মাজলিমুল আ'লা, ১৩৯৫/১৯৭৫

Dhaka University Institutional Repository

আবুল ফিদা ঃ *আল-মুখ্‌তাসার ফী আখবারিল বাশার,* বৈরুত: ১ম সং, দারুত তাবা'আতিল আরাবিয়্যাহ্‌, তা.বি.।

আবুল হাসান, আলী, নদভী ঃ *তারীখ-ই-দাওয়াত ওয়া 'আযীমত,* লক্ষ্ণৌ: ৫ম সং, খ. ২য়, মাজলিস-ই-তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-ইসলাম, ১৪০৩/১৯৮৩

আল-রাযী ঃ *মাফাতিহ্‌ আল-গায়েব,* কায়রো: আল-মাতবা'আতুল হুসাইনিয়াহ্‌, ১৩০৭ হি.।

আহমদ ইব্‌ন আল-খাতীব ঃ *তারিখ্‌ বাগদাদ,* কায়রো : মাকতাবে আল-খানজী, ১৩৯৪ হি.।

আমীমুল ইহ্‌সান, সাইয়্যেদ, মুহাম্মদ ঃ *তারিখ-ই-ইসলাম* ঢাকা: প্রকাশক, সাইয়্যেদ নু'মান, বাংলা বাজার, ১৯৬৯ খৃ.।

ইবনুল মানযুর ঃ *লিসানুল আরব,* বৈরুত : দারুল কুতুব ইসলামিয়্যাহ্‌, তা.বি.।

ইব্‌ন কাসীর ঃ *আল-বিদায়াহ্‌ ওয়ান নিহায়াহ্‌,* বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৩৮ খৃ.।

ইব্‌ন খালদুন ঃ *কিতাবুল ইবার,* মিশর : আবনাইয যামান, ১৩১০/১৮৯২

ঃ *আল-মুকাদ্দিমাহ্‌,* বৈরুত: দারুল কলম, ১৯৮১

Dhaka University Institutional Repository

ইব্ন হাজার, আসকালানী, আহমদ ঃ *ফাতহুল বারী,* বৈরুত: ২য় সং, দারু ইহ্ইয়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, ১৪০২/১৯৮১

ইব্ন নাদিম ঃ *আল ফিহরিস্তি,* বৈরুত: মাকতাবুল খায়রাত, ১৯৭২ খৃ.।

ইস্পাহানী, আল-রাগিব ঃ *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন,* করাচী: মাকতাবায়ে করাচী, ১৩৮০ হি.।

ইলমী বাদাহ, আল্ হাসানী ঃ *ফাতহুর রহমান লি তাবিলে আয়াতিল কুরআন,* বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল আহলিয়া, ১২২৩ হি.।

ইবনুল - আসীর ঃ *তারিখুল কামিল,* মিশর: ১ম সং, মাকাবা'আতুল-আযহারিয়্যাহ, ১৩০১/১৮৮৪

ইয়াকূত হামাভী ঃ **মু'জামুল বুলদান,** কায়রো: ১ম সং, মাকতাবায়ে খানজী, তা.বি.।

এ.বি.এম. ফারুক, ড. ঃ *"পবিত্র কুরআনের ভাষাগত বিবরণঃ একটি পর্যালোচনা"* কুষ্টিয়া: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, একটি গবেষণাকর্ম, তা.বি.।

ওবায়দুল হক মিয়া ঃ *আল-কুরআন সর্বযুগের শ্রেষ্ঠগ্রন্থ,* ঢাকা: সম্পাদনায়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৮ খৃ./১৪০৫ বাং।

কিরমানী, ইব্ন মুবারক ঃ *আল-আওলিয়া,* দিল্লী: মাকতাবাতু আসাফিয়্যাহ ১০৪২ হি.।

খুদামা, আবুল ফারজ ঃ *কিতাবুল খারাত,* বৈরুত: দারুস্ সাদির, ১৯৪২।

Dhaka University Institutional Repository

গাওসী, মুহাম্মদ ঃ *গামজারুল আবরার,*
দিল্লীঃ মাকতাবাতু আসাফিয়্যাহ, তা.বি.।

সুয়ূতী, জালালুদ্দীন, আল্লামা ঃ *আল-ইত্কান ফী উলূমিল কুরআন,*
কায়রোঃ ৩য় সং, মাকতাবাহ হিজাজী,
১৩৬৮ হি.।

ঃ *আল-ইরফান ফী উলূমিল কুরআন,*
কায়রোঃ মাকতাবাহ হিজাজী, ১৩৭০ হি.।

ঃ *আদ-দূর আল - মানসুর,*
মিশরঃ মাকতা'আতু ইদারাতুল ওয়াতান,
তা.বি.।

তাহের সুরাটী ঃ *কাসাসুল আম্বিয়া,* অনুবাদ,
অধ্যক্ষ মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান,
ঢাকাঃ ৪র্থ সং, প্রকাশনায়, খান বুক হাউজ,
২০০৯' জানুয়ারী।

নদভী, সুলাইমান, সাইয়্যেদ ঃ *আরদ আল-কুরআন,* আজমগর (ভারত)
১ম সং, ১৯৫০ খৃ.।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, বুখারী, ইমাম ঃ *আল-জামিউস্-সাহিহুল মুসনাদুল-মুখ্তাসার মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি ও সুনানিহী ওয়া আইয়ামিহী,*
করাচীঃ ৩য় সং, নূর মোহাম্মদ আসাহহুল মাতাবি,
১৩৮১/১৯৬১

মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা, আবূ ঈসা,
আত-তিরমিযী, ইমাম ঃ *আত-জামিউত্-তিরমিযী,* করাচীঃ নূর মুহাম্মদ
আসাহহুল মাতাবী, তা.বি.।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, ড. ঃ *ইমাম তাহাভী (রঃ) জীবন ও কর্ম,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৪১৮/১৯৯৮

মাযহার উদ্দিন, ছিদ্দিকী, ড. ঃ *কুরআনের ইতিহাস দর্শন,* অনুবাদ, সিরাজ, মান্নান, ঢাকা : ২য় সং, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৯/১৯৮৭

মুহাদ্দিস দেহলভী, ওহালি উল্লাহ, শাহ ঃ *আল-ফাউযুল কাবীর,* অনুবাদ, আখতার ফারুক, ঢাকা : ২য় সং, কুতুব খানায়ে রশিদিয়া, ঢাকা, ২০০৪.

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র:)
মাওলানা, হযরত ঃ *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন,* অনুবাদ, মাওলানা মহিউদ্দিন খান, মদিনা : খাদেমুল - হারামাইন বাদশাহ বাহাদ কুরআন মুদ্রন প্রকল্প, ১৪১৩ হি.।

যারকানী, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ঃ *আল-বুরহান ফী উলুমিল কুরআন,* কায়রো: মাকতাবাহ দারুত তুরাছ, ১৩১৪ হি.।
ঃ *মানাহিলুল ইরফান,* কায়রো: মাকতাবাহ ঈসা আল-বালী, আল হাবলী, কায়রো, ১৩৭২ হি.।

রাইছ উদ্দিন ভুইয়া, মুহাম্মদ, ড. ঃ *ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম,* ঢাকা : ১ম সং, তাওহিদ পাবলিকেশন্স, বংশাল, ২০০৫ খৃ.।

রহীম, মুহাম্মদ আবদুর, মাওলানা ঃ *ইসলামের ইতিহাস দর্শন,* ঢাকা : ১ম সং, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৪/২০০৩,

সিওয়ারবী, হিফযুর রহমান, মাওলানা ঃ *কাছাছুল কুরআন, (কুরআন কাহিনী),* ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা, ২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

সুবহি সালিহ, ড. ঃ **মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন,** বৈরুতঃ দারুল ইলম, ১৯৮৫ হি.।

সাইয়্যেদ কুতুব ঃ *আত-তাসবিরুল ফান্নি ফিল কুরআন,* বৈরুতঃ দারুল কলম, তা.বি.।

ঃ *আল-কুরআনের শৈল্পিক সৌন্দর্য,* অনুবাদ, মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, বাংলা বাজার, জুলাই, ১৯৯৭ খৃ.

সাখাভী, আল্লামা ঃ *আল-ই'লান বিত্ তাওবিখ মিম্মান জম্মুন তারিখ,* বৈরুত : দারুল কুতুব ইসলামিয়্যাহ, ১৯৬৭ হি.

পত্র পত্রিকা

এসিয়াটিক সোসাইটি জার্নাল, ১৯৭৪ইং এর প্রবন্ধ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জুলাই, সেপ্টেম্বর ২০০৫

সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যা ২, ফেব্রুয়ারী ২০০১

দায়েরায়ে মা'আরিফে ইসলামী, লাহোর, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, পাকিস্তান।

অভিধান ও বিশ্বকোষ

আশুতোষ দেব ঃ *শব্দবোধ অভিধান,* কলিকাতা : ১৯৯৭

আফরিকী, ইব্ন মানযূর জমালুদ্দীন, মুহাম্মদ ঃ *লিসানুল'আরব,* দারুল ফিকর, বৈরুত, তা.বি.।

বোস্তামী ঃ *দায়েরাতুল মা'আরিফ (সাবা)*

ঃ *মু'জামুল বুলদাম,* ইয়ামান, তা.বি.।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,* ঢাকা : ১ম সং, ১৪০২/১৯৮২

Dhaka University Institutional Repository

শ্রী- জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস ঃ *বাংলা ভাষার অভিধান,* কলিকাতা : ১৯০৯

খান বাহাদুর, আবদুল হাকিম ঃ *বাংলা বিশ্বকোষ,* তা.বি.

Gibb, H.A.R. and Others : *The Encyilopadia of Islam,* Leiden; Brill 1960 & 1971.

James Hastings : *The Encyilopadia off Religion and Ethics,* Great Britain, N.D.

: *The Encyilopadia of Brittannica*

: *The Encyilopadia of Islam (Urdu)* Lahor: The University of Panjab; P, 125.